রাষ্ট্রবিপ্লব

সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ

এবং

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ড. কর্নেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম (অবঃ)

রাষ্ট্রবিপ্লব
সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ
এবং
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ড. কর্নেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম (অবঃ)

পাবলিকেশনস □ ঢাকা

রাষ্ট্রবিপ্লব, সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ

এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ড. কর্নেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম

ISBN-

মূল্য □ ৩০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

বাংলাদেশের জনগণকে,

যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন

এবং

সমর্থন করেছিলেন-

মুখবন্ধ

ড. অলি আহমদ তাঁর এই বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়া এবং বাঙালি সামরিক অফিসারদের ভূমিকা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, সত্য ঘটনা সম্বলিত একটি প্রামাণ্য দলিল জাতীর সমূখে উপস্থাপন করেছেন। আমি নিজেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিদ্রোহে অংশগ্রহনকারী। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে এ বিদ্রোহে ক্যাপ্টেন অলি আহমদের ভূমিকা এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকান্ড অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। জনাব অলি এ লেখনীর মাধ্যমে মেজর জিয়ার, নিজের এবং অন্যান্যদের ভূমিকা সঠিক ও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যরাই স্বউদ্যোগে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশ পরিচালনা করেন। রাজনীতিবিদরা এ সময়ে কলকাতা, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে তাদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত ছিল। বিশেষ করে জাতির সে চরম মুহূর্তে বাঙালি অফিসারদের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে রাজনীতিবিদরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দেশবাসীকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর থেকে দেশবাসী তাঁদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। জাতির এ গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং ক্রান্তিলগ্নে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সংগঠিত করে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মেজর জিয়া ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াই ছিলেন আমাদের নেতা এবং বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম তাঁর এই গবেষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভ এবং ইতিহাসের হারানো সূত্র সম্পর্কে যথাযথ তথ্য তুলে ধরেছেন। ড. অলি এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জাতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল উপহার দিয়েছেন। আগামী দিনে বস্তুনিষ্ট ও সঠিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এ গবেষণার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। নিঃসন্দেহে তাঁর এই উদ্যোগ প্রসংশা যোগ্য।

মেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী বি ইউ

৭.৯.২০০৫

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা অফিসারদের ভূমিকা এবং জীবন উৎসর্গের উপর আলোকপাতপূর্বক এই গবেষণায়, সেইসব প্রাণবন্ত ঘটনাবলির বিশদ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জাতীয়তাবাদী চেতনাই সেনা অফিসারদের প্রধান প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। ঐ বিশেষ সময়ে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীর মত বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাননি অথবা কোন অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতেও চাননি; বরং তাঁরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কেন বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, কিভাবে তাঁরা অনুপ্রাণিত হন, কখন তাঁরা বিদ্রোহ করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং প্রবাসী সরকার গঠন করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিভাবে তাঁরা অগ্রসর হন, এসবের ব্যাখ্যা করাই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ড. অলি আহমদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হয়েছেন এবং সুনিপুণভাবে তাঁর গবেষণার কাজটি সম্পাদন করেছেন।

একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি প্রারম্ভে কখনও কখনও অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছেন; কিন্তু তাঁর অনুসৃত নতুন আত্মবিবরণীমূলক পদ্ধতির পিচ্ছিল প্রক্রিয়া একদিকে যেমন তাঁকে বস্তুনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে তেমনি অন্যদিকে তাঁকে সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে। অবশেষে তিনি এমন একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন যা শুধু মৌলিকই নয়, বাস্তব এবং তথ্য সংবলিত।

এই গবেষণার ফলাফল প্রকৃত অর্থেই উলেণ্ঢখযোগ্য। বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি বৈপণ্ঢবিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন, কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসেবে অত্যন্ত কাছ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন যে, জাতিগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কিভাবে পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়েছিল, যার পরিণতিতে বাঙ্গালীদের পাকিস্তান থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন করে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্বকে আরো অধিক তীক্ষ্ণ করে তুলতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। নির্বাচনের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনাকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন, কারণ তাঁরা ইতোমধ্যেই সৃষ্ঠ রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে

বৈপণ্ঢবিক আন্দোলনকে পদদলিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী সেনা অফিসারা পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা অবগত ছিলেন। সেইসব ঘটনাবলী তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, যখন রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ও অসংগঠিত। বাঙ্গালী সেনারা শুধু যুদ্ধ শুরুই করেননি, বরং ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। অতঃপর তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন এবং অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস তীব্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত গণআন্দোলনের সময়কাল হইতে ১৭ এপ্রিল গঠিত প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে সার্বিক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের অজানা তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে এই গবেষণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পুনঃ নির্মাণে সাহায্য করেছে, যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত বিশাল উপাত্ত সম্ভার-এর মাধ্যমে ড. আহমদ তাঁর উদ্দেশ্যকে পাঠকের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, তথাপি কখনোই তিনি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বস্তুনিষ্ঠতা থেকে বিচ্যুত হন নি এবং সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। আমি এ আকর্ষণীয় এবং শিক্ষামূলক গবেষণাটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, পি এইচ ডি

লেখকের কথা

২০০৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মাসে অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটিতে উপস্থাপিত আমার পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটির অনুবাদ এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাষ্ট্র বিপণ্ডবের পরিপূর্ণ, সুগভীর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের বিদ্রোহের কারণ, কোন্ পরিস্থিতিতে আমরা বিদ্রোহ করি এবং কে নেতৃত্ব দেন–এসব বিষয়ের বিচার-বিশেণ্ডষণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি কিছু কিছু নতুন বিষয়ও সংযোজনের চেষ্টা করেছি যেগুলো ইতিপূর্বে রাষ্ট্র বিপণ্ডব সম্বন্ধে কোন লিখনীতে অন্ড়র্ভুক্ত হয়নি এবং বিশেষ করে ইতিহাসের অজানা অধ্যায় (মিছিং লিঙ্ক); যেমন- ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়কাল, যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা গঠিত কোন সরকার ছিল না, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই সময়ে নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে চূড়ান্ত মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এবং সামরিক অফিসারদের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন এবং বিশেণ্ডষণের জন্য একটি কাঠামো উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই রাষ্ট্রবিপণ্ডবে আমার ভূমিকা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে, যদি কেউ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান BU, psc এর ১৯৭৩ সালে লেখা নিম্নোক্ত আমার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মনোযোগ সহকারে পড়েন, যা তৎকালীন সেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার কে. এম সফিউলণ্ডাহ BU, psc সমর্থন করে স্বাক্ষর করেন। অধিকাংশ সিনিয়র অফিসার আমার বিভিন্ন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে আমাকে সেনাবাহিনীর সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

"তিনি অত্যন্ত অনুগত, সাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ একজন অফিসার, অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যে কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রধী সম্পন্ন এবং যে কোন জটিল পরিস্থিতি সহজে অনুধাবন করতে পারেন এবং প্রশংসনীয়ভাবে সহজে সামাল দিতে পারেন । তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর অধীনস্থদের প্রতি অত্যন্ত সদাশয়।

৭১ সালের ২৫/২৬ শে মার্চ রাতের চূড়ান্ত মুহূর্তে চট্টগ্রামে, এই অফিসার ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে প্রবল প্রতিকূলতার মুখে এবং প্রতিপক্ষের শত্রুর সম্মুখে এই অফিসার অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। বহু অভিযানে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। বিগ্রেড মেজর হিসাবে তিনি চমৎকার দায়িত্ব পালন করেন, অধিকাংশ সময় ডি. কিউ. এম. জি. হিসাবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধের মাঠে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী অন্যান্যদের প্রেরণার উৎস ছিল। এমনকি ভারতীয় অফিসারসহ যাঁরা মাঝে মাঝে 'জেড' ফোর্সের সাথে কর্মকান্ডে লিপ্ত হতেন তাঁদের কাছেও।"

১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনটি লেখেন বিগ্রেডিয়ার মীর শওকত আলী BU, psc, এবং তৎকালীন সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও এটি সমর্থন করে স্বাক্ষর করেন।

"যেকোন বিষয় সংগঠনের ক্ষেত্রে এই অফিসারের অসাধারণ দক্ষতা আছে। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তাঁর পদমর্যাদার চেয়েও অধিকতর দায়িত্ব পালনে সক্ষম। যদি এই অফিসারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় তিনি সেনাবাহিনীর সম্পদে পরিণত হবেন। যুদ্ধের সময় তাঁর অবদান প্রশংসনীয়– **বস্তুত, তিনিই প্রথম অফিসার যিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং নিজ উদ্যোগেই জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন।**" (বিস্তারিত তথ্যের জন্য; পরিশিষ্ট-৮ দেখুন)

এই রাষ্ট্রবিপণ্ঢবে নেতৃত্ব দেয়ার এবং অংশ নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, আমি উপকৃত হয়েছি এবং মুক্তিযুদ্ধে মূল নেতৃত্বদানকারীদের অন্ড়র্দৃষ্টি এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রবিদ্রোহে আমার ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেই গবেষণা আমি সম্পন্ন করেছি তা আমার বিবেচনায় মৌলিক, হয়তো আমার এই গবেষণা সমাজের অনেক মানুষকেই ১৯৭১ সালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং আমি বিশ্বাস করি আমার এই অভিসন্দর্ভ হয়তো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক ইতিহাসের পরিপূর্ণ অনুসন্ধানে সহায়ক হবে।

এই অভিসন্দর্ভটি লেখার কাজে আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ ও সমর্থন দেয়ার জন্য আমার দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, ঢাকা-এর উপাচার্য্য, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য্য প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ এর প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর সময়, ধৈর্য্য এবং উদারতা আমাকে সময়মত অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। রচনাশৈলী এবং উপস্থাপনা উৎকর্ষের জন্য তিনি বিশাল অবদান রেখেছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রফেসর ব্যারী এ্যাক্সফোর্ডকে; তাঁর তত্ত্বাবধান, বিষয়বস্তুর উপর মূল্যবান মন্তব্য রচনাশৈলী এবং উৎকর্ষের জন্য। গবেষণাটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে। অভিসন্দর্ভটির মান উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমাগত পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালের রাষ্ট্রবিপণ্ঢবের এই গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহদানের জন্য অধ্যক্ষ খুরশিদ আলমের কাছে আমি ঋণী। সহায়ক মন্তব্য এবং পদ্ধতির বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক খোলামেলা আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খানের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি আমার সহধর্মিনী মমতাজ বেগমের কাছে, তাঁর সহযোগিতা, ধৈর্য্য এবং ত্যাগের জন্য ঋণী, এছাড়া হয়ত এই গবেষণা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না।

সমগ্র পান্ডুলিপিটি আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ওমর ফারুক একাধিকবার টাইপ করেছে। ভুল বানানগুলিও সে সংশোধন করেছে যার ফলে বইটির মান অনেক উন্নত হয়েছে। অন্য সকল ত্রুটির জন্য আমি নিজেই সকল দায় দায়িত্ব স্বীকার করছি।

আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; বিশেষভাবে, আমার ছেলে ওমর শরীফ, জামাতা মোহাম্মদ ইউসুফ এবং মুন্সি গোলাম রাব্বি, আমার মেয়ে আনোয়ারা বেগম, সোনিয়া মমতাজ এবং পুত্রবধূ সাবিনা শরমিন এবং তামজিদা পারভীনকে- যারা আমাকে অব্যাহত উৎসাহ এবং আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি অক্সফোর্ড-এ বসবাসরত জনাব আজিজুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের, পূর্ব লন্ডনের জনাব সিরাজ হক, জনাব রশিদ, জনাব আফতাব এবং ড. নুরুন্নবীকে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। এছাড়াও জনাব এলথাম কবির -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর সহযোগিতা, প্রেরণা এবং সমর্থনের জন্য।

ড. কর্নেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম (অবঃ)

লেখক পরিচিতি

ড. অলি আহমদ, বীর বিক্রম ১৯৩৯ সালের ১৩ মার্চ চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার বিখ্যাত কুতুব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে নিজ উপজেলার গাছবাড়িয়া এন. জি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ন্যাশনাল কলেজ, করাচী থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ড. অলি আহমদ ২০০৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, "রেভ্যুলিউশন, মিলিটারি পারসোনেল এন্ড দি ওয়ার অব লিবারেশন ইন বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি গবেষণার উপর অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য থেকে পি.এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

আইন বিষয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি পাকিস্তান আর্মি একাডেমীতে যোগ দেন এবং ১৯৬৫ সালে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং ১৯৭০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের ষোলশহরে অবস্থানরত এই ব্যাটিলিয়নের প্রথম কোয়ার্টার মাস্টার।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কর্নেল অলি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। (তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক ছিলেন।) তিনি কালুরঘাট, মীরেরসরাই, মাস্তাননগর, করেরহাট, তুলাতুলী, হেয়াকু, চিকনছড়া, রামগড় এবং বেলুনিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। পরবর্তীকালে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের (বেলুনিয়া, ফেনী নদী থেকে করেরহাট পর্যন্ত এলাকার) সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকায় স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে **"বীর বিক্রম"** উপাধি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনিই প্রথম **"বীর বিক্রম"** খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি প্রসিদ্ধ 'জেড ফোর্সের' প্রথম বিগ্রেড মেজর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে মেজর পদে উন্নীত হন। তিনি সহ-অধিনায়ক হিসাবে ১৯, ৯, ১০ এবং ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লে. কর্নেল হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। সৈয়দপুরে অবস্থানরত ২৪তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম অধিনায়ক হিসাবে তিনি নিযুক্তি পান। অতঃপর লে. কর্নেল অলি আহমদ আর্মি হেড কোয়ার্টারে জেনারেল স্টাফ অফিসার-১ (অপারেশন) হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মস্থল ছিল সেনাপ্রধানের অফিস এবং ডি.সি. এম. এল. এ এবং পরে সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারের অফিস, সি.এম.এল.এ

এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে অলি আহমদ কর্নেল পদে উন্নীত হন।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দীর্ঘ দিনের সহযোগী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু ড. অলি আহমদ রাজনীতিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে সামরিক বাহিনী হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বি.এন.পি) যোগদান করেন।

ড. অলি আহমদ প্রথম ১৯৮০ সালের মার্চে, দ্বিতীয়বার ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয়বার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী, চতুর্থবার ১৯৯৬ সালের ১২ জুন এবং পঞ্চমবার ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কর্নেল অলি আহমদ যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পান এবং সামরিক আইন জারি হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বৈরশাসনামলে রাজনৈতিক প্রতিবাদের কারণে তিনি দুইবার কারাবরণ করেন। এ সময়ে তিনি নিজেকে বি.এন.পি-র একজন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৮৪ সালে তিনি দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি বি.এন.পি-র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হন।

১৯৯১ সালের ২০ মার্চ বি.এন.পি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করার পর অলি আহমদ পূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের মার্চে গঠিত নতুন মন্ত্রী সভায় শপথ নেয়ার পর তিনি কৃষি, খাদ্য এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ দিনই তা পরিবর্তিত হয়। তিনি বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বি.এন.পি সরকার পদত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পর তিনি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজ দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে তিনি মরোক্কোর মারাকেসে অনুষ্ঠিত ১৯তম বিশ্ব কংগ্রেসের সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। পূর্ণাঙ্গ প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানকারী ৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল অন্যতম। অলি আহমদ তাঁর মূল বক্তব্যে রাস্তা-ঘাট এবং সড়ক পরিবহণ সেক্টরে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন। নির্দিষ্টভাবে মহাসড়ক এবং ঐ সম্পর্কিত

অবকাঠামো নির্মাণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ণাঙ্গ প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের মধ্যে ছিল বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৯২ সালে এপ্রিল-মে মাসে তুরস্কের যোগাযোগ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি ঐ দেশ সফর করেন। সফরকালে জনাব অলি রেলওয়ে এবং সড়ক পরিবহণ সেক্টরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করেন। তিনি তুর্কী উপ-প্রধানমন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করেন।

যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যাংককে ''ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনস ডিকেড ফর এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক" অনুষ্ঠিত শীর্ষক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এতে সমগ্র বিশ্বের পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের জুন মাসের ৩ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল ই,এস,সি,এ,পি (এসকেপ)। ড. অলি আহমদ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের চেয়ারম্যান মনোনীত হন।

১৯৯২ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর ড. অলি আহমদ মেক্সিকো সফর করেন। "সড়ক উন্নয়নের ২৫ বছর ঃ সম্ভাবনা এবং সমস্যা" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে মেক্সিকান সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। তিনি উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

ড. অলি আহমদ ১৯৯৩ সালের ২রা হতে ৯ই মে পর্যন্ত ভারতীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভারত সফর করেন। সফরকালে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রেলওয়ে মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রী এবং পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে পৃথক বৈঠক করেন। মন্ত্রী ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও পরিদর্শন করেন। তিনি পৃথকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা ও রাজস্থানের গভর্নরের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তিনি সকলকে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং ত্রিপুরায় অবস্থানরত চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারত সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

সৌদি যোগাযোগ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ড. অলি আহমদ ১৯৯৩ সালের ১১ থেকে ১৬ নভেম্বর সৌদি আরব সফর করেন। সফরকালে তিনি ''সৌদি ফান্ড ফর ডেভলপমেন্ট"-এর চেয়ারম্যান ও অর্থমন্ত্রীর সাথে রিয়াদে এবং ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সাথে জেদ্দায় সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কারের জন্য তিনি ২৫ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল অনুদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফও সফর করেন।

১৯৯৩ সালে ড. অলি আহমদ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে মায়ানমার সফর করেন। সফরকালে তিনি মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। যিনি একই সাথে স্টেট ল-এন্ড অর্ডার রেসটোরেশন কাউন্সিলের

চেয়ারম্যান। তিনি ঐ দেশের পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন, জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থনীতি এবং স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে পৃথকভাবে সাক্ষাত করেন। এ সফরের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যকার অনিষ্পন্ন সমস্যার সমাধান হয় এবং দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হয়। এ সফরে মায়ানমারে ইউ.এন.এইচ.সি.আর এর অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত হয় যা তারা আগে মেনে নেয় নি।

চিনের রেলওয়ে মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ড. অলি আহমদ ১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চিন সফর করেন। সফরকালে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী, যোগাযোগ এবং রেলওয়ে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ড. অলি আহমদ ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং একই বৎসর সেপ্টেম্বরে উপসাগরীয় দেশ কাতার সফর করেন। ইরানের সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি ১৯৯৫ সালের ৭ থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত ইরান সফর করেন। সফরকালে তিনি ইরানের রাষ্ট্রপতি এবং ইরানি পার্লামেন্টের (মজলিস) স্পিকারের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি রেলওয়ে ও পরিবহণ সেক্টরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

১৯৯৫ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ড. অলি আহমদ চাকমা শরণার্থী সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সফর করেন। তিনি বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরও পরিদর্শন করেন এবং ত্রিপুরার গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। "একবিংশ শতকের অবকাঠামো ঃ নতুন সুযোগ এবং বর্তমান সুবিধা" -এর উপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান কনফারেন্সের অরগেনাইজিং কমিটির চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে ১৯৯৫ সালের ২ থেকে ৪ মে মালয়েশিয়া সফর করেন। সমাবেশে তিনি "বাংলাদেশ অবকাঠামোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা" বিষয়ে একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা উপস্থিত শ্রোতাদের ভূয়শী প্রশংসা অর্জন করে। মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত '২০তম বিশ্ব সড়ক কংগ্রেসে' অংশ গ্রহণের জন্য ড. অলি আহমদ ১৯৯৫ সালের ২-৯ সেপ্টেম্বর কানাডা সফর করেন।

ড. অলি আহমদ ১৯৯৫ সালের ১১-১৪ সেপ্টেম্বর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ও.আই.সি-র ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সৌদি আরব সফর করেন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি হিসেবে, এতে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

১৯৯২ সালে ড. অলি আহমদ তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্য "Statesmen's WHO's WHO"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরল সম্মান অর্জন করেন। যা অদ্যবধি এ দেশের অন্যকোন রাজনৈতিক নেতার জন্য বিরল ঘটনা। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্য ১৯৯৭ সালে ভারতের নয়াদিলিণ্ড থেকে প্রকাশিত এশিয়া প্যাসিফিকের "WHO's WHO" -তেও ড. অলি আহমদের নাম প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়।

তাঁর বীরোচিত ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নিম্নবর্ণিত পুরস্কারে ভূষিত হন–

১। ক্যামপেইন স্টার

২। ওয়ার মেডেল (১৯৬৫)

৩। তমগা-ই-জং

৪। লিবারেশন স্টার

৫। ভিক্টরি মেডেল (বিজয় মেডেল)

৬। কন্সটিটিউশন মেডেল

৭। অর্ডার অব দি ন্যাশনাল ফ্লাগ থার্ড গ্রেড ১৯৭৮ (উঃ কোরিয়া)

৮। বীর বিক্রম (১৯৭১)

৯। মহান মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "জিয়া গোল্ড মেডেল ১৯৯২" (জাসাস কর্তৃক)

১০। জাসাস স্বাধীনতা স্বর্ণ পদক–২০০৩

১১। জাসাস স্বাধীনতা স্বর্ণ পদক–২০০৫

১২। "মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী রিচার্স ইনসটিটিউট গোল্ড মেডেল ২০০২"- (সমাজসেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য)

১৩। "চিটাগং এসোসিয়শন মেডেল ২০০২"- (চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য)।

ড. অলি আহমদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় কমিটিতে বিভিন্ন পদ মর্যদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন ঃ

১। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২। আহ্বায়ক; ক্যাবিনেট কমিটি, মন্ত্রী পরিষদ-সিদ্ধান্তসমূহ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন।

৩। সদস্য, ক্যাবিনেট কমিটি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়সমূহ।

৪। সদস্য, ক্যাবিনেট কমিটি, সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত।

৫। সদস্য, ক্যাবিনেট কমিটি, রুল অব বিজনেস।

৬। সদস্য, ক্যাবিনেট কমিটি, সিনিয়র এপয়েন্টমেন্ট এন্ড প্রমোশন।

৭। সদস্য, ক্যাবিনেট কমিটি, ইকোনোমিক এন্ড ফিন্যান্সিয়াল মেটার্স।

৮। সদস্য, প্রশাসনিক পুন:গঠন সম্পর্কিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, ।

৯। সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি।

১০। সদস্য, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি।

১১। সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর বেতন-ভাতা বিষয়ক ক্যাবিনেট-সাব কমিটি।

১২। সদস্য, ন্যাশনাল ট্রেইনিং কাউন্সিল।

১৩। সদস্য, ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিল।

১৪। সদস্য, শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত ন্যাশনাল কাউন্সিল।

১৫। সদস্য, ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক সাব-কমিটি ।

১৬। আহ্বায়ক, থানা এন্ড ইউনিয়ন ডিলিমিটেশন সম্পর্কিত নিকার (এন.আই.সি.এ.আর) সাব-কমিটি ।

১৭। সদস্য, ন্যাশনাল পপুলেশন কাউন্সিল।

১৮। আহ্বায়ক, প্রশাসনিক পুনর্গঠন বিষয়ক কাউন্সিল কমিটি ।

১৯। আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি।

২০। সহ সভাপতি, গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিষয়ক জাতীয় কমিটি ।

২১। বিকল্প সভাপতি, সাফ গেমস্ ।

২২। ভাইস চেয়ারম্যান, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

২৩। সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।

ড. অলি আহমদ নিম্নবর্ণিত সংসদীয় কমিটি, অন্যান্য সংগঠন, সংস্থা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে বিভিন্ন পদ মর্যাদায় সম্পৃক্ত ছিলেন, যেমন ঃ

২৪। সদস্য, সংসদীয় কার্য্য উপদেষ্টা কমিটি।

২৫। সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণ কমিটি)।

২৬। সদস্য, শিশু অধিকার আন্তগ্র"প (caccus), (সারা বিশ্বের সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত)।

২৭। প্রধান উপদেষ্টা, দৈনিক জনপদ।

২৮। চেয়ারম্যান, ডেইলি ঈশান পাবলিকেশন গ্র"প (একটি দৈনিক খবরের কাগজ)।

২৯। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কাশেম-মাহবুব হাই স্কুল, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৩০। সম্মানীত পৃষ্ঠপোষক, ইনসটিটিউট অব হেলথ সায়েন্স, চট্টগ্রাম (একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ)।

৩১। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমীন, ঢাকা।

৩২। আজীবন সদস্য, কিডনী ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।

৩৩। আজীবন সদস্য এবং সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম সমিতি ট্রাস্টি বোর্ড।

৩৪। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, চিটাগাং (ইউ.এস.টি.সি)।

৩৫। আজীবন সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী অফিসার কল্যাণ সংস্থা।

৩৬। আজীবন সদস্য, সংসদ সদস্য ক্লাব।

৩৭। সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্লাব, ঢাকা।

৩৮। আজীবন সদস্য, কুর্মিটোলা গলফ্ ক্লাব, ঢাকা।

৩৯। আজীবন সদস্য, কক্সবাজার প্রেসক্লাব।

৪০। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, চন্দনাইশ প্রেসক্লাব।

৪১। আজীবন সদস্য, চট্টগ্রাম সমিতি, যুক্তরাজ্য।

৪২। আজীবন সদস্য, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব।

৪৩। আজীবন সদস্য, সোসাইটি ফর এসিসটেন্স টু হিয়ারিং ইম্পিয়ার্ড চিলড্রেন (সাহিক)।

৪৪। চেয়ারম্যান, সোসাইটি ফর এসিসটেন্স টু হিয়ারিং ইম্পিয়ার্ড চিলড্রেন (সাহিক)।

৪৫। প্রেসিডেন্ট, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি।

ড. অলি আহমদ নিম্নবর্ণিত শিক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ঃ

৪৬। অলি আহমদ বীর বিক্রম কলেজ, সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৪৭। কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম কলেজ, বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৪৮। আমানতছফা-বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, চন্দনাইশ।

৪৯। অলি আহমদ হাইস্কুল, বরকল, চট্টগ্রাম।

৫০। মমতাজ বেগম কিন্ডারগার্টেন স্কুল, চন্দনাইশ।

৫১। মমতাজ বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৫২। দোহাজারি-জামিজুরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৫৩। চরম্বা অলি আহমদ বীর বিক্রম উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগাড়া উপজেলা।

৫৪। জনার কেঁওচিয়া আদর্শ হাই স্কুল।

৫৫। কেঁওচিয়া আদর্শ হাই স্কুল।

৫৬। জাফরাবাদ হাই স্কুল।

৫৭। কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম স্টেডিয়াম, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৫৮। অলি আহমদ বীর বিক্রম এতিম খানা, হাশিমপুর।

৫৯। অলি আহমদ বীর বিক্রম এতিমখানা, বরকল।

৬০। ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।

৬১। বৃদ্ধা আবাসন ও এতিমখানা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

ড. অলি আহমদ এর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) "আমার সংগ্রাম, আমার রাজনীতি" - ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

(২) "আমার আদর্শ" মার্চ - ২০০৪।

(৩) "রিভ্যুলিউশান, মিলিটারি পার্সোনেল এন্ড দ্যা ওয়ার অব লিবারেশান ইন বাংলাদেশ" - ২২ জুলাই, ২০০৪।

(৪) "আমার রাজনীতি" ১ম খন্ড - ডিসেম্বর ০৭।

(৫) "আমার রাজনীতি" ২য় খন্ড- ডিসেম্বর ০৭।

(৬) "রাষ্ট্রবিপ্লব, সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ" - ডিসেম্বর ০৭।

(৭) "যা দেখেছি, যা বলেছি, যা হয়েছে" - ডিসেম্বর ০৭।

এই গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, চিন্তাধারা, বিএনপি'র নেতাদের ভবিষ্যৎ, বিএনপি'র ভবিষ্যৎ, দেশের সামগ্রিক অবস্থা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভের সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন।

রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী, মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য হিসেবে ড. অলি আহমদ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এগুলো হচ্ছে– অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চীন, ভ্যাটিকান সিটি, কিউবা, চেক প্রজাতন্ত্র, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, হল্যান্ড, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইতালি, জাপান, কুয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, বার্মা, নেপাল, নেদারল্যান্ড, উত্তর-কোরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান, পোল্যান্ড, কাতার, রুমানিয়া, সৌদি আরব,

সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, তরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশণ্ঢণ্ঢাভিয়া, জাম্বিয়া এবং তাইওয়ান।

তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্ব পালনসহ ২০ বার পবিত্র উমরাহ পালন করেন।

সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি ফুটবল, ভলিবল এবং লন টেনিস খেলতেন। বিগত দুই দশক ধরে, তিনি একজন শৌখিন গলফার হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একাধিকবার পুরস্কারপ্রাপ্ত হন।

ড. অলি আহমদ এবং বেগম মমতাজ দুই পুত্র ও দু কন্যা সন্তানের জনক। বেগম মমতাজ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০০১ -এর জুন পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন।

টার্মস্ এবং সংক্ষিপ্ত রূপ

২ এলটি	সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট
৭৫ এম এম আর আর	৭৫ মিলি মিটার রিকয়েললেস্ রাইফেল
এ সি আর	এন্যুয়েল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট
এ এল	আওয়ামী লীগ
বি বি সি	ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন
বি এন পি	বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি
বি ও পি	বর্ডার আউট পোষ্ট
বি পি সি	বেসিক প্রিন্সিপালস্ কমিটি রিপোর্ট
ব্রিগ	ব্রিগেডিয়ার
বি এস এফ	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (ভারত)
সিএপিটি	ক্যাপ্টেন
সি ও	কমান্ডিং অফিসার
সিওএল	কর্নেল
ডিআর.	ডাক্তার
ডিআর.	ডক্টর
ই বি আর	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
ই বি আর সি	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার
ই পি আর	ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্
এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার
এফ ইউ পি	ফরমিং আপ পেণ্টইস (যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অগ্রবর্তী সেনা দলের অবস্থান)
জি বি এম	গেইঞ্জেস ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা
জিইএন	জেনারেল
জি ও সি	জেনারেল অফিসার কমান্ডিং
জি আর পি	গ্রজ রিজিওনাল প্রোডাক্ট
এইচএবি	হাবিলদার
আই সি এস	ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস
আই ডি বি পি	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক অফ পাকিস্তান
জে সি ও	জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার
এল এম জি	লাইট মেশিন গান

এল এন কে	ল্যান্স নায়েক
এলটি	লেফটেন্যান্ট
এলটিসিওএল	লেঃ কর্নেল
এলটি জিইএন	লেঃ জেনারেল
এমএজে	মেজর
এমএজে জিইএন	মেজর জেনারেল
এম জি	মেশিন গান
এম এন এ	মেম্বার অফ ন্যাশনাল এসেম্বিলি
এমপিএ	মেম্বার অফ প্রভিন্সিয়াল এসেম্বিলি
এন সি ও	নন কমিশন্ড অফিসার
এন ডবিণ্ডও ও	নিউ ওয়াল্ড অর্ডার
পি এ এফ	পাকিস্তান এয়ার ফোর্স
পি আই সি আই সি	পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন
পি পি পি	পিপলস্ পার্টি অফ পাকিস্তান
পি আর ও	পাবলিক রিলেশান অফিসার
পি আর ও ডি এ	পাবলিক এন্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসারস্ ডিসকোয়ালিফিকেশান এ্যাক্ট
আরইটিডি	রিটায়ার্ড
এসইপি	সিপাহী
ইউ এন ই এস সি ও	ইউনাইটেড ন্যাশানস্ এডুকেশনাল সাইন্টিফিক এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন
ইউ এস	ইউনাইটেড ষ্টেইটস্

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

লেখকের কথা

লেখকের পরিচিতি

টার্মস্ এবং সংক্ষিপ্ত রূপ

ভূমিকা

গবেষণার গুরুত্ব

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পূর্বসূত্র

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার গঠন

ভূমিকায় সহায়িকা

অধ্যায়-১

গবেষণার পদ্ধতি

অধ্যায়-২

তুলনামূলক বিশেণ্ডষণে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা

সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপ্তি ঃ তুলনামুলক উপাত্ত

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

অধ্যায়-৩

বাঙালি সেনাবাহিনীর ভূমিকা ঃ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রকৃতি

রাষ্ট্র বিপণ্ডব ও স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

অধ্যায়-৪

স্বাধীনতা যুদ্ধের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থান

জনসংখ্যা

ভাষা

ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি

ঐতিহাসিক পটভূমি

অর্থনৈতিক অবস্থা

অধ্যায়-৫

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক নীতি

ভূমিকা

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতিমালা

অঞ্চলিক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা

সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নীতি

অধ্যায়-৬

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নীতি

ভূমিকা

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল ঃ

ছয়দফা কর্মসূচির উত্থান

অধ্যায়-৭

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের ভূমিকা

ভূমিকা

রাস্ট্র বিপণ্ঢবের পটভূমি বাঙালি সেনা অফিসারদের সিদ্ধান্ত গ্রহন

পুঞ্জীভূত ঝড়

স্বাধীনতার ঘোষণা

বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্ব

পরিপূর্ণ যুদ্ধোদ্যোগ পর্ব

প্রাথমিক পর্যায়ে বিজয়ের অনুভূতি

জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের আরম্ভের সূচনা

অধ্যায়-৮

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রেষণা

ভূমিকা

যুদ্ধে যোগ দিতে কী তাদেরকে প্রণোদিত করেছিল?

তাদের সার্বিক লক্ষ্য কী ছিল?

ঐ সম্বন্ধে এখন তাঁরা কি অনুভব করেন?

দেশপ্রেম বলতে তারা কী বোঝেন?

যদি তাঁরা সফল না হত তাহলে কী হত?

পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন?

তাঁরা কখন যুদ্ধে যোগ দেয়ার কথা ভাবেন?

তাঁরা কি যুদ্ধে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাঁদের সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন?

কেন তাঁরা মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে পরিস্থিতি পরিবর্তন করবেন?

বীরত্বের জন্য উপাধি লাভ করার সময় তারা কি অনুভব করেছিলেন?

সেনা অফিসারবৃন্দ কেন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেন?

উপসংহার

পরিশিষ্ট-১

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি অফিসার এবং সৈনিকদের তালিকা এবং অবস্থান

পরিশিষ্ট-২

ছয় দফা কর্মসূচী

পরিশিষ্ট-৩

কার্য সম্পাদনের জন্য সৈন্যদলের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ

পরিশিষ্ট-৪

অপারেশন সার্সলাইট-১

পরিশিষ্ট-৫

অপারেশন সার্সলাইট-২

পরিশিষ্ট-৬

গোপনীয়

পরিশিষ্ট-৭

আত্মসমর্পনের দলিল

পরিশিষ্ট-৮

অলি আহমদ সম্বন্ধে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, ১৯৭২ এবং ১৯৭৩

পরিশিষ্ট-৯

প্রশ্নমালা

গ্রন্থপঞ্জী

ভূমিকা ঃ

এমিতাই এডজাইওনি (Amitai Etzioni) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অখন্ডনীয় তিনটি শক্তি তথা অভিন্নতা, উপযোগবাদ এবং দমননীতির সাথে সাদৃশ্য রেখে তিনটি পরস্পর সম্পৃক্ত ধারণা শক্তিকে চিহ্নিত করেছেন।

১। সাধারণ মূল্যবোধ স্বার্থের অনন্যতা বা প্রতীক -এর সাথে সম্পৃক্ত 'অভিন্নতা' হল অখন্ডতার প্রাথমিক শক্তি। এ শক্তিটি আরও বর্ধিত এবং দৃঢ় হয়। ২। অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার নিদর্শন উপযোগবাদী শক্তির মাধ্যমে। যদি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত অভিন্নতা এবং উপযোগবাদী শক্তি অর্জন করতে পারে তবে এর দমননীতি স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়। কিন্তু অভিন্নতা শক্তি অকার্যকর হলে এবং উপযোগবাদী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি বা দল অভিন্ন ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার বা এর অবকাঠামোগত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে। এ পর্যায়ে

৩। দমননীতির প্রয়োগ সমস্যাকে শুধু বাড়িয়েই দেয় না বরং ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। (এডজাইওনি, ১৯৬৫ঃ ৩৭-৪০, ১২২-১২৪)।

১৯৪৭ সালে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণ গঠেছিল। এ ধরণের একত্রীকরণের পিছনে যে বিষয়গুলো প্রভাবকের কাজ করেছিল সেগুলো হচ্ছে- উভয় অঞ্চলের বিশাল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সম্মিলিত ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর আধিপত্যের ভয়। এ কারণগুলোই ইসলামি ঐক্য আদর্শেরভিত্তিতে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকে এমন কিছু নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে, যার ফলে বাঙালি নেতৃত্ব তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঙালিদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যকরণ নীতির উদ্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে যদি হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়া হয়, তবে তা পাকিস্তানি আদর্শ ও ঐক্য মতবাদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে। এ সময় হতে বার বার বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে ইসলামিকরণের প্রয়াস নেয়া হয়। (আহমেদ ১৯৬৭ ঃ ৫৭-৭০; আহমেদ ১৯৬৮ ঃ ১৫০-১৬০)

পশ্চিম পাকিস্তানিদের কেন্দ্রীভূত শাসন এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়াকরণ, বিশেষভাবে ১৯৫৮ সালের পরে বাঙালিদের পৃথককরণে উৎসাহিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর সিভিল মিলিটারি ও আমলাতন্ত্র ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর পুরোভাগে চলে আসে। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানিদের অংশগ্রহণ

ছিল খুবই নগণ্য। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানিরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং একরকম উদাসীন হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ অংশীদারিত্বহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে অতীব কেন্দ্রীভূত পাকিস্তান সরকারের সাথে নিজেদের ব্যবধান রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়।[১] ১৯৬০ -এর দশকে পাকিস্তানে যে উলেণ্ঢখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় তা একদিকে বাঙালি নেতৃত্বকে তাদের বঞ্চনার বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং অন্যদিকে তাদের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলে। এভাবে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভিন্নতা এবং উপযোগবাদী শক্তির শোচনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ এ ব্যবস্থা বাঙালি নেতৃত্বকে ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের সক্রিয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এবং পাকিস্তানের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন বাঙালিদের বঞ্চনার বিষয়টি স্পষ্টতর করে তোলে। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের গৃহীত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্ধারকদের বিপক্ষে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। একই সাথে সরকারের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ (রহমান, ১৯৬৬)। মূলতঃ আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসাবে ক্ষমতার গঠনতন্ত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করে। যা অবশেষে পাকিস্তানকে বিভক্তিকরণের দিকে ধাবিত করে। (আহমেদ ১৯৮৯ ঃ ২৮-৪৭)

আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য অঙ্গনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্য হ্রাস এবং বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা বিলোপ করে দুই অঞ্চলের মধ্যে সৃষ্ট তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটানো। প্রাথমিকভাবে ৬ দফা দাবির মূল লক্ষ্য ছিল মুদ্রা, করারোপ, বৈদেশিক বিনিময় থেকে আয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার হতে আঞ্চলিক সরকারের হাতে হস্তান্তর। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে হয়ত সংঘাতের ক্ষেত্র নিরসন করা যেত এবং দু'টি অঞ্চলের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হত।

১৯৭১ সালে নাটকীয়ভাবে পরিস্থিতি বাঙালীদের অনুকূলে চলে আসে, কারণ ১৯৭০ -এর শেষে এবং ১৯৭১ -এর শুরুর দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে অবিস্মরণীয় বিজয় লাভ করে এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর পরও বাঙালিদের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা মূলত পাকিস্তান

[১] এখানে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ডেভিট ইষ্টন এর মতামতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোচনায় আনা হয়। দেখুন তার "এ সিস্টেমস এনালাইসিস অব পলিটিকাল লাইফ", নিউ ইয়র্ক ঃ জন উইলে এন্ড সন্স ঃ ১৯৬৫।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মনে করলেন মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং করারোপের নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকার অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি। কারণ এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পূর্ব পাকিস্তানের হাতে থাকবে এবং স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি একটি বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার বহনে আগ্রহী হবে না, যা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পরিশেষে এর ফলে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিভাগ নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। যাই হোক, বাঙালি নেতৃবৃন্দের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বলতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ছাড়া আর কিছু না। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের মনে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বিশেষভাবে জেনারেলগণ, যারা এই সময় প্রভাবশালী ছিলেন তারা ছয় দফা দাবিকে বিভাজক হিসাবে অভিহিত করে নাকচ করে দেন এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশদ্রোহী সাব্যস্থ করেন।

বাঙালি অফিসারগণ সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের কাছাকাছি থাকার কারণে প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের বিপণ্ঢবী চেতনাকে একটি দিক নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সময়ে সামরিক বিপণ্ঢব ঘটানোর গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে একটি বিপণ্ঢব সংগঠিত করেন। যদিও ঐ রাতে বাঙালিদের স্বীকৃত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর হাতে বন্দী হন। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন এবং মেজর জিয়াউর রহমান নিজেই ২৭ মার্চ নিজকে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাবি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাঙালি সেনা অফিসারদের এ ছোট্ট দলটি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু ও সংগঠিত করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। বাঙালি সেনা অফিসারগণ তখনও বিপণ্ঢবী কার্যক্রমের অগ্রভাগে ছিলেন। মেজর জিয়াউর রহমান এবং তাঁর দল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকা কিছুদিনের জন্য নিয়ন্ত্রণে রেখে অধিকতর প্রস্তুতির জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেন। মেজর খালেদ মোশাররফ ও তাঁর অনুসারীরা কুমিলণ্ঢা এবং সিলেট এলাকার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর শহরে অবস্থানরত মেজর কেএম সফিউলণ্ঢাহর বাহিনী টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হয়ে ঐসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা সিলেট অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। মেজর ওসমান চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাদের একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করে চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়ার কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মেজর জলিল এবং তাঁর অনুসারীরা খুলনা ও বরিশাল এলাকার একটি বড় অংশ

নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ক্যাপটেন হাফিজ ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাথে নিয়ে যশোরের একটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেন। এভাবে বাঙালি সেনা অফিসারগণ তাঁদের পেশাগত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। এ গবেষণায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভিক এবং সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাঙালি সেনা অফিসারদের ভূমিকা এবং চালিকাশক্তির উপর আলোকপাত করা হবে।

এ গবেষণার গুরুত্ব

এখানে পাকিস্তান বিভক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশেষভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর কি ধরণের ভূমিকা ছিল তা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। তবে ২৫ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত ঐ চূড়ান্ত মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়াউর রহমান। অন্য একজন সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বিপণ্ডব সংগঠিত করেন। তাঁরা চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য বাঙালি অফিসারগণও তাঁদের অধীনস্থ বাহিনীসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

কী কারণে এসব সেনা অফিসার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? কোন্ পরিস্থিতি তাঁদের পেশাগত আদর্শ, আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? পাকিস্তানের তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে যে পরিবেশ ছিল তা বাঙালি সেনা অফিসারদের বিদ্রোহী মনোভাবকে গতিময় করেছিল। যা এই গবেষণায় একটি পেশাদার সেনা দলের বিদ্রোহী নেতৃত্বে রূপান্তরের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ও প্রতিফলিত হবে। গভীর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি সেনা অফিসারগণ কেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না এবং কেন তাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেন তাও এ গবেষণা বিশেণ্ডষণ করবে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং মার্চ মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের সময়কার অজানা অনেক ঘটনার তথ্য এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

মুক্তি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পূর্বসূত্র

১৯৭১ সালের ১ মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ তাঁরা এটিকে পূর্ব-পাকিস্তানি নেতাদের নির্বাচনী

বিজয়ের সুফল হতে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অজুহাত হিসেবে দেখলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের যে সকল জনগণ ১৯৭০ সালের ভোট যুদ্ধের সময় সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত করা হয়েছে যে, যে সব বাঙালি অফিসার সতর্ক দৃষ্টিতে এ সকল ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছিলেন তাঁরা অধিক সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করেন।

১৯৫০-এর দশকের প্রারম্ভে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৬০ -এর দশকে বিশেষভাবে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারি পর তা আরও জোরালো হয়ে উঠে। সামরিক আইন জারি হওয়ার পর সামরিক এবং বেসামরিক আমলারা পাকিস্তানের শীর্ষ নীতি-নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমলাদের মধ্যে বিশেষভাবে জাতীয় পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই নগণ্য। এ পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘিরে নেয়া হত। ১৯৫০ -এর দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁদের অধিক অংশগ্রহণের সুযোগ দাবি করেন। ১৯৬০ -এর দশকে তাঁরা এসব দাবি অধিক জোরালো করে তোলেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু নির্দিষ্ট গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেন যাতে তাঁদের দাবিগুলো আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। তাঁরা দাবি করেন যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবাসভূমি তাই নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। পাকিস্তানের দ্রুত উন্নয়নের নামে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারেও তাঁরা বিরোধিতা করেন। তাঁরা আরও দাবি করেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্বনির্ভর হওয়া উচিত।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয় পূর্ব-পাকিস্তানের শীর্ষ রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণকে আলোচনার টেবিলে সফলতার ব্যাপারে অধিক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। পূর্ব-পাকিস্তানি শীর্ষ রাজনৈতিক প্রতিনিধি বলতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিতদের বুঝানো হচ্ছে। এটা উলেণ্ঢখ করা যায় যে, নির্বাচিত আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয়েছিল যে, অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ তাঁরা গ্রহণ করবেন এবং শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই পশ্চিম পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত শীর্ষ রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলদের সাথে আলোচনার জন্য আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ প্রস্তুত ছিলেন। ইতোপূর্বে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলগণ দুটি কারণে ছয় দফা কর্মসূচির বিষয়বস্তু দেখে শংকিত হয়ে পড়েন। প্রথমত, পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ছিল মূলত পশ্চিম-পাকিস্তান কেন্দ্রিক। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারে নগন্য।

দ্বিতীয়ত, ছয় দফা দাবি অনুসারে আঞ্চলিক সরকার মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং করারোপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূলত বাঙ্গালী শাসক শ্রেণীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে (ছয় দফার ৩, ৪ ও ৫ নং দফা)। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তাই একদিকে যখন আলোচনা চলছিল অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অধিক অস্ত্র ও ব্যাপক যুদ্ধোপকরণ নিয়ে আসার কাজ চলছিল। অনেক সশস্ত্র সৈনিক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমান যোগে অবতরণ করতে থাকে। এ অবস্থা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের অনিচ্ছার কথা উলেণ্ডখ করে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সিদ্ধান্ত দেন। এ স্থগিতাদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানিদের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য নিজ দল আওয়ামীলীগ ও দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ হতে প্রচ- চাপের সম্মুখীন হন। যাই হোক, শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবর্তে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করা।

১ থেকে ৭ মার্চ -এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের দুই অংশের নেতাদের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক এবং পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি যখন আলোচনার প্রস্তাব করছিলেন তখন ঢাকার রাজপথে এবং অন্যান্য শহরে পাকিস্তানি জেনারেলদের দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানি সেনাদের সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রচ- সংঘর্ষ চলছিল। ৭ মার্চ শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল অনতিবিলম্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। যুগপৎভাবে আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। যার ফলে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ প্রশাসন, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার বাঙালি কর্মচারীসহ সশস্ত্র বাহিনীর সিভিল শাখার কর্মচারীরা শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একমত্য পোষণ করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাস্তবিক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান সৃষ্ট সংকটের রাজনৈতিক সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। এভাবে আলোচনা শুরু হয়।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যকার আলোচনার বিস্তারিত তথ্য কখনও সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু প্রকাশিত খবর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিদারুণ হতাশার মুখে ইয়াহিয়া খান নীতিগতভাবে শেখ মুজিবের চারটি পূর্বশর্ত মেনে নেন। তবে ভূট্টো আরও কিছু সময় দাবিকরছিলেন। আওয়ামীলীগ তিন সপ্তাহের অধিককাল অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। আন্দালনকে শান্তিপূর্ণ রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে অহরহ সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালিদের প্রতি শত্রুতা ক্রমে বাড়তে থাকে। এদের একটি বড় অংশ দেশান্তরিত হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যায়। এসব দেশান্তরিত মানুষের দুরবস্থা ইয়াহিয়া সরকারের উপর বাড়তি চাপ হিসেবে কাজ করে।

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিসম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ তাদের প্রস্তাব দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য দাবি জানান (জিওবি, আগষ্ট ১৯৭১ঃ ১৮-২৭)। ২৫ মার্চে আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার ঘোষণা শোনার প্রত্যাশায় ছিলেন। তখন ইয়াহিয়া খান আনুষ্ঠানিকভাকে আলোচনা ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানিদের উপর পাশবিক আক্রমণ শুরু করেন। ঐ রাতে পাকিস্তান আর্মি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ ও রাইফেল্‌স -এর সদর দপ্তর এবং আওয়ামীলীগপন্থী কিছু সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ চালায় এবং বহু নিরস্ত্র বেসামরিক লোক হত্যা করে। শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দি করে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

বিভিন্ন সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি খুব গোপনে সম্পাদন করা হত বলে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এর যথেষ্ট তথ্য ছিল না। কিন্তু চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সেনানিবাসে কর্মরত বাঙলি সেনা অফিসারগণের পরিষ্কার ধারণা ছিল। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ পশ্চিম-পাকিস্তান হতে সমুদ্র পথে ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর যুদ্ধোপকরণ চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস করার জন্য আনা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছ হতে প্রত্যাশা করা হলেও কেন মূলত চট্টগ্রাম সেনানিবাসের একজন তরুণ অফিসারকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার মত চূড়ান্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং কেনই বা বাঙালি সেনা অফিসারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২৬ মার্চ হতে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন- এটি তার অন্যতম কারণ। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পুনরায় সংগঠিত হন এবং সীমান্ত গ্রাম বৈদ্যনাথপুরে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। সরকার গঠনের পর বৈদ্যনাথপুরের নাম রাখা হয় 'মুজিব নগর'। বেশ কিছু গবেষণায় (সফিউলণ্ঢাহ ১৯৮৯ ঃ ১-১২; ইসলাম ১৯৮১ ঃ ৭-৯৩; গার্গ ১৯৮৪ ঃ ২৭-৬২) স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন মাত্রায় বিশেণ্ঢষণ করা

হয়েছে। কিন্তু কোথাও সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা, বিশেষভাবে ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। এ গবেষণায় এ সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য

১। পাকিস্তানের আর্থ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষভাবে ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গভীরভাবে বিশেণ্ঢষণ করা যায়। যা পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিল।

২। ছয়দফা কর্মসুচির মাধ্যমে মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য ও করারোপের উপর আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানি জেনারেলরা কেন এত আতঙ্কিত হয়েছিলেন এর কারণ বিশেণ্ঢষণ করা হয়।

৩। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়কদের ভূমিকা বিশেষভাবে মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের অন্যান্য বাঙালি সেনা অফিসারদের ভূমিকা পর্যালোচনা।

৪। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কেন বাঙালি সেনা অফিসারগন মুক্তিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এর কারণগুলো বিশেণ্ঢষণ।

পরিশেষে, এ গবেষণায় বিশেণ্ঢষণ করতে চাই যে, কেন বাঙালি সেনা অফিসারগণ একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ মার্চ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যদিও সেনাবাহিনী বিভিন্নদেশে রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে ক্ষমতা দখলে ব্যস্ত ছিল। ঐ দিন বাঙালি সেনা অফিসারগণ শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করেন নি, তাঁদের একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠন করে রাজনীতিবিদরা যুদ্ধের দায়িত্ব তুলে নেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। বাঙালি সেনা অফিসারগণ ঐ সময় থেকে রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন।

গবেষণার গঠন

গবেষণাটি ৮টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। ভূমিকায় গবেষণার গঠন, বিষয়াবলীর গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এ গবেষণায় গৃহীত পদ্ধতি, বিশেষ করে আত্মবিবরণীমূলক পদ্ধতির পরিব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে। গবেষক নিজে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শুধু একজন পর্যবেক্ষকই ছিলেন না, সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও ছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলনামূলক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র বিপণ্ঢব, বিদ্রোহ এবং মুক্তিযুদ্ধ এসব ধারণাগুলো বিশেণ্ঢষণসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়াবলীর উপর উদাহরণসহ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়কদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতি এবং বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিকদের (বেসামরিক) উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে ঐ সময়কার সেনা অফিসারদের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ৮ম অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়কদের অগ্রবর্তিতা তুলে ধরার নিমিত্ত প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক উপাত্তগুলি বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। উপসংহারে গবেষণালব্ধ বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

সহায়ক বইসমূহ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন (সম্পাদিত), "সোসাইটি এন্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ" ঃ ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

২। আহমদ, আবুল মনসুর, "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" ঢাকা ঃ নওরোজ, ১৯৬৮।

৩। আহমেদ, কমরুদ্দিন, "এ সোস্যাল হিস্টরি অব ইস্ট পাকিস্তান", ঢাকা ঃ ক্রিসেন্ট বুক, ১৯৬৭।

৪। ইস্টোন, ডেবিড, "এ সিসটেমস অ্যানালাইসিস অব পলিটিক্যাল লাইফ", নিউইয়র্ক ঃ জন উইলি এন্ড সন্স, ১৯৬৫।

৫। এডজাইওনি, এমিতাই, "পলিটিক্যাল ইউনিফিকেশন ঃ এ কমপ্যারেটিভ স্টাডি অব লিডার্স এন্ড ফোর্সেস, নিউইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস অব গিণ্ডনসো, ১৯৬৫।

৬। গার্জ এস. কে ক্যাপটেন, ফ্রিডম ফাইটার্স অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

৭। ইসলাম, রফিক-উল, এ টেল অব মিলিয়নস, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি., ১৯৮১।

৮। রহমান, শেখ মুজিবর "আমাদের বাঁচার দাবী ঃ ছয় দফা কর্মসূচী, ঢাকা ঃ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৬।

৯। সফিউলণ্ডাহ, কে, এম মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ অ্যাট ওয়ার, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

অধ্যায়-১

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত উপাত্ত সংগ্রহের গুণগত উপকরণসমূহ প্রয়োগ করা হয়েছে। মূলত বিদ্যমান সাহিত্যকর্ম, সরকারী নথিপত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংকটময় সময়ের এ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। মুক্তি-যোদ্ধাদের জীবনী ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসমূহ হতে মূল্যবান উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত কয়েকজন সেনা অফিসারের কাঠামোগত ও খোলামেলা সাক্ষৎকার প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী পুর্নবিন্যাসের লক্ষ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অপ্রকাশিত ডাইরীসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরূপ ডাইরির তালিকা পরিশিষ্ট অংশে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের জন্য যথাযোগ্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়। আলোচ্য বিষয়ের সংবেদনশীলতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। প্রশ্নমালা ও উত্তরদাতাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-৯ এ সংযোজন করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে সম্পন্ন গবেষণার ফলাফল বিশেণ্ঢষণ করা হয়েছে। তবে কিছু উত্তরমালা সপ্তম অধ্যায়েও উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের সর্বাংশে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অফিসারদের ডাইরি উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

গবেষককে 'আত্ম বিবরণীর' সূক্ষ্ম বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে (এডলার এ্ এডলার, ১৯৯৪; ডেনজিন, ১৯৮৯; ক্রেইজার, ১৯৯১)। তিনি শুধু পর্যবেক্ষক নন, স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও বটে। আত্মবিবরণীমূলক রচনা হল আত্মজীবনীমূলক শাখার একটি রচনা অন্যদিকে গবেষণা চিন্তাধারার বহুমুখী স্তরকে প্রকাশ করে। নৃবিজ্ঞানীদের উভয় দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় । প্রথমতঃ তাঁরা মানব জাতির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণীর বিস্তৃতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজ এবং পরিবেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের বাহ্যিক দিক আলোকপাত করেন। অত:পর তাঁরা অন্তর্মুখী হন। যা অরক্ষিত সত্তা যাচাই করার জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাড়িত হয়। কিন্তু যা প্রতিসৃত করে, এমনকি সাংস্কৃতিক প্রভাবকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারে (ডিক, ১৯৯০; নিউম্যান, ১৯৯৬ঃ রিড-ডোনাহি, ১৯৯৭)। আত্মবিবরণী বা মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ সম্বন্ধে জ্যাকসন (১৯৮৯) বলেছেন, গবেষণায় এর একটি কার্যকর ভূমিকা

রয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে (এলিস এন্ড বকনার, ১৯৯৯ঃ ৭৩৩-৭৪২)।

আত্মবিবরণীমূলক পদ্ধতি বেশ কিছুকাল যাবত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংস্কৃতি অথবা নিজের উপর গুরুত্ব দিয়ে গবেষকগণ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আত্ম-বিশেণ্ডষণের জন্য এবং গভীরভাবে নিজের সাথে অন্যদের মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিজস্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন (এলিস এন্ড বকনার, ২০০০ ঃ ৭৪০)। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানীগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার বিষয় আত্মজীবনীমূলক গল্পের জন্য মনোনীত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তনিক এবং নিজ সত্তার দ্বৈত পরিচয়রূপে গ্রহণ করেন। এই গবেষণার আত্মমূলক রচনায় গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কারণ এটা গবেষণাধীন উপজীব্যকে উদ্দীপ্ত করতে ভূমিকা রাখে। আত্মঘটিত মানব জাতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত অনুরূপ ঘটনার বৈধতাই স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার-বিষয়ক মতবাদ ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে (বেহার, ১৯৯৬; ক্রেইজার, ১৯৯১)।

বিবরণমূলক স্মৃতিকথা এবং রচনামূলক বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে টেডলক (১৯৯১) বলেছেন, প্রথমটির ক্ষেত্রে লেখক তাঁর গবেষণার নেপথ্য ঘটনার ব্যক্তিগত বর্ণনা তুলে ধরেন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গবেষক নিজের অভিজ্ঞতাকে অন্যদের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনার সাথে একীভূত করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গবেষক ও গবেষণাধীন দলের অন্য সদস্যদের সাথে সংলাপ বা কথোপকথনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। টেডলকের মতে, "অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণের" চেয়ে অংশগ্রহণের পর্যবেক্ষণ এবং রচনার প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বের সাথে এই ধরনের আত্মমূলক রচনার উৎকর্ষের বিষয়টি সম্পর্কিত।

এ প্রক্রিয়ায় অন্তত দুটি সুবিধা রয়েছে। প্রথমত: গবেষক গবেষণার মূল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। দ্বিতীয়ত: তিনি তাঁর অংশীদার অথবা সহকর্মীদের সাথে আলোচনা সুবিধাজনক মনে করেন। কারণ ঘটনার বিস্তারিত বিষয় তাদেরও জ্ঞাত। যাই হউক এর একটি বড় সমস্যাও রয়েছে। এই কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ঘটনা বা ঘটনাসমূহ গবেষক প্রকাশ করতে চান তা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা বা আবেগের ছোঁয়ায় আচ্ছন্ন হতে পারে। তাই গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা ব্যাহত হতে পারে। এই দিকটি মাথায় রেখে, গবেষক বর্ণনার জন্য তৃতীয় পন্থা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। যাতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা বস্তুনিষ্ঠতাকে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

অনেকটা এলিস এবং বকনারের মত এই গবেষকও মনে করেন যে, "ব্যক্তিগত বিষয়ে বলার কাজটি গোপনে আচ্ছাদিত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি" (১৯৯২ ঃ ৭৯)। তবুও তাঁকে একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয় বলতে

হয়েছে যা ''জীবন্ত অভিজ্ঞতাকে বোধগম্য ও অর্থপূর্ণ করে তোলার একটি সামাজিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করেছে" (এলিস এবং বকনার, ১৯৯২ঃ ৭৯-৮০)। সে সময় যুদ্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, নিজের অভিজ্ঞতা এবং কোথায় কি হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন ছিল। পরবর্তীকালে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আবেগের মাত্রাসহ ঘটনাগুলো বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা নেন।

যাই হোক, গবেষকের একটি সুবিধা ছিল। সেটি হচ্ছে জটিল পরিস্থিতিতেও ডাইরি লেখার অভ্যেস। এটি পেশাগত কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। গবেষক নিজে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহযোদ্ধারা তদন্তের বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। নিজের ও সহযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা এই গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত (জ্যাকসন, ১৯৮৯ ঃ ৪)। সে সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর ডাইরি, সংক্ষিপ্ত টিকা, তাঁদের স্মর্তব্য অভিজ্ঞতাসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে বারবার যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গবেষক পাঠকদের এমন এক অভিজ্ঞতায় নিয়ে যাবে যাতে পাঠকগণ একটি গবেষণামূলক অনুভূতি লাভ করবে (ক্রেইগার, ১৯৮৪ ঃ ২৭৩; মেককল, ১৯৯১)।

নিবিড় সাক্ষাতকারের জন্য নির্বাচিত আট জনই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ১৯৭১ -এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। নির্বাচিতদের প্রত্যেকের জন্য তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে আলাদা পূর্ব সাক্ষাত-সূচি তৈরি করতে হয়েছিল বলে সাক্ষাতকার প্রক্রিয়াটি ছিল সময়সাপেক্ষ ও কষ্টদায়ক। যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকে মর্যাদপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত তাই গবেষণার বিষয়াবলী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টেপ-রেকর্ডার ও মাইক্রোফোনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে এমনভাবে সম্পন্ন করতে হয়েছিল যাতে তাঁদের মন্তব্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধারণ করা যায়।

সাক্ষাতকারের পূর্বে উত্তরদাতাদেরকে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করা হয়েছে। যাতে তাঁরা প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত নোটসহ প্রস্তুত থাকতে পারেন। একজনের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করার সময় পরিধির বিষয়ে গবেষক নিশ্চিত ছিলেন না। তাই তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এতে ২ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় লাগে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অন্যান্য উত্তরদাতাদের সাথে তাঁদের বাসায় সুবিধাজনক সময়ে বিশেষভাবে; সন্ধ্যায় সাক্ষাত-সূচী তৈরি করেন। যাতে তাঁরা বিরতিহীনভাবে দুই ঘন্টার অধিক সময় দিতে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ায় গবেষক নিজেই কীভাবে সাক্ষাতকার পরিচালনা করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কারণ উত্তরদাতাগণকে তিন দশক আগে সংঘটিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অধিকন্তু উত্তরদাতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করায় তাঁরা তাঁর প্রতি কেমন

প্রতিক্রিয়াশীল হবেন সে বিষয়টিও তিনি অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কিছু কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে উত্তরদাতাগণ সম্পৃক্ত হবেন কি না সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। গবেষক নিজেও যথাযথভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন কি না সেটিও নিশ্চিত ছিলেন না। তাই গবেষককে অনেক উৎকণ্ঠার মধ্যে যত্ন ও সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কারণ পূর্বে এই বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছিল। নির্ধারিত সাক্ষাতকারগুলো ভালোভাবে এগুচ্ছে দেখে গবেষক আনন্দিত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁরা দীর্ঘ ৩০ বছর পূর্বে ফিরে গেছেন। ইতিহাসের একটি ক্রান্তিলগ্নে তারা একসাথে কাজ করেছেন, হাতে হাত রেখে যুদ্ধ করেছেন। প্রত্যেকে একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। সংগতকারণে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও দর্শক হিসেবে গবেষকের মনে মনে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা মন থেকে মুছে যায়।

দীর্ঘ তিন দশক আগে তারা কি চিন্তা করেছিলেন এবং কি করেছিলেন তা ঠিকভাবে স্মরণ করার জন্য সাক্ষাতদাতারা মতামত প্রকাশের আগে তাঁদের ডাইরির সাহায্য নেন। প্রায় সকলেই সুস্পষ্টভাবে ঘটনাগুলো স্মরণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

গবেষক যুদ্ধের সময় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাতদাতাদের সাথে সমপদস্থ হিসেবে সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। সাক্ষাতদাতাগণ নির্দ্বিধায় গবেষকের সাথে একমত হয়েছেন, তাকে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রতিটি উপাখ্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁরা এক রকম স্মৃতিকাতর হয়ে কিছু বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন। এই ধরনের সমস্যার মুখেও গবেষক তাদের বক্তব্য থেকে প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেন। ফলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত মূল তথ্যের কোন অংশ বাদ পরে নি। গবেষণার উদ্দেশ্যে গবেষক সাক্ষাতদাতাদের খোলামেলাভাবে মতামত প্রকাশ করতে বলেছেন। কিছু কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাতদাতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছেন এমন একটি সময়ে, যখন তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে ব্যস্ত ছিল। এর তুলনামূলক চিত্র পরের অধ্যায়সমূহে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। এডলার, পি.এ. এন্ড এডলার, পি., *"অবজার্ভেশনাল টেকনিকস"* ইন এন.কে. ডেনজিন এ্যান্ড ইউভানা এস. লিংকন (সম্পাদিত) *হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ*, লন্ডন, সেইজ পাবলিকেশন্স, ২০০০।

২। বেহার, আর., দি ভালনেরেবল অবজারভার ঃ *এনথ্রোপোলজি দ্যাট ব্রেকস ইওর হার্থ*, বোস্টন ঃ বিকন, ১৯৯৬।

৩। ডিক, এ., অটোএথনোগ্রাফি: *জোরা নিল হার্সটন, ননি জেবাভু, এন্ড ক্রস-ডিসিপিণ্ঢনারি ডিসর্কোস, বণ্ঢ্যাক অ্যামেরিকান লিটেরেচার ফোরাম*, ১৯৯০ ঃ ২৪, ২৩৭-২৫৬।

৪। ডেনজিন, এন. কে., *ইন্টারপ্রেটিভ বায়োগ্রাফি*, নিউবারি পার্ক, সি এ ঃ সেইজ, ১৯৮৯।

৫। এলিস, ক্যারোলিন এন্ড বকনার, আর্থার পি. *"পারসোন্যাল ন্যারেটিভ অ্যাজ এ সোস্যাল অ্যাপ্রোচ টু ইন্টারপারসোন্যাল কমিউনিকেশন"*, কমিউনিকেশন থিওরি, ২, ১৯৯২।

৬। ---------, *"হুইচ ওয়ে টু টার্ন?"* জার্নাল অব কনটেমপরারি এথনোগ্রাফি. ২৮, (১৯৯৯) ৫০০-৫০৯।

৭। ---------, "*অটোএথনোগ্রাফি, পারসোন্যাল ন্যারেটিভ, রিফ্লেক্সিভিটি*", ইন নরম্যান কে. ডেনজিন এন্ড ইউভানা, এস. লিংকন (সম্পাদিত) *হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ*, লন্ডন, সেইজ পাবলিকেশন্স, ২০০০।

৮। জ্যাকশন, এম., পাথ্স টুয়ার্ডস এ ক্লিয়ারিং ঃ *রেডিক্যাল এমপিরিসিজম এন্ড এথনোগ্রাফিক ইনকোয়ারি, বণ্ঢুমিংটনঃ* ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।

৯। ক্রেইজার, এস., *"ফিকশন এন্ড সোস্যাল সাইন্স"* ইন এন. কে. ডেনজিন (সম্পাদিত) *স্টাডিজ ইন সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশনঃ এ রিসার্চ এনুয়াল*, ৫ (১৯৮৪) ২৬৯-২৮৬।

১০। ---------, সোস্যাল সাইন্স এন্ড দি সেলফ ঃ *পার্সোন্যাল এসেস অন অ্যান আর্টফরম, নিউ ব্রুন্সউইক*, এনজেঃ রউজার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১।

১১। *ম্যককল, এম., ''দি সিগনিফিকেন্স অব স্টোরি টেলিং"*, ইন এন. কে. ডেনজিন (সম্পাদিত). *স্টাডিজ ইন সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশন*, ভলিয়ুম ২ (১৯৯১) গ্রিনউইচ সিটি, জেএএল।

১২। রিড-ডানাহে, ডি., *অটোএথনোগ্রাফিঃ রিরাইটিং, সেলফ এন্ড দি সোস্যাল*, অক্সফোর্ড ঃ অক্সফোর্ড বার্গ. ১৯৯৭।

১৩। টেডলক, বি.*''ফ্রম পার্টিসিপেন্ট অবজারভারভেশন টু দি অবজারভেশন অব পার্টিসিপেশন ঃ* দি এর্মাজেন্স অব ন্যারেটিভ এথনোগ্রাফি", *জার্নাল অব এনথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ*, ৪১ (১৯৯১) ৬৯-৯৪।

অধ্যায়-২

তুলনামূলক বিশেণ্ডষণে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা

অধিকাংশ উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রগুলোর জন্ম হয় পূর্বেকার উপনিবেশিক শক্তির পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ছাঁচে গড়া সাংবিধানিক অবকাঠামো নিয়ে। ঐ ধরনের সংবিধানে অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে, সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল পার্লামেন্টের পৃথকীকরণ, নির্বাহী এবং বিচার ব্যবস্থা, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ, সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে বিভাজন নিরূপণের জন্য বহুদলীয় পদ্ধতি এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য (মে, লসন এবং সিলোচেন, ১৯৯৮ ঃ ১)। সাধারণত সেনাবাহিনীর প্রধান ভূমিকা ছিল বাহিরের শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। যদিও ''উপনিবেশিক শাসনে প্রায়ই সেনাবাহিনীকে বাইরের আগ্রাসন প্রতিহত করার চেয়ে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণেই বেশি ব্যবহার করা হত এবং তারা পরোক্ষভাবে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠত" (মে, লসন এবং সিলোচেন, ১৯৯৮)। সেসব রাষ্ট্রে শ্রেণী-সংঘাত বিদ্যমান ছিল ঐ সমস্ত জায়গায় এই বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হত এবং যেখানেই সামরিক সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হত, উপনিবেশিক নীতির প্রতি সবচেয়ে অনুগত গোষ্ঠী থেকে; উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানে। তাই সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে সামরিক শাসনে অথবা সামরিক প্রাধান্য বিশিষ্ট শাসনে রূপান্তর বেশি দিনের ঘটনা নয়।

তবে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ কোন সাম্প্রতিক ঘটনাও নয়। যাহা হউক, বস্তুত, সেনাবাহিনীর স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছিল সুবিস্তৃত এবং দীর্ঘদিনের। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র বিশ্বে ৪৮টি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে আরও ৩টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর মধ্যে ৩২টি রাষ্ট্রেরই রাজনীতিতে বিভিন্নভাবে সামরিক হস্তক্ষেপের অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ২৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টি রাষ্ট্রই সামরিক শাসন দ্বারা শাসিত হয়েছে (ফিনার ১৯৭৫ ঃ ২)। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের ১৫৯টি সদস্য রাষ্ট্র ছিল এবং তন্মধ্যে ৮২টি (৫০%) রাষ্ট্র কোন না কোন পর্যায়ে সামরিক শাসনের অধীনে ছিল (ফিনার ১৯৭৫ ঃ ২৭৪)।

সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপ্তি ঃ তুলনামুলক উপাত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায় এবং তা ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, কিন্তু চারটি অঞ্চলে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়- ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা। ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ল্যাটিন

আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টি (৬২%), আফ্রিকার ৪২টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২১টি (৫০%) ও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২২টি দেশের ৯টি (৪১%) দেশ সামরিক শাসক দ্বারা শাসিত হয় (ফিনার ১৯৭৫ ঃ ২৭৫)। এমনকি ইউরোপও সামরিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত ছিল না এবং ঐ সময়ে ইউরোপের ১৮টি দেশের মধ্যে ৩টি (১১%) দেশ সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। একটি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে গ্যাভিন কেনেডি লিখেছেন, ১৯৪৫-১৯৭২ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৬টিতে (৮০%) ৫৩টি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে যথাক্রমে ৯, ১৪ এবং ২৫টি দেশে যথাক্রমে ২২, ৪২ এবং ৩২টি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে (কেনেডি, ১৯৭৪ ঃ ৩৩৭-৩৪৪)। তাঁর তথ্য অনুযায়ী, এই চারটি অঞ্চলেই ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ২০০টিরও অধিক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এর সংখ্যা দুইশ আশির অধিক ছিল; তন্মধ্যে এশিয়ায় ৪২টি, ল্যাটিন আমেরিকায় ৮৬টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৬২টি এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৭৬টি (কেনেডি, ১৯৭৪ঃ৪৫)।

ছক ২.১ঃ ১৯৪৫-১৯৮৫ সালের মধ্যে সফল অভ্যুত্থানের সংখ্যা

অঞ্চল	১৯৪৫-১৯৫০	১৯৫১-১৯৫৫	১৯৫৬-১৯৬০	১৯৬১-১৯৬৫	১৯৬৬-১৯৭০	১৯৭১-১৯৭৫	১৯৭৬-১৯৭৮	১৯৭৯-১৯৮৫
ইউরোপ	-	-	৩	-	১	৪	-	-
আফ্রিকা	-	-	৩	২০	৩২	১৯	৭	৮
ল্যাটিন আমেরিকা	২৬	১৫	১৩	২১	১১	১২	৪	৪
মধ্যপ্রাচ্য	৪	৮	৪	১০	১০	৩	২	৪
এশিয়া	৩	৭	১৪	২০	৮	৫	৬	৬
মোট	৩৩	৩০	৩৭	৭১	৬২	৪৩	১৯	২২

উৎস ঃ এসবর্ন এইড এবং মরেক দী, (সম্পাদিত) ঃ *প্রবেণ্টমস অব কনটেমপরারি মিলিটারিজম*, লন্ডন, গ্রেম হেম, ১৯৮৫, পৃ-৩৮৫; এমাজউদ্দিন আহমদ, মিলিটারি রুল এন্ড দি মিথ অব ডেমোক্র্যাসি, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৮৮. পৃঃ ২।

এসব সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা যদি আমরা বাৎসরিকভাবে হিসাব করি, তবে দেখা যায় যে ১৯৬১ সালে বিশ্বের মোট স্বাধীন দেশের শতকরা ১২ টি সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। ১৯৬৬ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯ ভাগ, ১৯৭৩ সালে ২৭ ভাগ এবং ১৯৭৫ সালে ২৯ ভাগ (মার্জিয়ট্টা ১৯৭৬ঃ ২১৪)। ১৯৮০ দশকে এরকম অভ্যুত্থানের ঘটনা কিছুটা হ্রাস পায়, ১৯৮০ সালে সামরিক শাসনের অধীনে থাকা দেশের সংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগের কম এবং ১৯৮৪ সালেও তা শতকরা ২৩ ভাগ বিদ্যমান ছিল। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা কমতে থাকে এবং ১৯৯০-এর দশকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে (লিরিয়া ১৯৯৩; সিইটজ ১৯৯১; অশকেনাজ ১৯৯৪)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সফল এবং ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সংখ্যা ছক ২.১ এবং ২.২-এ দেখানো হয়েছে।

১৯৪৫-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ৩১৭টি সফল অভ্যুত্থান ঘটে এবং ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানসহ ঐ সময়ে মোট সফল অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সংখ্যা ৬১৬টি (ছক ২.১ এবং ২.২)। এগুলোর মধ্যে আফ্রিকায় ঘটে ২০৩টি, ল্যাটিন আমেরিকায় ২০৮টি, এশিয়ায় ১১৩টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৭৪টি এবং বাকিগুলো ঘটে ইউরোপে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে সবচেয়ে বেশি সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। এই প্রবণতা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার ঘটনাগুলোতে যেখানে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি দেশের প্রেসিডেন্টের পদ প্রতি দশকের যে কয়টি ঐ সময় মিলিটারিদের দখলে ছিল তার অনুপাত ক্রমাগত উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। ১৯১৭–১৯২৭ সাল পর্যন্ত দশ বছরের শতকরা ২৮.৭ ভাগ সময় প্রেসিডেন্টের পদ সামরিক বাহিনীর দখলে ছিল, ১৯২৭-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দশ বছরে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৮.৫ ভাগ, ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৪৯ ভাগ এবং ১৯৪৭-৫৭ সাল পর্যন্ত ৪৫ ভাগ (হানটিংটন, ১৯৬২ঃ৩৩)।

ছক ২.২ ঃ ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের সংখ্যা (১৯৪৫-১৯৮৫)

অঞ্চল	১৯৪৫-১৯৫০	১৯৫১-১৯৫৫	১৯৫৬-১৯৬০	১৯৬১-১৯৬৫	১৯৬৬-১৯৭০	১৯৭১-১৯৭৫	১৯৭৬-১৯৭৮	১৯৭৯-১৯৮৫
ইউরোপ	৩	-	১	৩	১	৩	-	-
আফ্রিকা	-	২	৫	২৫	৪১	১৭	১০	১৪
ল্যাটিন আমেরিকা	২০	১৪	৩১	২০	৭	৯	১	-
মধ্যপ্রাচ্য	১	১	৫	৯	৯	৪	-	-

এশিয়া	১০	৩	৭	১৩	৪	১	২	৪
মোট	৩৪	২০	৪৯	৭০	৬২	৩৪	১৩	১৮

উৎস ঃ ছক ২.১ এর অনুরূপ।

অঞ্চল এবং দেশ ভেদে সামরিক হস্তক্ষেপের মাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে এবং সমাজের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে কোন সার্বজনীন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এমনও রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলো বারবার সামরিক শাসনের অধীনে পতিত হয়েছে এবং সমাজের সার্বিক কাঠামো সামরিক আদর্শের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৬ এবং ১৯৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইরাক ৭ বার সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার হয়। পরবর্তীতে ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৮ সালে আরও ৬ বার এখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে (ফিনার, ১৯৭৫)। সিরিয়ায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে চারবার অভ্যুত্থান ঘটে এবং ১৯৬২, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৬ সালে সংঘটিত ৬টি ব্যর্থ অভ্যুত্থান ছাড়াও ১৯৬১ এবং ১৯৭০ সালে আরও দু'টি সফল সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। সুদানেও ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬৯ এবং ১৯৮৪ সালে সফল অভ্যুত্থানসহ ১৯৭১ সালে দু'টি ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড এ ব্যাপারে অদ্বিতীয়। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এখানে ৮টি সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। তবে ল্যাটিন আমেরিকায় এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। কেনেডি দেখিয়েছেন যে, ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে তথা ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি দেশের মধ্যে ৪টিতে যেমন- বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, হন্ডুরাস এবং ইকুয়েডর-এ মোট অভ্যুত্থানের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই সংঘটিত হয়েছে (কেনেডি, ১৯৭৪ ঃ ৩০)। সাবসাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের উপর গবেষণায় দেখা যায় যে, শুধু ১৯৬০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সরকার উৎখাতের ৯০টি চক্রান্ত, ৬০টি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা এবং ৫০টি সফল অভ্যুত্থান ঘটে (অরকেন্ড করপোরেশন, সিইটজ ১৯৯১ ঃ ৬৫-এ উদ্ধৃত)। এসব কিছু বিবেচনায় রেখে ১৯৭৭ সালে জোসেফ লপালম্বারা মন্তব্য করেন– "সেনা অভ্যুত্থান এখন এতটাই নিয়মিত এবং ব্যাপক ঘটনা যে এটা যে কোন নির্বাচনের মত তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে" ("ফরওয়ার্ড" ইন নর্ডলিংগার ১৯৭৭ ঃ x)। তার প্রায় সাত বছর আগে, জনোইটজ একই সুরে, একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে (অ-পশ্চিমা রাষ্ট্রে) সামরিক হস্তক্ষেপ একটি সাধারণ বিষয়; বরং বেসামরিক কর্তৃত্বের দীর্ঘস্থায়ী অনড় অবস্থান একটি বিচ্যুত ব্যাপার যা বিশেষ তদন্তের দাবী রাখে (জনোইটজ, ১৯৭১ ঃ ৩০৬)।

হস্তক্ষেপের মাত্রার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা উপসংহার টানতে পারি যে সেনাবাহিনী একটি পৃথক রাজনৈতিক শক্তি, কারণ তারা ক্ষমতার কাঠামোর একটি অংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তারা বর্তমানেও করছে। তাই এটি একটি রাজনৈতিক ঘটনারই নিদর্শন যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যমূলক (আহমেদ ১৯৮৮ ঃ ৫)। এ কারণেই রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং এর প্রভাব নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিকাশ হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী সেনা সদস্যদের ভূমিকা এই দিক থেকে স্বতন্ত্র, যে এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ; রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত এর মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণের পদক্ষেপ নয়, যদিও প্রকাশ্যে এটাও ছিল রাজনৈতিক স্বভাবের। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সেনারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খার দ্বারা; তাঁদের সংস্থাভুক্ত স্বার্থে নয়। যদিও ৮ম অধ্যায়ে আমরা দেখব, নতুন রাষ্ট্রে তাঁরা তাঁদের স্বার্থের ব্যাপারে একেবারে অসচেতন ছিলেন না। অবশ্য অধিকাংশ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই পরার্থবাদী দাবি করে; জনগণের আকাঙ্খা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

যেহেতু সামরিক হস্তক্ষেপকে একটি নতুন দেশের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান হিসাবে দেখা হয়, তাই কেন এবং কিভাবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট পান্ডিত্যপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সামরিক বাহিনীর তুলনামূলক শক্তি এবং তুলনামূলক অনুন্নত বেসামরিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন (মে. লসন এবং সেলোচেন ১৯৯৮ঃ২)। এসব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে শৃঙ্খলা ও নিবিষ্টতা, পদসোপান ও কেন্দ্রীভূত নির্দেশ এবং একতাসহ সিদ্ধান্ত প্রনয়ণ ও নির্বাহী পর্যায়ে প্রস্তুত করে। এ কারণেই জেনারেলগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হন, যদি তাঁরা তা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই বিষয়ে যাঁরা বিস্তারিতভাবে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের বড় অবদান আছে তাঁরা হলেন– শিলস (১৯৬২), পাই (১৯৬২, ১৯৬৬), ফিনার (১৯৬২), জনসন (১৯৬২), হলপার্ন (১৯৬৩), জনোইটজ (১৯৬৪), ভন দার মেহডেন (১৯৬৪), হান্টিংটন (১৯৬৮), জোলবার্গ (১৯৬৮), ডালডের (১৯৬৯), ডাউজ (১৯৬৯), লেফিবার (১৯৭০), বাইয়েনে (১৯৭১, ১৯৮৩), লিসাক (১৯৭৬), পার্লমার্টার (১৯৭৭, ১৯৮১), স্টেপ্যান (১৯৭৮, ১৯৮৮), ক্রাউচ (১৯৮৫) এবং চেজান (১৯৮৮) এবং আরও অনেকে।

এই যুক্তি বিন্যাসের একটি বিকল্প ধারা সশস্ত্র বাহিনীর সংস্থার স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। তাঁদের সংস্থার স্বার্থে যেকোন হুমকি তাঁদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে উদ্বুদ্ধ করে। সামরিক বাহিনীর সংস্থার স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে যখন তাঁরা বঞ্চিত হন অথবা তাঁদের স্বতন্ত্র অথবা পেশাগত দায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় (উদাহরণস্বরূপ, জনোইটজ ১৯৬৪; ফার্স্ট ১৯৭০; বাইনিন ১৯৭১; হেক্স ১৯৭৩; থম্পসন ১৯৭৩; নর্ডলিংগার ১৯৭৭; হরোইটজ ১৯৮০; ক্লাফেম এবং ফিলিপ ১৯৮৫; রাউক ১৯৮৭)।

যুক্তি বিন্যাসের উভয় ধারাতেই সামষ্টিক একতার দিক থেকে সামরিক বাহিনীকে একটি দৃঢ় সমন্বিত সত্তা হিসেবে দেখা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃতীয় ধারার মতামতে সামরিক বাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে এভাবে "বৃহত্তর সিভিল সমাজের একটি অংশ, একই শ্রেণীভুক্ত, আঞ্চলিক এবং শ্রেণী বিভাজন, আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষপ্রবণ এবং কোন বিশেষ সময়ে কোন রাজনৈতিক দলাদলিতে পক্ষাবলম্বনে আগ্রহী সংস্থা হিসেবে" (মে, লসন এবং সেলোচেন ১৯৯৮ ঃ ৩)। সেনাবাহিনীতে যে অন্তত সম্ভাব্যরূপে খন্ডিত–এই ধারণার প্রাধান্য রয়েছে সেসব দেশে যেখানে সেনাবাহিনীতে একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত রয়েছে এবং যেখানে ঔপনিবেশিক আমলে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তথাকথিত ''যুদ্ধবাজ জাতি" থেকে অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে; প্রধান সম্প্রদায়গুলো থেকে নয় (ডালডার ১৯৬৯; গাইয়ট ১৯৭৪; কবওয়েজার ১৯৭৪; মাজরুই ১৯৭৬; হানসেন ১৯৭৭; নর্ডলিংগার ১৯৭৭; এনলো ১৯৮০; হরোইটজ ১৯৮৫ এবং গাও ১৯৯১)। সামরিক বাহিনী গঠনে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব আন্ত-সামরিক দলাদলির প্রধান কারণ। ১৯৯০ সালে অরকেন্ড কর্পোরেশনের গবেষণায় বলা হয় যে, আন্তঃসামরিক দলাদলিই অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে উস্কে দেয় (সিইটজ ১৯৯১ ঃ ৭০)। কিছু গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু অভ্যুত্থান নতুন সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু কিছু আবার শাসন পদ্ধতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পরিচালিত (হান্টিংটন ১৯৬৮; হোডলি ১৯৭৫; চেজান ১৯৮৮ ও আরও অনেকে, লাক্ষাম ১৯৯১)। তবে, এই ব্যাখ্যাগুলো যথেষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক এবং সামাজিক বিষয়গুলো মিশ্রিত হয়েছে (ওয়েলচ ১৯৭৪ ঃ ১৩৫)। দুই ধরনের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা বেশি থাকে। প্রথমত, যেসব রাষ্ট্রে ঐতিহ্যবাহী অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেসব শাসন ব্যবস্থা ''যাদের প্রাথমিক সমর্থন আসে নিম্ন শ্রেণী থেকে এবং যারা ক্ষমতায় আসে রাজনৈতিক কর্মী ও অধস্তন কৃষকদের সমর্থনে" সেইসব দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা বেশি (নর্ডলিংগার ১৯৭০ ঃ ৭৭)। এসব কিছু থেকে বোঝা যায় যে, সামরিক হস্তক্ষেপের আবর্তক

বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা তাদের বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির ধারণা দেয়। এভাবে দেখা গেছে যে, কোন কোন দেশে সেনাবাহিনী অথবা সেনাবাহিনীর মধ্যে দলাদলি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উপায় হিসাবে কাজ করে। (মে, লসন এবং সেলোচেন, ১৯৯৮ ঃ ৫)। কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বেসামরিক শাসন দূর করার জন্যও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়। এইদিক মাথায় রেখে ১৯৯০ সালে বেবলার লিখেছিলেন, "স্বীকৃত হোক বা না হোক সবদেশেই রাষ্ট্রতন্ত্রে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমনকি সৈনিকরা ব্যারাকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং এভাবে বেসামরিক শাসকদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ ভোগ করে (বেবলার ১৯৯০ ঃ ২৬২-২৬৩)।

১৯৭১ সালের মার্চে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের ভূমিকা কিভাবে আমরা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করব? কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁদের হস্তক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক, কিন্তু তাঁরা নগ্নভাবে ক্ষমতা দখল করতে চাননি অথবা কোন অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের অপসারণ করতে যাননি অথবা সরকারে যৌথ অংশদারিত্বের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। তাঁরা তাঁদের মূল অংশ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁদেরই একজন নেতা, মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরা ঐ সংকটপূর্ণ সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী জেনারেলরা পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে বল প্রয়োগ-পূর্বক পূর্ব-পাকিস্তানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেন এবং তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি দখলকৃত রাজ্যের মত আচরণ করে। অন্যদিকে বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করতে তথা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

তা হলে এই যুদ্ধকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? পাকিস্তান সরকার এটাকে "আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ" বা নাগরিক আন্দোলন হিসাবে দেখেছে (জিওবি ১৯৮১)। কিছু ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এটাকে দু'টি শত্রুভাবাপন্ন দেশের মধ্যে "পৌরাণিক যুদ্ধ" হিসেবে দেখেছেন (পলিট ১৯৭২; প্রাণ চোপড়া ১৯৭২; মোহাম্মদ আইয়ূব এবং কে সুব্রহমনিয়াম, ১৯৭২)। বাংলাদেশের কিছু সামরিক অফিসার যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন তাঁরা এটাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ''স্বাধীনতা যুদ্ধ'' হিসেবে দেখেন (ভূঁইয়া ১৯৭২; ইসলাম ১৯৮১; সফিউলণ্যাহ ১৯৮৯)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা এই যুদ্ধকে "মুক্তিযুদ্ধ" হিসাবে দেখেন। আবার এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে

গিয়ে কিছু একাডেমিশিয়ান এটাকে বলেছেন "একটি বিপণ্ডব" (জ্যাকসন ১৯৭৫; লোশেক ১৯৭২; তালুকদার ১৯৮০; আহমেদ ১৯৮৮)।

এই গবেষণায় এই যুদ্ধকে "মুক্তিযুদ্ধ" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর শুরুকে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, কারণ এটা শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে এবং ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সেনা অফিসারদের বিদ্রোহ, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং যুদ্ধের শুরু, এই ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় ইয়াহিয়া খানের ভূমিকার জন্য যখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ছাড়াই শক্তির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োগ করে, ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করেন। তখন থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের নিকট হানাদার বাহিনী হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানের বিপণ্ডবী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী সশস্ত্র বাহিনী ও সমাজের সকল স্তরের লোক তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বিপণ্ডবে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের ভূমিকা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, *মিলিটারি রুল এন্ড দি মিথ অব ডেমোক্র্যাসি*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৮৮।

২। অশকেনাজ, ডি. সম্পাদিত *দি মিলিটারি ইন দি সার্ভিস অব সোসাইটি এন্ড ডেমোক্র্যাসি*; *দি চ্যালেঞ্জ অব দি ডুয়েল-রোল মিলিটারি*, *ওয়েস্ট পোর্ট*; গ্রিনউড প্রেস, ১৯৯৪।

৩। আইয়ুব, মোহাম্মদ এবং সুব্রহমনিয়াম, কে., *দি লিবারেশন* ওয়ার, নয়াদিলণ্টীঃ এস. চাঁদ, ১৯৭২।

৪। বেবলার, এ., *"টাপোলোজিস বেসড অন সিভিলিয়ান-ডমিনেটেড ভার্সাস মিলিটারি-ডমিনেটেড পলিটিক্যাল সিস্টেম"* ইন এ বেবলার এবং জে সেরোকা. (সম্পাদিত) কনটেম্পোরারি পলিটিকাল সিসটেম; ক্লাসিফিকেশন এন্ড টাইপোলজি, বোলডার : লিন রাইনার, ১৯৯০।

৫। ভূঁইয়া, এস. এ. (মেজর জেনারেল), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ঢাকাঃ আহমেদ পাবলিশিং, ১৯৭২।

৬। বাইনেন, এইচ., *দি মিলিটারি এন্ড মডার্নাইজেশন*, শিকাগো ঃ আলদিন এলবারটন, ১৯৭১।

৭। _____"আর্মড ফোর্সেস এন্ড ন্যাশনাল মডার্নাইজেশন", কমপ্যারেটিভ পলিটিক্স, ১৬(১)১৯৮৩।

৮। চেজান, এন., মোর্টিমার, আর., রেভেনহিল, জে. এবং রথচাইল্ড, ডি., *পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন কনটেমপরারি আফ্রিকা*, বল্ডার ঃ লিন রাইনার, ১৯৮৮।

৯। চোপড়া, প্রাণ, "ইস্ট বেঙ্গল ঃ *এ ক্রাইসিস ফর ইন্ডিয়া*", *ওয়ার্ল্ড টু ডে*, ১৯৭২ (সেপ্টেম্বর)।

১০। ক্লাফাম, সি. এবং ফিলিপ, জি. (সম্পাদিত), *দি পলিটিক্যাল ডাইলেমা অব মিলিটারি রেজিম্স*, লন্ডন ঃ গ্রুম হেল্ম, ১৯৮৫।

১১। ক্রাউচ, এইচ., *''দি মিলিটারি এন্ড পলিটিকস ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া''* ইন এইচ, এ জাকারিয়া এন্ড এইচ ক্রাউচ সম্পাদিত মিলিটারি-*সিভিল রিলেশনস ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া*, সিঙ্গাপুর ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৫।

১২। ডেল্ডার, এইচ., *দি রোল অব দি মিলিটারি ইন দি ইমার্জিং কান্ট্রিজ*, এস. গ্রাভেনহেজ ঃ মাউটন, ১৯৬৯।

১৩। ডাউজ, আর. ই., *"দি মিলিটারি এন্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট"* ইন সি লেইস (সম্পাদিত) *পলিটিকস এন্ড চেঞ্জ ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস*, কেমব্রিজঃ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯।

১৪। এইড, এবর্জন এন্ড মরেক দী (সম্পাদিত), *প্রবেণ্টমস এন্ড কনটেমপরারি মিলিটারিজম*, লন্ডন ঃ গ্রুম হেল্ম, ১৯৮৫।

১৫। এনলো, সি., এথ্নিক সোলজার্স ঃ *স্টেট সিক্যুরিটি ইন ডিভাইডেড সোসাইটিস*, হারমোন্ডয়ার্থ ঃ পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৮০।

১৬। ফিনার, এস. ই., *দি ম্যান অন হর্সব্যাক*, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৭৫।

১৭। ফার্স্ট, আর., *দি ব্যারেল অব গান ঃ পলিটিক্যাল পাওয়ার ইন আফ্রিকা এন্ড দি কু ডেট*, লন্ডন ঃ এলেন লেইন, ১৯৭০।

১৮। তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১৯৮১।

১৯। গও, জে., *লেজিটিমেসি এন্ড দি মিলিটারি ঃ* দি যুগোশণ্ডাভ ক্রাইসিস, লন্ডন ঃ পিন্টার, ১৯৯১।

২০। গাইয়ট, জে. এফ., *"এথ্নিক সেগমেন্টেশন ইন মিলিটারি অর্গানাইজেশনস ঃ বার্মা এন্ড মালয়েশিয়া"* ইন সি. ম্যাক কেলেহার (সম্পাদিত) *পলিটিক্যাল মিলিটারি সিস্টেমস ঃ কমপ্যারেটিভ পারসপেকটিভস*, বেভারলি হিল্স সেজ, ১৯৭৪।

২১। হালপার্ন, এম., *দি পলিটিকস অব সোস্যাল চেঞ্জ ইন দি মিডল ইস্ট এন্ড নর্থ আফ্রিকা*, প্রিন্সটনঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

২২। হেইক্স, জে. ই., *উইক পার্লামেন্টস্ এন্ড মিলিটারি কু ইন আফ্রিকা ঃ এ স্টাডি ইন রেজিম ইন্সটাবিলিটি*, সেজ রিচার্স পেপারস ইন সোস্যাল সাইন্সেস, ১৯৭৩।

২৩। হেনছেন, এইচ, বি., *এথনিসিটি এন্ড মিলিটারি রূল্ ইন উগান্ডা*, এ স্টাডি অফ এথনিসিটি এ্যাজ এ পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর ইন উগান্ডা, উপসালা ঃ স্ক্যানডিনেভিয়ান ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজ, ১৯৭৭।

২৪। হোডলি, জে. এস., *সোলজারস এন্ড পলিটিকস; সিভিল মিলিটারি রিলেশনস ইন কমপ্যারেটিভ পার্সপেকটিভ*, ক্যামব্রিজ ঃ স্কিঙ্কম্যান পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৫।

২৫। হরোউটজ, ডি. এল., *কু থিওরিস এন্ড অফিসার্স মোটিভ্স; শ্রীলংকা ইন কমপ্যারেটিভ পার্সপেকটিভ, প্রিন্সটন ঃ* প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮০।

২৬। হান্টিংটন, এস. পি., *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটি*, নিউ হ্যাভেন ঃ ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

২৭। ইসলাম, আর. (মেজর), এ টেইল অব মিলিয়নস, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১।

২৮। জে. জে. জনসন (সম্পাদিত) *দি রোল অব দি মিলিটারি ইন আন্ডারডেভেলপড্ কান্ট্রিস*, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২।

২৯। জ্যাকসন, আর., *সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস ঃ ইন্ডিয়া; পাকিস্তান; বাংলাদেশ*, লন্ডন ঃ ছাথো এ্যা⁼ উইন্ডাস, ১৯৭৫।

৩০। জনোইটজ, এম., *দি মিলিটারি ইন দি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অব নিউ নেশনস্ ঃ এন এসে ইন কমপ্যারেটিভ অ্যানালাইসিস*, শিকাগো ঃ শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪।

৩১। জনোউটজ, এম., *"দি কমপ্যারেটিভ এনালাইসিস অব মিডল ইস্টার্ন মিলিটারি ইনসটিটিউশনস"* ইন এম. জনোউটজ এ⁼ জে. ভ্যান ডোর্ন (সম্পাদিত) *অন মিলিটারি ইন্টারভেনশন*, রোটেরডাম : রোটেরডাম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

৩২। কেনেডি, গ্যাভিন., *দি মিলিটারি ইন দি থার্ড ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন ঃ জেরাল্ড ডাকওয়ার্থ, ১৯৭৪।

৩৩। কবওয়েজার, টি. বি., *দি পলিটিকস অব স্টেট ফরমেশন ঃ দি ন্যাচার এন্ড ইফেক্টস অব কলোনিয়ালিজম ইন উগান্ডা*, নাইরোবি ঃ ইস্ট আফ্রিকান লিটারেচার ব্যুরো, ১৯৭৪।

৩৪। লিফিবার, ই., স্পিয়ার এন্ড স্কোপটার ঃ *আর্মি পুলিশ এন্ড পলিটিকস ইন ট্রপিক্যাল আফ্রিকা*, ওয়াসিংটন ঃ দি ব্রুকিংস ইনসটিটিউট, ১৯৭০।

৩৫। লিরিয়া, ওয়াই. এ., ভূগমভিল *ডায়েরী*, মেলবোর্ন, ইন্দিরা পাবলিশিং, ১৯৯৩।

৩৬। লিসাক, এম., *মিলিটারি রোলস্ ইন মডার্নাইজেশন ঃ সিভিল-মিলিটারি রিলেশনস্ ইন থাইল্যান্ড এন্ড বার্মা*, বেভার্লি হিলস, সেজ, ১৯৪৬।

৩৭। লোশাক, ডেভিড, পাকিস্তান ক্রাইসিস্, লন্ডন ঃ হেইনিম্যান, ১৯৭২।

৩৮। লাক্ষাম, এ. আর., *"ইনট্রোডাকশন ঃ দি মিলিটারি, দি ডেভেলপমেন্টাল স্টেট এন্ড সোস্যাল ফোসেস্ ইন এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক ঃ দি ইসুজ ফর কমপ্যারেটিভ এনালাইসিস"* ইন সিলোচেন (সম্পাদিত) *দি মিলিটারি, দি স্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক*। বোল্ডার ঃ ওয়েস্ট ভিউ প্রেস, ১৯৯১।

৩৯। মার্জিওটা, এফ. ডি., *"সিভিলিয়ান কন্ট্রোল এন্ড দি মেক্সিক্যান মিলিটারি ঃ চেঞ্জিং প্যাটার্নস অব পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স"* ইন সি. ই. ওয়েলচ (সম্পাদিত), *সিভিলিয়ান কন্ট্রোল অব দি মিলিটারি*, এলবানি ঃ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক প্রেস, ১৯৭৬।

৪০। মাজরুই, এ. এ., *"সোলজারস্ এন্ড ট্রেডিশনালাইজারস ঃ মিলিটারি রূল্ এন্ড দি রি-আফ্রিক্যানাইজেশন অব আফ্রিকা"*, ওয়ার্ল্ড পলিটিকস, (১৯৭৬) ২৪৬-৭২।

৪১। নর্ডলিংগার, ই. এ., *"সোলজার্স ইন পলিটিকস্ ঃ মিলিটারি কু এন্ড গভর্নমেন্ট*, ইনগেল উড ক্লিফসঃ প্রেনটিস হল, ১৯৭৭।

৪২। পালিত, ডি. কে., (মেজর জেনারেল), *দি লাইটিনিং ক্যামপেইন ঃ ইন্দো- পাকিস্তান ওয়ার*, নয়া দিলিণ্ড ঃ টমসন, ১৯৭২।

৪৩। পার্লমিউটার, এ., *দি মিলিটারি এন্ড পলিটিকস ইন মডার্ন টাইমস*, নিউ হ্যাভেন ঃ ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৭।

৪৪। *পলিটিক্যাল রোলস্ এন্ড মিলিটারি রূলার্স*, লন্ডন ঃ ফ্রাঙ্ক কাস, ১৯৮১।

৪৫। পাই, এল., *এসপেক্টস্ অব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট*. বোস্টন, লিটল ব্রাউন এন্ড কো. ১৯৬৬।

৪৬। পাই, এল., *"আর্মিস ইন দি প্রসেসিং অব পলিটিক্যাল মডার্নাইজেশন"* ইন জে. জে জনসন (সম্পাদিত), *দি রোল অব দি মিলিটারি ইন আন্ডারডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিস*, প্রাগুক্ত।

৪৭। আর. জে. মে, স্টিফেনি লাসন এবং ভিবার্টো সিলোচেন, *"ইন্ট্রোডাকশন, ডেমোক্র্যাসি এন্ড দি মিলিটারি ইন কমপ্যারেটিভ পারসপেক্টিভ" ইন* আর জে. মে এন্ড ভিবার্টো সিলোচেন (সম্পাদিত), *দি মিলিটারি এন্ড ডেমোক্র্যাসি ইন এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক*, লন্ডন ঃ সি. হার্স্ট এন্ড কোং লি., ১৯৯৮।

৪৮। রউকি, এ., *দি মিলিটারি এন্ড দি স্টেট ইন ল্যাটিন আমেরিকা*, বারকলে ঃ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৮৭।

৪৯। এস, পি, হান্টিংটন (সম্পাদিত), *চেঞ্জিং প্যাটার্নস্ অব মিলিটারি পলিটিকস*; নিউইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস ১৯৮৯।

৫০। শফিউলণ্ঢাহ, কে. এম., (মেজর জেনারেল), *বাংলাদেশ এট ওয়ার*, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৬২।

৫১। সিইটজ, এস. টি., *"দি মিলিটারি ইন বণ্ঢ্যাক আফ্রিকান পলিটিকস"* ইন সি. এইচ. কেনেডি এন্ড ডি. জে. লাউছার (সম্পাদিত), *সিভিল মিলিটারি ইন্টারেকশন ইন এশিয়া এন্ড আফ্রিকা*, লেইডেন ঃ ই.জে. ব্রিল, ১৯৯১।

৫২। শীলস্, ই., *"দি মিলিটারি ইন দি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অব নিউ স্টেটস্"* ইন জে. জে. জনসন (সম্পাদিত), *দি রূল অব দি মিলিটারি ইন আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিস*, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২।

৫৩। স্টেপ্যান, এ., *দি স্টেইট এন্ড সোসাইটিঃ পেরু ইন কমপ্যারেটিভ পারসপেকটিভ*, প্রিন্সটনঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮।

৫৪। _____, *রিথিংকিং মিলিটারি পলিটিকস ঃ ব্রাজিল এন্ড দি সাউথার্ন কন*, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮।

৫৫। তালুকদার, মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশ রিভ্যুলিশন এন্ড ইটস আফটারম্যাথ*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮০।

৫৬। ভন ডার মেডেন, এফ. আর., *পলিটিকস্ অব দি ডেভেলপিং ন্যাশনস*, এংগেলউড ক্লিফস ঃ প্রেনটিস হল, ১৯৬৪।

৫৭। ওয়েলচ, সি. ই., *"পারসনালিজম এন্ড কর্পোরেটিজম ইন আফ্রিকান আর্মিস"* ইন সি. ম্যাক কেলেহার (সম্পাদিত) *পলিটিক্যাল-মিলিটারি সিস্টেমস কমপ্যারেটিভ পারসপেকটিভস, বেভারলি হিলস* ঃ সেজ, ১৯৭৪।

৫৮। জোলবার্গ, এ., *"দি স্ট্রাকচার অব পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট ইন দি নিউ স্টেইটস অব ট্রপিক্যাল আফ্রিকা"*, ইন অ্যামেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, ৬২ (৭০-৮৭), ১৯৬৮।

অধ্যায়-৩

বাঙালি সেনাবাহিনীর ভূমিকা ঃ ১৯৭১ সাল এর মুক্তিযুদ্ধে

যুদ্ধের প্রকার

বিজিত সমাজের বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও শক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে কোন কোন যুদ্ধ সমাজের ত্রাণকর্তারূপে আভির্ভূত হতে পারে। কিছু যুদ্ধে বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো জড়িত থাকায় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে। যুদ্ধকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়; আবার আভ্যন্তরীণ বা গৃহযুদ্ধও হতে পারে (মারগিওথা, ১৯৮৩ ঃ ১০৪০-৪৮)। দূর অতীতের ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ/ধর্মযুদ্ধ (১০৯৯-১২০৪), নিকট-অতীতের "মাস্টার রেইস থিওরি" ও সাম্প্রতিক কালের নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুষ শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধমতবাদ মেসিয়ানিক দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। তাই বিভিন্ন প্রকৃতির যুদ্ধের সর্বজনস্বীকৃত কোন পরিভাষা নেই। যুদ্ধরত জাতির বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ কাজে লাগিয়ে সার্বিক যুদ্ধ হতে পারে। 'সার্বিকতা' বলতে সংশিণ্টষ্ট দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের সম্পূর্ণ সমবেতকরণকে বুঝায়ঝায়। শুধু প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পণে বাধ্য হলে এরূপ যুদ্ধ শেষ হয়। যখন যুদ্ধরত জাতি সীমিত সামরিক শক্তি কাজে লাগায় তখন সীমিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গতানুগতিক যুদ্ধে পারমাণবিক, জীবাণু বা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় না। তবে যুদ্ধরত দেশে এরূপ অস্ত্রের প্রাপ্যতা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, ব্যাপক পরিধির যুদ্ধে সম্পূর্ণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। যাতে পারমাণবিক, জীবাণু বা রাসায়নিক অস্ত্রও ব্যবহৃত হতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতর যুদ্ধে শুধু আক্রান্ত এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি অনেকটা যুদ্ধ ও শান্তির মাঝামাঝি অবস্থা। বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি বা যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের প্রতি সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অথবা সামরিক প্রত্যাঘাতের জন্য এমন যুদ্ধ হয়ে থাকে। যা সাধারণত বল প্রয়োগের হুমকি থাকে এমন কূটনীতির অনুরূপ। এক্ষেত্রে অস্ত্র ও পদ্ধতি অত্যন্ত সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয় (মারগিওথা, সম্পাদিত, ১৯২০ঃ ১০৪৮)। যারা যুদ্ধ চালিয়ে

যান বা যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন তাদের মতে, যুদ্ধ কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন ঃ দেশ জয়ের যুদ্ধ, নিবৃতিমূলক যুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ।

যুদ্ধের রীতি-নীতি সম্বন্ধে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণাকর্মে দেখা যায়, মানবজাতির ইতিহাস পরিক্রমায় যুদ্ধের প্রতি মানুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। (ব্রিনটন ১৯৫৮ ঃ ওয়ালজার ১৯৬৫, পেটী ১৯৫৮; জনসন ১৯৬৪, সোলা পোল এটএল ১৯৬৩; চেম্বারলিন ১৯৫২; জনসন ১৯৬২; জোভেনাল ১৯৬২)।

সুবিন্যস্ত সমষ্টিক সহিংসতা কিংবা শক্তি অথবা বিশ্বাসের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যুদ্ধ সংঘটিত করতে পারে। এটা উপজাতীয় বংশানুক্রমিক সহিংসতা থেকে বর্তমান সময়ের সামরিক শাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। পৌরাণিক যুদ্ধের সাথে শিল্পায়িত বিশ্বের যুদ্ধের খুব কমই মিল রয়েছে, তবে এটি শুধু প্রযুক্তিগত ব্যাপার নয়। সামন্ত যুগে যুদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। মাঝে মাঝে বীরত্বের প্রকাশ ঘটানোর জন্য যুদ্ধ সংঘটিত করা হত। আধুনিক যুগের প্রারম্ভভাগে যুদ্ধ সামরিক শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। অবশেষে সার্বিক যুদ্ধ জাতির সবকিছুকে বিপদগ্রস্ত করার দায় হিসেবে প্রতিভাত হয়। তবু যেখানে দ্বন্দ নিরসনের অন্য সকল কূটনৈতিক উপায় ব্যর্থ হয়, সেখানে এখনও যুদ্ধ দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় হিসাবে স্বীকৃত।

পৌরাণিক যুগে যুদ্ধবিগ্রহসহ সমাজের সব ক্ষেত্রে ধর্মের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। Bellum justum এর মতে "ন্যায় যুদ্ধ একটি শ্রেষ্ঠ প্রত্যয়"। কিন্তু মেকিয়াভেলি প্রদত্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণা যুদ্ধের প্রতি মানুষের মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় (মেকিয়াভেলি, ১৯৫০ঃ ১৮৩-১৮৬)। তিনিই প্রথম যুদ্ধ হতে নৈতিকতার সকল আচ্ছাদন ছিঁড়ে ফেলেন; যেমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ধারণায়। যুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি 'রাষ্ট্রের স্বার্থকে' বড় করে দেখতেন। তার ভাষায়, "যখন একটি দেশের নিরাপত্তা কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচার কি অবিচার, মানবতা কি নিষ্ঠুরতা অথবা গৌরব কি লজ্জা কোন কিছু স্থান পাওয়া উচিত নয়" (মেকিয়াভেলি, ৪১)।

ক্লোজউটজের মতাবলম্বী লেখকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সংযতাচারের কথা বলেছেন। তারা কেবল কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগের কথা উলেণ্টখ করেন। পরবর্তী লেখকগণ যখন যুদ্ধকে শুধু রাষ্ট্রের কারণে যৌক্তিক মর্মে সমর্থন করেন। তবে তারা কোন কিছুকে সামরিক অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হতে বাদ দেননি; বরং সবকিছু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে উলেণ্টখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের যুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন যদ্বারা যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি আদর্শ হিসাবে পুরুষিয়ার রাজা ফ্রেডারিক বেসামরিক নাগরিক, গ্রামবাসী, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বন ইত্যাদিকে যুদ্ধে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে

বাদ দিয়েছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসের বড় অংশ জুড়ে রাষ্ট্র নিজেই যুদ্ধের প্রধান নিয়ামক হিসেবে অধিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ও রাশিয়ান বাহিনী যখন পুরুষিয়ার দুটি প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল তখন প্রদেশবাসী নিজেরা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেছিল। তখন রাজা ফ্রেডারিক নিজে তাদেরকে প্রতিরোধ আন্দোলন হতে বিরত থাকতে বলেন। কারণ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রুশোর "সামাজিক চুক্তি মতবাদ" (রুশো, ১৯৬৪ ঃ ৩৫৭) উদ্ধৃতির মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। "যুদ্ধ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে ব্যক্তি কেবল দুর্ঘটনাক্রমে শত্রু হয়; মানুষ ও বেসামরিক হিসাবে নয় সামরিক সদস্য হিসাবে।"

তবে তখনকার চেয়ে আধুনিক যুদ্ধের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধ রাষ্ট্র জনগণমুখী হয়েছে কারণ জনগণই রাষ্ট্র গঠন করে। আধুনিক লেখকগণ কিছু সময়ে জনমুখী যুদ্ধ এবং সময় সময় জনযুদ্ধের সপক্ষে বলেছেন। ক্লোজউটজ-এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রভাবশালী রচনাসমূহে রাজনীতি ও কূটনীতিই হল যুদ্ধের মূল বিষয়; সরাসরি জনগণ নয়। তিনি গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, "যুদ্ধ রাজনৈতিক লেনদেনের একটি চলমান প্রক্রিয়া বৈ কিছু নয়" (ক্লোজউটজ, ১৯৯২ ঃ ১১৯)। লক্ষ্য অর্জনে যুদ্ধে জড়িত জাতিসমূহ কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে তা যুদ্ধের রাজনীতিক উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ণীত হয়। মাঝে মাঝে যে সকল চুক্তি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় তা তাতে তিক্ততার উৎস হয় না, বরং উভয় পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এ প্রক্রিয়া সমাজে অধিক শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে যা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

গণতন্ত্রায়ণের ফলে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ক্লোজউটজ বর্ণিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যবস্তু ক্রমশ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সেকেলে হয়ে পড়ে। উদাহরনস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (১৯১৩-২১) ক্লোজউটজ নির্দেশিত সীমিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একটি নতুন উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন এবং তা হল, "গণতন্ত্রের জন্য পৃথিবীকে নিরাপদ করা"। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধটি ছিল, 'যুদ্ধাবসানের যুদ্ধ'। সারা বিশ্বের জনগণ এই ভাবাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করে। এভাবে ন্যায় যুদ্ধের নতুন যুগ শুরু হয় এবং নীতিবান ও শান্তিকামী মানুষ কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং এরপরও যুদ্ধের উপর সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনুভূত হয়। আধুনিক যুদ্ধে পুরো জাতির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন, সাথে সাথে প্রয়োজন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও দূর্দশা বহনে তাদের

প্রস্তুতি। যুদ্ধে সাধারণ মানুষের জড়িত হয়ে পড়ার কারণে যুদ্ধের বিষয় ও পরিধি উভয় ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের সম্পৃক্ততা অষ্টাদশ শতক বা তার পূর্বেকার সময়ের মত নয়। নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার না করা সৈনিকদের শত শত বছর ধরে নীতিবিদ্যার একটি অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিংশ শতকে শত্রুদেশের আপামর জনগণ নৌ অবরোধ, আকাশ থেকে ব্যাপক গোলাবর্ষণ এবং অন্যান্য আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এমনকি বৈরিতার অবসানের পরও অনেক ক্ষেত্রে বেসামরিক জনগণকে দেখেন যে, তারা সম্পদ থেকে দখলচ্যুত হয়ে গেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়। মাঝে মাঝে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বর্তমান সময়ের যুদ্ধ নজিরবিহীনভাবে বেসামরিক বলয়ে প্রবেশ করে এবং বেসামরিক লোকজনও সামরিক ধাঁচের হয়ে উঠ।

বিপণ্ডব ও স্বাধীনতা যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে উভয় আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অব্যাহত সামরিক প্রাধান্যের মাধ্যমে দখলকৃত দেশসমূতে শাসনকার্য পরিচালনা করা বিভিন্ন কারণে অনিশ্চিত হয়ে উঠে। উপনিবেশ বিরোধীতার আড়ালে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হলে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন আরও নিবিড় ও তীব্র হয়ে উঠে। উপনিবেশসমূহের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, যাদের অধিকাংশই ইউরোপিয়ান স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষিত, তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সোচ্চারকণ্ঠ হিসেবে আভির্ভূত হন। অধিকন্তু, উপনিবেশসমূহের অনেক অধিবাসীকে ইউরোপসহ বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক প্রভুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এ সব উপাদানসমূহের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

বিংশ শতক জুড়ে উপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সিলনের কথা বলা যায়। ১৯৪৮ সালে ceylon স্বাধীনতা লাভ করে। সশস্ত্র পুলিশ, রাজনীতিক কর্মী এবং সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপের তৎপরতায় স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া ডাচ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৯ সালে চাইনিজ জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস সংগ্রাম করে চীনের মূল ভূ-খন্ডে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সময়ের বিবর্তনে স্বাধীনতা যুদ্ধের ধরণ অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট জাতীয় আন্দোলনে গেরিলাযুদ্ধ কৌশল জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী

গোষ্ঠী, পেশাজীবী ও আধা-সামরিক সংস্থার মত স্বেচ্ছাসেবী দলসমূহ এরূপ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রকৃতির যুদ্ধসমূহ সর্বদা জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ঠমন্ডিত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ এবং স্বকীয়রীতিতে স্বাধীনতা যোদ্ধারা যুদ্ধে অংশ নিত। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং রাজনৈতিকদলের তরুণ কর্মীরা প্রায়শ মার্কস ও লেনিনবাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম বা আলজেরিয়ার অধিবাসীদের সংগ্রাম একটি আদর্শ (গার্টজ, ১৯৬৩)। এ প্রসঙ্গে গিনি ও ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাকেও উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় (ওয়েলারস্টেইন, ১৯৬১)।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সম্মোহনী ক্ষমতাকে (Charisma) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে উৎসাহী করার কাজে ব্যবহার করা হত। সেনাবাহিনীও জাতির ডাকে সাড়া দিত। এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ উপনিবেশে স্বাধীনতার প্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে উঠে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান ও আর্থনীতিক পুনর্গঠনে পুঁজিপতি রাজনীতিকদের প্রত্যাখ্যান ছিল এমন আন্দোলনের প্রধান বিভক্তি। সাধারণ জনপ্রিয়তা ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সমন্বিত ভাবাদর্শ তাদের পরিচালিত করত।

সাধারণত রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু যেখানে ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনীর সহিংসতার আশ্রয় নিত সেখানে সেনাবাহিনীও জড়িয়ে পড়ত। তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং উঠতি পেশাজীবীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তবে ছাত্ররাই স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনসমর্থণ সৃষ্টি করে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। তবে প্রধাণত: ছাত্র এবং সেনাবাহিনীই এমন বিশালায়তন বাহিনী গড়ে তোলে।

'মুক্তিযুদ্ধ' কথাটি কি সংজ্ঞায়িত করা যায়? সাধারণ যুদ্ধের ন্যায় স্বাধীনতা যুদ্ধও একটি জটিল ধারণা। সম্ভবত কোন সরল বা একক সূত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বাওয়ার বেল স্বাধীনতা যুদ্ধকে সামরিক অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ''যদি প্রকৃতই বিশ্বাসী একদল লোক যদি অধিকাংশ মানুষের সমর্থিত এবং অনুধাবন যোগ্য কোন কারণে জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সংগঠিত হতে পারে, তবে যত বাধাবিপত্তিই থাকুক না কেন সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়া যায় (বেল, ১৯৭৬ঃ ৫২৬)। যাদের জন্য তারা সংগ্রাম করছেন তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত থাকার কিংবা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনও অত্যাবশ্যক নয়।

সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও একান্তিক স্পৃহা বিপণ্ঢবের নির্যাস। সাধারণত জাতিগোষ্ঠীর অপরিহার্য স্বার্থচ্যুতির ভীতি, যা মানুষকে জীবন দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত করে না এমন সমন্বিত উদ্দেশ্য বিপণ্ঢবের প্রেরণা ও অস্ত্র তুলে নিতে প্রণোদিত করে।

প্রয়োজনবোধে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে যতদূর মারাত্মক সম্ভব বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এমন ধারণা যা স্বাধীনতা সংগ্রাম, গেরিলা যুদ্ধ, বিপণ্ডব, বিদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহ, অভ্যুত্থান, প্রজাবিদ্রোহ বা গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদিকে একত্রে ধারণ করে। যাহা হউক ইহাতে ধারণাগত পার্থক্য যে নেই তা অস্বীকার করা যাবে না। ১৯৫৬ সালের এক বিশেণ্ডষকের 'হাঙ্গেরিয়ান বিপণ্ডব' এর ধারণা অন্য একজন গবেষক "দি হাঙ্গেরীয়ান বিদ্রোহ" হিসেবে উলেণ্ডখ করেছেন। কারণ তাঁর মতে বিপণ্ডব সফলতা অর্জন করে কিন্তু বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় (Keskemeti, ১৯৬১ঃ ২)। একইভাবে কিছু লেখক আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিপণ্ডব হিসেবে অভিহিত করলেও অন্যদল ভিন্নতা পোষণ করেন (Greene, 1974:7)। আবার এ ধরনের কিছু ঘটনা কখনও 'নতুন যুদ্ধ' হিসাবে বিধৃত হয়েছে। Harry Eckstein নতুন যুদ্ধকে 'অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Eckstein, ১৯৬৪)। কারণ একটি অভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত দুটি ভিন্ন জাতির মধ্যে এরকম যুদ্ধ সংঘটিত সংঘটিত হয় এবং যা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে যায়। এ গবেষণায় 'মুক্তিযুদ্ধের ধারণা' বিষয়টি অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জন চালমারসও ধারণাটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষায়, "ঐ সময় সারা বিশ্বে কমপক্ষে ১৫টি বিভিন্ন প্রকৃতির বিপণ্ডব সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের বিপণ্ডবও রয়েছে। যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশটি বাংলাদেশে পরিণত হয়, (চালমারস; ১৯৮২ ঃ ৯)। ১৯৭১ সালে সংঘটিত পাকিস্তানি (দেশীয় ঔপনিবেশিক) শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে কিছু বাংলাদেশি পণ্ডিতও মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন (আহমেদ ১৯৮৮; তালুকদার, ১৯৮০)। যদিও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এটাকে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন। কারণ এখানে বাঙালি সেনা অফিসারগণ "তাঁদের বৈধ কর্তৃপক্ষের" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

বিপণ্ডব (revolution) শব্দটি জ্যোতিবিজ্ঞান (astronomy) থেকে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দার্শনিকগণ মানবজাতির উন্নয়ন আবর্তন প্রকাশের জন্য শব্দটি ব্যবহার করতেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপণ্ডবের পরই শব্দটি কেবল রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (এরেন্ড, ১৯২৬ ঃ ৩৫-৩৬)। "সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্বকোষে" বিপণ্ডবকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; "সাধারণ অর্থে বিপণ্ডব হল সরকার ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা। এটা মূলত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করার একটি উপায়। বিপণ্ডব বলতে অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সমাজ বিনির্মান তথা মানবজাতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সকল প্রচেষ্টাকেও নির্দেশ করে (এনসাইক্লপিডিয়া অব সোস্যাল সাইন্স, ৫১০)। ক্রেইন ব্রিনটন সীমিত রাজনীতিক বিপণ্ডবকে সমাজ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিস্তৃত পরিধিরি পটভূমিকায় বিশেণ্ডষণ করতে গিয়ে, বিপণ্ডবের কারণ হিসেবে

স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সাম্য বা ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিমূর্ত সাধারণ সমাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন। কারণ ধারণাগুলো এমন সব উপাদানে মন্ডিত যা বিপণ্ঢবী চেতনার ভিত্তি নির্মাণ করে (ব্রিনটন, ১৯৫৮)।

যদিও এরিস্টটলের সময় হতে বিপণ্ঢবের ধারণা প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠনের আবর্তনশীল পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের একটি "নব বিন্যস্ত ধারণা"। যা আমেরিকান ও ফরাসি বিপণ্ঢবের সময় থেকে প্রাধান্য বিস্তার করে । সপ্তদশ শতক হতে বিপণ্ঢবের ধারণাকে "প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হুমকি" এবং "পরিণামে গতানুগতিক ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা"র প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহার শুরু হয় (এনসাইক্লপীডিয়া অব সোস্যাল সাইন্স ঃ ৫১০)। এর সাম্প্রতিক ব্যবহার "সরকার ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার" নির্দেশক। সরকার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধান করে বিধায় একটি সফল বিপণ্ঢব প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বড়। সফল বিপণ্ঢব সামাজিক ও রাজনীতিক পরিমন্ডলকে নতুন বিন্যাসে অভিষিক্ত করে (স্কোকপোল, ১৯৭৫ ঃ ১৭৫–১৮০; স্কোকপোল, ১৯৭৬ ঃ ৫৭– ৬০)। এসব পরিহার কিংবা সম্ভাবনা হ্রাস করার লক্ষ্যে ক্রম বিবর্তনের সাহায্যে কার্যকর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বা রাজনীতিক ব্যবস্থাকে এমন অভিযোজন সহকারে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন, যাতে মূল্যবোধ, স্বার্থ ও বিশ্বাস স্বতস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়।

প্রাক-বিপণ্ঢব অবস্থায় জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। সুতরাং প্রচলিত আইন, বিধিবিধান তাদের নিকট বৈধতাহীন ও স্বেচ্ছাচারী মনে হয় এবং এর প্রয়োগ অযৌক্তিক মর্মে প্রতিভাত হয়। যদিও প্রাক-বিপণ্ঢব যুগে কার্যক্রমসমূহ রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হত কিন্তু তা ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতা বিপণ্ঢবী চেতনাকে আরও জোরদার করে তুলে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচিও পাকিস্তানে এর প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। প্রথমত পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য এটা প্রণয়ন করা হয়েছিল। যাতে অর্থ, মুদ্রা, করারোপ, বাণিজ্য প্রভৃতি যার জন্য পাকিস্তানের অখন্ডতা হুমকিস্বরূপ ছিল, তার উপর পূর্ব পাকিস্তানিদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হত। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা এ অবস্থা মেনে নিতে পারে নি। কারণ ১৯৪৭ সাল থেকে যে সম্পদের উপর তাদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল তারা সে সম্পদের ভাগাভাগিতে প্রস্তুত ছিল না। পাকিস্তানি সামরিক নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। তারা ছয় দফা কর্মসূচির অন্তত ৪টি দফা (২, ৩, ৪ এবং ৫) নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ঐ চারটি দফা ছিল তাদের কায়েমি স্বার্থের বিপক্ষে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাকে একটি বিপণ্ঢব হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে

(তালুকদার, ১৯৮০)। ছয় দফা কর্মসূচি এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এর নিহিতার্থ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে।

এই পিচ্ছিল পথে অবশ্যই আমাদের সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। বিপণ্ডবের পর পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা এলেন কে ট্রিমবার্জার (১৯৭৮) বর্ণিত বিপণ্ডবের থেকেও অধিক গুরুত্ববহ। আতাতুর্কের শাসনের পর তুরস্কে অথবা জাপানে মেইজির পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর কিংবা নাসেরের ক্ষমতা দখলের পর মিশরে যা ঘটেছিল পূর্ব পাকিস্তানে তা ঘটেনি। এখানে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তনে বাঙালি সামরিক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাথে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের এর মাঝে একটি তাৎপর্যময় সমন্বয় ঘটেছে।

বিপণ্ডবের বহু গূঢ়ার্থ রয়েছে। বিপণ্ডব যদি শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য হয়, তাহলে তা রাজনীতিক বিপণ্ডব। বিপণ্ডব যদি সম্পদের বন্টন ও সামাজিক মর্যাদাকেও পরিবর্তন করে তবে তা সামাজিক বিপণ্ডব। উদাহরণস্বরূপ আভিজাতদের বিশেষ সুবিধাকে বিলুপ্ত করার কথা উলেণ্ডখ করা যায় (স্কোকপোল, ১৯৭৬)। যখন কোন রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে শুধু সরকার বা সরকারি নীতি পরিবর্তনের প্রয়াস নিহিত থাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা থাকে না, তাকে বিদ্রোহ (জনসন, ১৯৬৪ ঃ ৫০-৭৫; টান্টার এবং মিডলাস্কাই, ১৯৬৭ ঃ ১৫-৩৫; রটেনবার্গসহ গুর, ১৯৬৭ ঃ ৬৬-৭৭; Eckstein, ১৯৬৩ ঃ ১১৫-১২১; ওয়েলারস্টেইন ১৯৬১ ঃ ১৫৯-১৬৩; পেটী, ১৯৩৮ ঃ ৮৫-৯৬) বলা হয়। বিদ্রোহে বিপণ্ডবীরা ক্ষমতা দখলে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জন্য জনসমর্থনের নামে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্বতন সরকারকে অস্বীকার করে।

যদিও বিপণ্ডবীদের সম্পদের বিন্যাস রাষ্ট্রবিপণ্ডবের উদ্দেশ্যের একটি বড় অংশ নির্ধারণ করে, কিন্তু কোন নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠারর মত দুরদৃষ্টি কিংবা ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। সংক্ষেপে রাষ্ট্রবিপণ্ডব হচ্ছে সীমিত ইতি কিংবা বহুমাত্রিক সমাপ্তি কৌশল। এটি একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথচ সঙ্গতিপূর্ণ সহিংস হস্তক্ষেপ। যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার বিকল্প কোন স্বীকৃত বা বৈধ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা বিপণ্ডবীদের জন্য কঠিন। জে, বাওয়ার বেলের মতে, "রাষ্ট্রবিপণ্ডব হল বিকল্প কতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠায় অক্ষম একটি গোষ্ঠীর বিরাজমান কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপাতের জনগণের সশস্ত্র উত্থান এবং ক্ষমতালিপ্সু বিপণ্ডবীদের সাথে কর্তৃপক্ষের প্রাণঘাতি সংলাপ" (বেল, ১৯৭৬ ঃ ৫-৬)। বাঙ্গালী সশস্ত্রবাহিনী আকস্মিকভাবে তাদের মূল নিয়ন্তা তথা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে এবং অন্যান্য বাঙ্গালী প্যারামিলিটারি ও রাজনৈতিক সংগঠনের

সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এ বিবেচনায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে বিদ্রোহ বলা যায়। বাঙ্গালী সেনারা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁরা বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থানরত সামরিক ও প্যারামিলিটারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় ঘটান এবং তারা স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধ করতে রাজী হন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল হতে যার কার্যক্রম শুরু হয়। ঐদিন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্য নির্মাণের জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন।

একইভাবে ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের ঐ আকস্মিক ঘটনাকে বিপণ্ঢবও বলা যায়। কারণ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এটি সংঘটিত হয়। যেখানে বিপণ্ঢব স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হয়। অবশেষে প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনা ছিল বিপণ্ঢবের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু, কারণ তাঁরা একটি ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানকে আরও মজবুত করা হয়। এটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে । উপরের আলোচনা থেকে এটাকে বিপণ্ঢব বলা যায় না, কারণ বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ, যারা চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং পেশাগত শৃঙ্খলা ছুড়ে ফেলে বিদ্রোহ করেন তাঁরা অবশেষে বাংলাদেশ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর প্রবাসী সরকারের অধীনে যুদ্ধ করেন । তাই সংগতকারণে এ বিপণ্ঢবকে "১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ" হিসাবে অখ্যায়িত করাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত। এই গবেষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদি উলেণ্ঢখযোগ্য। এসব ঘটনাবলী ও আন্দোলনে নজিরবিহীন জনসমর্থন ছিল। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সলে ২৫ মার্চ সংগঠিত সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নির্বিচার গণহত্যা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলন দমনের সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয় (আলী, ১৯৭৩ ঃ ৪০-৪৫; ভুট্টো ১৯৭১ ঃ ১১-২১, চৌধুরী ১৯৭২ ঃ ৫০-৮১)।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় এ সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। তখন অবিভক্ত বাংলার অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসাবে স্বাধীন হয় (আলী ১৯৬৭; কেলার্ড ১৯৫৭; মরিস-জোনস,

১৯৫৮)। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নতুন জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। বাঙালিদের প্রতি অবিশ্বাস সর্বোপরি বহুমুখী সমাজে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা প্রচলনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নীতি বাঙালিদের ক্রমশ রাজনৈতিক শ্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিতে থাকে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হলে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কমে যায়। মূলতঃ বেসামরিক ও সামরিক আমলা দ্বারা প্রশাসন পরিচালিত হত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। ৫ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আইয়ুব খানের শাসনামলে সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ শক্তিশালী করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে সমধিক মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু সে আমলে পাকিস্তানে প্রবৃদ্ধি ঘটে তা শুধু শ্রেণিভেদে নয় অঞ্চলভেদেও ছিল খ ি ত। পশ্চিম-পাকিস্তান কেন্দ্রিক আর্থিক নীতি পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতিক বিস্ফোরণের সূচনা ঘটায়। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বেগবান হয়। ছয় দফা কর্মসূচীই ছিল এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উৎস।। ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তানী নীতি-নির্ধারকদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয়। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিজাত বাঙ্গালীদের নিয়ে একটি কার্যকর পরিষদ গঠন করার জন্য এটি প্রণয়ন করা হয়। ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ, পশ্চিম পাকিস্তানে কাজে লাগানোর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালানো হয় (রহমান, ১৯৬৬)।

সে সময় বাঙালি নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীতে বাঙালি সৈনিক ও অফিসারের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। তাঁরা সংখ্যায় যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি স্বতন্ত্র পরিচয়ের কারণে নিজেদের মধ্যে একটি ঐকমত্য ধারণা লালন করেন (জাইরিং ১৯৭১ ঃ ১২৫-১৪০; আহমেদ ১৯৮০ ঃ ৬০-৭২)। বেতন ভাতার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বেদনাবোধও লালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বহীনতার কারণে বেসামরিক ও সামরিক বাঙ্গালী আমলারা পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে একটি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করেন। ধীরে ধীরে আমলাদের সংখ্যা যখন কিছুটা বৃদ্ধি পায় তখন পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। তাঁদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে সুচিন্তিতভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁদের অনেকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নিকট গোপন তথ্য পাচার করেন। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবের সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে আণীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কিছু সামরিক এবং বেসামরিক অফিসারকেও জড়ানো হয়। তাই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয়

নয় যে, যখন পাকিস্তানের প্রশাসনকে অকেজো করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ শেখ মুজিবর রহমান গণ-অনাস্থা এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, তখন বাঙ্গালী আমলারা তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দেন। এই অসহযোগ আন্দোলন অবশেষে চূড়ান্ত আন্দোলন হিসেবে প্রমাণিত হয়, কারণ এর ফলেই পাকিস্তানী অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের পথ প্রসারিত হয়। ছয় দফা আন্দোলন পরবর্তীকালে ১ দফা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং তা হল "স্বাধীনতার আন্দোলন"। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন, আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ও জেনারেলদের মধ্যে আলোচনার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সেনা সদস্য এবং সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসার জন্য কৌশল গ্রহণ করেন। বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ এটাকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে দেখেন এবং চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকেন। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আণীত সেনা সদস্য এবং সামরিক সরঞ্জাম পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, যদি কখনও পরিস্থিতি সেরকম হয় তবে তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ করবেন।

সম্পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর পাকিস্তানী জেনারেলরা "অপারেশন সার্চ লাইট" রূপে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার মনোভাব গ্রহণ করেন। ত্রাস ও গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থান দমন করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় এই অভিযান শুরু করা হয়। পূর্ব পাকিস্তনের রাজনৈতিক নেতারা অপ্রস্তুত হয়ে পরেন। ঐ রাত্রি আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানী জেনারেলদের কাছে বন্দী হন। অন্যান্য নেতাও জনগণকে কোন নির্দেশনা না দিয়ে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে ছুটে যান। এই সন্ধিক্ষণে পদমর্যাদায় ছোট হওয়া সত্ত্বেও কিছু সামরিক অফিসার অত্যন্ত সক্রিয় এবং সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এমন ভূমিকা পালন করেন যা রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা করা হবে বলে মনে করা হয়েছিল। তাঁরা বিপণ্ডব সংগঠিত করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল রাজনৈতিক নেতারা পুনরায় একত্রিত হয়ে প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঐ সময় তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীর মত তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রবাসী সরকারের অধীনে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেন। এতে প্রমাণিত হয় তাঁরা শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বার্থেই যুদ্ধ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়কে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিখোঁজ অধ্যায় বলাই শ্রেয় কারণ তখন কোন বৈধ সরকার ছিল না; রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে কোন নির্দেশনা ছিল না এবং মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৮-ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গৃহীত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ব্যতীত কোন দিক থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ সমবেতকরণের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই গবেষণার উদ্দেশ্য মূলতঃ ইতিহাসের ঐ নিখোঁজ অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করা।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, পেশাজীবী, গোষ্ঠী এবং সামাজিক শক্তি তারা যখন সরাসরি অসহযোগ আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ঐ সময় তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথেও সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে, বাঙ্গালী সামরিক নেতৃত্বে প্রণোদিত এবং ডাকে সাড়া দিয়ে সমবেত হন। সামরিক নেতৃত্ব পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনীকে যে কোন জায়গায় এবং সবত্র রুখে দেওয়ার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এবং পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সংঘটিত নৃশংসতার প্রতি নিন্দা জানাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহ্বান জানান। বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যেই বাঙ্গালী সেনাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁরা বিভিন্ন স্থানে কখনও কখনও সম্মুখ যুদ্ধ করেন এবং গেরিলা কৌশলও অবলম্বন করেন। সেনা অফিসারদের পক্ষ থেকে গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত সারা দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থানরত সেনা সদস্য এবং বিশেষভাবে জনগণের মধ্যে পুনঃরায় সাহস সঞ্চারিত করে এবং তখন থেকে তারা সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন (সফিউলণ্ঢাহ ১৯৮৯ ঃ ১৮-৯২; ইসলাম ১৯৮১ ঃ ১১২-১৭০)। একটি বিষয় উলেণ্ঢখযোগ্য যে, ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার গঠন করা হলে, বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ নিজের পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশনা না দিয়ে, দেশকে স্বাধীন করতে প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের এই যুদ্ধ সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে গর্বের এবং সবচেয়ে সাহসিকতার ঘটনা সমৃদ্ধ এবং ঐতিহাসিকদের নিকট এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। একটি সফল বিপণ্ঢবের সকল বৈশিষ্ট্যই এতে রয়েছে, তবে বাংলাদেশের মানুষের নিকট এটা একটি বিপণ্ঢব ও মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা মানুষকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছে; এটা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে।

১৯৭১ সালের মার্চে সেই সংকটপূর্ণ দিনে চট্টগ্রামে অবস্থানরত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের গৃহীত সফল ভূমিকা পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক ক্ষমতালোভী জেনারেলদের পুরো ব্যর্থতার মতই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যারা ছিল প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী। তাদের অরাজনৈতিক, হঠকারি এবং উদ্ধত অভিযান না

হলে হয়ত পাকিস্তান আরও কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারত (এটজোইনি ১৯৬৫ ঃ ৩৭-৪০)। বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের এই যথার্থ অবস্থান কোন রাতারাতি ঘটনা নয়। কোন বিপণ্ঢবই শূন্য থেকে শুরু হয় না। একজন বাঙ্গালী সেনা অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মূল প্রোথিত ছিল পাকিস্তানের অবকাঠামোগত অবস্থায়। এর আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা রয়েছে ঃ পাকিস্তানী শাসকদের প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক নীতির ফলে এর উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের অর্থনৈতিক নীতির ফলে এটা প্রকাশ্যে এসেছে। কেবলমাত্র এই কাঠামোগত বিষয়াবলীর পটভূমিতে ঐ সময়ে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের ভূমিকা ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে। পরের অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে।

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন *"বিউরোক্রাটিক এলিটস্ ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ"* ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮০।

২। আহমেদ, এমাজউদ্দিন *"মিলিটারি রূল এন্ড মিথ অভ্ ডেমোক্র্যাসি"* ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৮।

৩। আলী, চৌধুরী মোহাম্মদ *"দি ইমারজেন্স অভ্ পাকিস্তান"* নিউইয়র্ক ঃ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

৪। আলী, এস. এম. *আফটার দি ডার্ক নাইট*, নয়াদিলিণ্ঢ ঃ থমসন প্রেস, ১৯৭৩।

৫। এরেন্ট, হাননা, *"অন রেভোলিউশন"* নিউ ইয়র্কঃ ভাইকিং প্রেস, ১৯৬৫।

৬। বেল, বয়ার, জে., *''অন রেভোল্ট"* লন্ডন, ১৯৭৬।

৭। ভুট্টো, জেট. এ., *''দি গ্রেট ট্রাজেডি"* করাচি ঃ পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ১৯৭১।

৮। ব্রিনটন, ক্রেইন, *দি এনাটমি অভ্ রেভোলিউশন*, নিউ ইয়র্ক ঃ ভিনটেজ, ১৯৫৮।

৯। কলার্ড, কেইথ, *পাকিস্তান ঃ এ পলিটিক্যাল স্টাডি*, লন্ডন ঃ জর্জ অ্যালেন এন্ড আনউইন, ১৯৫৭।

১০। চেম্বারলিন, উইলিয়াম এইচ., *দি রাশিয়ান রেভোলিউশন*, নিউইয়র্ক ঃ ম্যাকমিলান, ১৯৫২।

১১। চৌধুরী, কল্যান, *জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ*, কলকাতা ঃ অরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭২।

১২। ক্লোজউটজ, কার্ল ভোন, *অন ওয়ার*, লন্ডন ঃ পেঙ্গুইন, ১৯৮২।

১৩। ইকস্টেইন, হেরি (সম্পাদিত) *ইন্টারনাল ওয়ার ঃ প্রবেণ্ঢমস এন্ড অ্যাপ্রোচেস*, নিউইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস, ১৯৬৪।

১৪। ইকস্টেইন. হেরি, *''ইন্টারনাল ওয়ারঃ দি প্রবেণ্ঢমস অভ্ অ্যান্টিসিপেশন"* ইন আইথেল ডি সোলা পোল, এটএল, *সোসাল সাইন্স রিচার্স এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি*, ওয়াশিংটন ডি.সি ঃ স্মিথ সোনিয়ান ইনসটিটিউশন, ১৯৬৩।

১৫। এটজিয়নী, আমিতাই, *পলিটিক্যাল ইউনিফিকেশন ঃ* এ কমপ্যারেটিভ স্টাডি অভ্ লিডারস্ এন্ড ফোর্সেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬৫।

১৬। ফিনার, এস.ই., *দি ম্যান অন হর্সব্যাক ঃ দি রোল অভ্ দি মিলিটারি ইন পলিটিকস*, লন্ডন ঃ পল মল, ১৯৬২।

১৭। গারদস্, ক্লিফোর্ড, (সম্পাদিত) *ওল্ড সোসাইটি এন্ড নিউ স্টেইটস্*, নিউইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস, ১৯৬৩।

১৮। গ্রীনি, টমাস এইচ., *কমপ্যারেটিভ রেভোলিউশনারী মুভমেন্টস*, নিউ জার্সিঃ প্রেনটিস হল, ১৯৭৪।

১৯। গার, টেড এট এল, *দি কন্ডিশনস্ অভ্ সিভিল ভায়োলেন্স ঃ ফার্স্ট টেষ্ট অভ্ এ কেজুয়াল মডেল*, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ মনোগ্রাফ নং ২৮, ১৯৬৭।

২০। ইসলাম, রফিক-উল (মেজর), বি ইউ, *এ টেইল অভ্ মিলিয়নস*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১।

২১। জ্যাকম্যান, আর, ডাবিণ্ডউ., *''পলিটিসিয়ানস ইন ইউনিফর্ম* এপিএসআর ৭০ (৪) ঃ ১০৭৮-৯৬।

২২। জনসন, চালমারস্, *'পিজ্যান্ট ন্যাশনালিজম এন্ড কমিউনিস্ট পাওয়ার"* স্ট্যানফোর্ড ঃ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬২।

২৩। জনসন, চালমারস, *রেভোলিউশন এন্ড দি সোস্যাল সিস্টেম*, স্ট্যানফোর্ড ঃ হুভার ইন্সটিটিউশন, ১৯৬৪।

২৪। জনসন, চালমারস, *রেভোলিউশনারী চেঞ্জেস*, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৮২।

২৫। জুভেনাল, বারট্রান্ড ডি, *অন পাওয়ার*, বোস্টন ঃ বেকন প্রেস, ১৯৬২।

২৬। কেসকেমেতি, পল, *দি আনএক্সপেক্টেড রেভোলিউশনঃ* সোস্যাল ফোকাস অন হাঙ্গেরিয়ান আপরাইজিং, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬১।

২৭। লিন্জ, জে. জে. এবং স্টিফ্যান, এ. (সম্পাদিত), *দি ব্রেকডাউন অভ্ ডেমোক্র্যাটিক রিজাইম*, বালটিমোর ঃ জনস হপকিনাস্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮।

২৮। মেকিয়াভেলি, এন., *ডিসকর্সি*, ২, ৪৪।

২৯। মেকিয়াভেলি, এন., ডিসকর্সি, ৩, ৪১।

৩০। মাগ্রিওতা, ফ্রাঙ্কলিন ডি. (সম্পাদিত), *ব্রেসিস্ ইনসাইকোপিডিয়া অভ্ মিলিটারি সাইন্স এন্ড বায়োগ্রাফি*, লন্ডন, ১৯২০।

৩১। মনিরুজ্জামান, তালুকদার, *দি বাংলাদেশ রেভোলিউশন এন্ড ইটস আফটারমাথ*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮০।

৩২। মরিস-জোনস, ডাবিণ্টউ. এইচ., *''এক্সপেরিয়েন্সেস অভ্ ইন্ডিপেন্ডেস, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান''*, দি পলিটিক্যাল কোয়ার্টারলি, ২৯ (১৯৫৮)।

৩৩। নর্ডলিংগার, ই. এ., *সোলজারস ইন মুফতি* এপিএসআর ৬৪(৪)৪৩১-৪৮।

৩৪। পেটি, এস জর্জ, *দি প্রসেস অভ্ রেভোলিউশন*, নিউইয়র্ক ঃ হারপার, ১৯৫৮।

৩৫। রহমান, শেখ মুজিবর, *আমাদের বাঁচার দাবীঃ ছয় দফা কর্মসূচি* ঢাকা ঃ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৬।

৩৬। রুশো, জে. জে., *সোস্যাল কনট্রাক্ট*, লন্ডন, ১৯৬৪।

৩৭। সফিউলণ্ঢাহ, কে. এম. মেজর জেনারেল (অব:), *বাংলাদেশ অ্যাট ওয়ার*, ঢাকা ঃ একাডেমী পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

৩৮। স্কোপল, থিডা, *''ফ্রান্স, রাশিয়া, চায়না ঃ এ স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস অভ্ সোস্যাল রেভোলিউশনস''*, কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি এন্ড হিস্টরি, এপ্রিল, ১৯৭৫।

৩৯। স্কোপল, থিডা, *''এক্সপেণ্ঢইনিং রেভোরিউশনসঃ ইন কুয়েস্ট অভ্ এ সোস্যাল স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ''* ইন লিউইস কুজার এন্ড অটো লারচেন, (সম্পাদিত); দি ইউজেস অভ্ কন্ট্রোভার্সি ইন সোসিওলজি, নিউইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস, ১৯৭৬।

৪০। টেনথার, রেমন্ড এন্ড মিডলারস্কী, মেনাস, *''এ থিওরি অভ্ রেভোলিউশন''*, *জার্নাল অভ্ কনফ্লিক্ট রেভুলিউশন*, ১১ (সেপ্টেম্বর ১৯৬৭)।

৪১। ট্রিমবার্গার, এলেন কে, *রেভোলিউশন ফ্রম অ্যাবাভ্*, নিউ জার্সি ঃ ট্র্যানজেকটিভ বুকস, ১৯৭৮।

৪২। ওলারস্টেইন, ইমানুয়েল, *আফ্রিকা ঃ দি পলিটিকস অভ্ ইনডিপেন্ডেন্স*, নিউইয়র্ক ঃ ভিনটেইজ, ১৯৬১।

৪৩। ওলজার, মাইকেল, *''দি রেভোলিউশন অভ্ দি সেইন্টস্''* ক্যামব্রিজ ঃ হাভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫।

৪৪। জাইরিং, লরেন্স, *দি আইয়ুব খান ইরা ঃ পলিটিকস ইন পাকিস্তান ১৯৫৮-১৯৬৯*. সাইরাকাসঃ সাইরাকাস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

অধ্যায়–৪

স্বাধীনতা যুদ্ধের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

ভূমিকা ঃ

১৯৭১ সালে বাঙ্গালি সেনা অফিসারদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ রূপ নেয়া রাজনৈতিক বিপণ্ঢবের উত্থানের ইস্যুটি আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করতে হবে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণ হয়েছিল, কিন্তু যেসব উপকরণ একটি জাতিকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে সেসব উপকরণের অধিকাংশই পাকিস্তানে অনুপস্থিত ছিল। বংশপরম্পরায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের একটি চলমান রাজনৈতিক কাঠামোতে বসবাসের অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা কখনও চিহ্নিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে একত্রিত হয়নি। যা তাদের মধ্যে সাধারণ কোন রাজনৈতিক চেতনা লালন করত। তাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলও ছিল ভিন্ন। এই দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ বন্ধন ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দুপ্রধান ভারত হতে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা এবং ইসলামি মূল্যবোধ (বলিথো, ১৯৫৪; চৌধুরী, ১৯৬৭)। এসব কারণে শুরু থেকে পাকিস্তান 'দ্বৈত-রাষ্ট্র' হিসাবে পরিচিত ছিল (মার্শাল ১৯৫৯ ঃ ৫)। এই অধ্যায়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জনমিতির বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈসাদৃশ্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক অবস্থা।

ভৌগোলিক অবস্থান

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারতের দু'টি পৃথক অংশের সমন্বয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, মুসলিমপ্রধান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং পূর্ব বাংলা, যা পরবর্তীকালে যথাক্রমে 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম ধারণ করে। পাকিস্তানের মোট আয়তন ছিল ৩,৬৫,৫২৯ বর্গমাইল (পূর্ব পাকিস্তান ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তান ৩,১০,৪০৩ বর্গমাইল)। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অবস্থানে ১০০০ মাইলেরও বেশি ভারতীয় অঞ্চল (জাহান ১৯৯৪ ঃ ১১)। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক এবং আবহাওয়াগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ব-পাকিস্তান গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা (জিবিএম) নদীর নিম্ন তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বলে, ঐ সকল নদী এবং উপনদীর মাধ্যমে ফেলে যাওয়া পলি মাটি ঐ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছিল। শুধুমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় যেখানে কিছু ছোট পাহাড়, টিলা রয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের

সামান্য উঁচু অঞ্চলে ভূমিরূপে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। উত্তরাঞ্চলের কিছু ভূমি সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। নিবিড়ভাবে নদী বেষ্টিত হওয়ার কারণে এবং ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে, (গড়ে ৮০ ইঞ্চি) পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৩০%-৪০% ভূমি প্রতিবছর নদীর পানিতে পণ্ঢাবিত হয়, যা গ্রীষ্মকালীন শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে, আবার শীতকালীন শস্য অথবা রবিশস্য উৎপাদনে কিছু পরিমাণ সেচের প্রয়োজন মেটায়। দেশটির কৃষি পদ্ধতি বহুলাংশে বন্যার পানির উপর নির্ভরশীল। পূর্ব পকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতিতে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এর পশ্চিমে হিমালয়, কারাকোরাম এবং হিন্দুকুশ পর্বত অবস্থিত এবং অন্যদিকে রয়েছে ইনদাস ফ্লাড পেণ্ঢইন (Indus flood plain) ও পূর্বে রয়েছে বদ্বীপ। যখন পূর্ব পাকিস্তান শুষ্কশীতল শীতকাল এবং উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্মকাল উপভোগ করে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং ঠান্ডা শীতকাল বিরাজ করে। এ সময় বেশিরভাগ অংশে শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক অবস্থা বিরাজ করে এবং উত্তরের কিছু অঞ্চলে সামান্য আর্দ্র অবস্থা বিদ্যমান। শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে সেচের উপর নির্ভরশীল। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জলবায়ুতে একমাত্র সমরূপ উপাদান।

জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য এই দুই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থাকেই শুধু ভিন্ন করে নি, এর ফলে এই দুই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যভ্যাস, পোশাক, রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথাও ভিন্ন করেছে। এভাবে গড়ে উঠে দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানা বিবেচনায় পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ভারত বেষ্টিত। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সীমান্ত রেখা ছিল বার্মার সাথে এবং এর দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ইরান ও আফগানিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তানের একটি ছোট্ট ভূখন্ড ওয়াখান, পশ্চিম পাকিস্তানকে মধ্য এশিয়া থেকে পৃথক করেছে। উত্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে চীনের রয়েছে একটি অভিন্ন সীমান্ত। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল ভারত বেষ্টিত। পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণে রয়েছে আরবসাগর। এই ব্যাপক ভৌগোলিক ব্যবধানের ফলে একই দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সমাজ-সংস্কৃতিকে যোগাযোগ ও সামাজিক বিনিময় ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করেছে।

জনসংখ্যা

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন-পরিসংখ্যান থেকেও প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠে (ছক ৪.১)।

ছক ৪.১ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনপরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্য

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		জনসংখ্যার ঘনত্ব (জন/বর্গমাইল)		পৌর এলাকায় জনসংখ্যা (%)		নির্ভরশীলতার হার (প্রতি ১০০০ প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে)
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬১
পূর্ব পাকিস্তান	৪১.৯	৫০.৮	৭০১	৯২২	৪.৩	৫.২	১০৫.৩৩
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৩.৭	৪২.৯	১০৯	১৩৮	১৭.৮	২২.৫	৯৭.৬

উৎস ঃ জাহান, ১৯৯৪, পৃ-১১, খান, ১৯৭১, পৃ-৬৯৭; ১৯৭১ সালের উভয় অংশের তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যায় নি, কারণ ঐ বছর আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় নি। আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে।

পাকিস্তানের দুই অংশে মধ্যে জনসংখ্যার অনেক পার্থক্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা ছয়গুণ ছোট হওয়া সত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার ৫৪% বাস করত পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সাতগুণ। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে আবাদি জমির পরিপ্রেক্ষিতে বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ১৪৮৩ জন এবং ৬৫৮ জন (খান, ১৯৭১)। প্রাকৃতিক ভূগোল এবং মৃত্তিকা প্রাথমিকভাবে উভয় অংশের গ্রামীণ জনসংখ্যার বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এই এলাকাগুলো প্রতিবছরই পণ্ঢাবিত হয়। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ২০০০-জনেরও বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রামীণ জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ঘনত্ব ছিল ইন্দাজ উপত্যকার আর্দ্র অঞ্চলে, প্রতি বর্গমাইলে ২০০-৭০০জন (খান, ১৯৭১)। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শহর অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা বেশি ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতার হারও পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা বেশি ছিল। এই অনুপাতের একটি বড় অংশ শিশু নির্ভরশীলতা (০-১৪ বছর)। পাকিস্তানের জনপরিসংখ্যানের আর একটি উলেণ্ঢখযোগ্য দিক ছিল শরণার্থী; যারা ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর এদেশে পাড়ি জমায়। অপেক্ষাকৃত ভাল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা বেশি শরণার্থীর সমাগম ঘটে (১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে, পশ্চিম পাকিস্তানে ৭.২ মিলিয়ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ০.৭ মিলিয়ন)। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের পৌর বাসিন্দাদের ৩৯.৯% ছিল শরণার্থী। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু অভিজাত পরিবারগুলো চলে যাওয়ার ফলে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় তা নবাগত শরনার্থীদের দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় নি (জাহান, ১৯৯৪)।

ভাষা

ভূ-প্রকৃতি ও প্রভেদ জলবায়ু একটি অঞ্চলের ভাষার ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি করে। পূর্ব-পাকিস্তানের অভিন্ন ভূমিরূপের কারণে প্রধান মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিছু এলাকায় উচ্চারণে এবং কথ্য বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এই ভাষার সাধারণ ব্যবহারে সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও পার্বত্য অঞ্চলে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সীমান্তের ওপারের ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষাকে অনেকটা পরিবর্তন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেখানে জটিল ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমিরূপ যেমন বিচিত্র এই পর্বত, এই সমতল, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য। নিচের ছকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাগত বৈচিত্র্য দেখানো হল ঃ

ছক ৪.২ ঃ পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত মাতৃভাষা ওয়ারী জনসংখ্যা

ভাষা	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
বাংলা	৯৮.১৬	৯৮.৪২	০.০২	০.১১
পাঞ্জাবী	০.০২	০.০২	৬৭.০৮	৬৬.৩৯
পশতু	-	০.০১	৮.০১	৮.৪৭
সিন্ধু	০.০১	০.০১	১২.৮৫	১২.৫৯
উর্দু	০.৬৪	০.৬১	৭.০৫	৭.৭৫
ইংরেজী	০.০১	০.০১	০.০৩	০.০৪
বেলুচি	-	-	৩.০৪	২.৪৯

উৎস ঃ জাহান, ১৯৯৪, পৃ-১৪; ছক ৪.১-এর অনুরূপ।

পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ছিল একটি অপ্রচলিত ভাষা (কিছু দোভাষী ছাড়া), একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দু, পাঞ্জারি, পশতু প্রভৃতি ভাষা কখনও ব্যবহার করত না, যা পশ্চিম পাকিস্তানে বহুল ব্যবহৃত। বর্ণমালা,

লিপি এবং বলার ভঙ্গিতে পার্থক্য এসব ভাষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করত। এরূপ ভিন্নতা সত্ত্বেও পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। তাদের অভিযোগ ছিল বাংলা ভাষায় হিন্দু লেখকদের একচেটিয়া অবদান রয়েছে। যদিও বাংলা লিপি সরাসরি নেয়া হয়েছে গুপ্ত ব্রাহ্ম লিপি থেকে, এ ভাষার ঐতিহাসিক উৎকর্ষ শুরু হয় মোঘল আমলে যখন সুফি অধ্যাত্মবাদের মাধ্যমে ইসলামিক চিন্তা-চেতনা এবং ফার্সি সাহিত্য বাংলা ভাষাকে অনেক প্রভাবিত করে। যাই হোক, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা বাঙ্গালিদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে নিস্ফল হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা এবং উর্দু দু'টিই রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এই ব্যবস্থা জাতীয় পর্যায়ে ভাষা দুটিকে সমন্বিত করতে ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজি অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে থেকে যায়। কারণ ইংরেজি দুই অঞ্চলেই বোধগম্য ছিল। এ ধরণের ব্যর্থতার কারণে এরূপ প্রবণতা সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় অখন্ডতার জন্য সহায়ক ছিল না। এরূপ হয়, মূলত কিছু সমবেত এবং পৃথক গোষ্ঠীর কারণে যা জাহান (১৯৯৪) কর্তৃক সনাক্তকৃত।

ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি

ব্রিটিশেরা যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, মুসলমানেরা তখন বর্ণবাদে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। হিন্দু মুসলিম সংঘাত শুরু হয় ৮ম শতাব্দিতে যখন মুসলিম শাসকগণ প্রথম উপমহাদেশে আসেন এবং ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর তাঁরা রাজত্ব করেন। সে কারণে মুসলমানগণ একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন; যেখানে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সাংবিধানিক অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইসলামি আইন সংরক্ষণ করতে পারেন। যদিও পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজ ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে উঠে, তবুও তাদের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম বেশ উদার প্রকৃতির যা দিনে দিনে জনগণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও প্রচলিত রীতির তুলনায় বেশি অনুভুতি জাগিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম বেশ রক্ষণাত্মক এবং গোঁড়া প্রকৃতির ছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামি রীতি-নীতি প্রচলিত হয়েছে মূলত সুফি-দরবেশদের মাধ্যমে যাঁরা ত্রয়োদশ শতাব্দি থেকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান জনপ্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে নবম শতাব্দি থেকে ইসলাম বিস্তার লাভ করে যুদ্ধ বিজয়ী শাসকদের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের এই উদার প্রকৃতিকে পশ্চিম-

পাকিস্তানি নেতারা প্রায়ই ভুল বুঝত, তাদের কেউ কেউ বাঙ্গালি মুসলমানদের পাকিস্তানের নিকৃষ্টতর মুসলমান হিসাবে আখ্যায়িত করত।

পাকিস্তানের দুই অংশে অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিস্তারেও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল (ছকঃ ৪.৩)। হিন্দুদের একটি বড় অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে বাস করত, অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে হিন্দুরা খুবই অবহেলিত ছিল। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি একটি দেশের জীবন পদ্ধতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম পাকিস্তান দু'টি মুসলিম দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল পশ্চিমে ইরান এবং উত্তর পূর্বে আফগানিস্তান। তাই এসব দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক লেনদেন ঘটত তার সবই ছিল সমরূপ কট্টরপন্থী। মৌলবাদী ধ্যান-ধারণার আধিপত্যই সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু বসতির নগণ্যতার কারণ। পূর্ব পাকিস্তান এক সময় হিন্দু প্রধান ভারতীয় রাজ্যের অংশ ছিল। তাই এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব সমৃদ্ধ। বিস্তৃত ইসলামি ধারণার পটভূমিতে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমাজ ও সংস্কৃতির এই বৈসাদৃশ্য সব সময় একটি একক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল।

ছক ৪.৩ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী (মোট জনসংখ্যার %)

	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
মুসলিম	৭৬.৮	৮০.৪	৯৭.১	৯৭.২
হিন্দু	২২.০	১৮.৪	১.৬	১.৫
খ্রিস্টান	০.৩	০.৩	১.৩	১.৩
অন্যান্য	০.৯	০.৯	০.০	০.৫

উৎস ঃ জাহান, ১৯৯৪, পৃ-২৩; ৪.১-এর অনুরূপ

পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজ অধিক অংশে খন্ডিত ছিল। অর্থনৈতিক মর্যাদার বিভক্তিকরণ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবল ছিল। কিন্তু উপজাতীয়তাবাদের কারণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্তানের মধ্যে সংহতি বাধাগ্রস্ত হয়। ভাষাগত পরিচিতি এবং পাঠান, বেলুচি ও সিন্ধুর মত সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্তর বিন্যাসও এ অঞ্চলে সূক্ষ্ম ছিল। সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি প্রথা পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে

পাঞ্জাবে অনেক বর্ণবাদী প্রথা প্রচলিত ছিল এবং প্রায়ই অন্তর্বিবাহ প্রথা অনুসরণ করা হত। ছেলে-মেয়েরা তাদের জাতিগত প্রথা বেছে নিত (জাহান, ১৯৯৪)।

জাতিগত দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান বেশ সমমাত্রিক ছিল। এর জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ একটি অভিন্ন বাঙ্গালি জাতিভুক্ত। যদিও জাতিগত দিক থেকে বাঙ্গালিরা ইন্দো-ইউরোপীয়, প্রতু-অষ্ট্রেলীয় এবং মঙ্গোলীয় জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্র জাতি। এখানে বিদ্যমান উপজাতীয় গোষ্ঠি মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ (প্রায় ৪,৯৬,০০০)। এরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ময়মনসিংহ এলাকায় বাস করে এবং তারা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদে কখনও কোন সমস্যার সৃষ্টি করত না। কৃষিজীবী সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানের জীবন ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করত। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগই কৃষি কাজে নিয়োজিত; ৪ ভাগ ব্যবসায়ী এবং ৯ ভাগ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৯, ১৪ এবং ২৫। এই গ্রামীণ সমাজ কোন স্থায়ী নেতৃত্ব বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত ছিল না। আঞ্চলিক 'সমাজ' এবং আঞ্চলিক নেতারা শুধু কোন সংকটকালে আসত। এই 'সমাজ' গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে যারা মূলত বিত্তশালী এবং সমাজের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। পূর্ব পাকিস্তানের শহুরে জীবন মূলত– ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনা প্রভৃতি শহরকেন্দ্রিক ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের শহুরে সংস্কৃতি ছিল শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতি। গ্রাম এবং শহর উভয় সমাজেই অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস করা হত, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ঢাকা পড়ে। কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই ভূমি মালিক যা 'জমিদার' নামে অধিক পরিচিত এবং কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে দৃঢ় আর্থ-সামাজিক পৃথককরণ বিদ্যমান ছিল। জমিদারদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। যারা দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। ''ইস্ট বেঙ্গল এসটেটস একুইজেশন এন্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট" ১৯৫০-এর মাধ্যমে এ দেশ থেকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। বাঙ্গালি কৃষকেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোট দিয়েছিল। তারাও তাদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু জমিদার ও মহাজনীয় প্রভাব বিলুপ্ত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এরা ছিল পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় নেতাদের চেয়ে ভিন্ন। এসব উপজাতীয় নেতারা হিন্দুপ্রধান কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রাদেশিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য আঞ্চলিক শক্তি অর্জন করতে চাইতেন (সোবহান, ১৯৯৩)।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রধান নির্দেশক ছিল। উভয় প্রদেশেই অধিকাংশ জমি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত ছিল (ছক ৪.৪ দ্রষ্টব্য)। জমির মালিকানায়

প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, স্বল্প পরিমাণ জমির মালিকদের শতকরা হার পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা পূর্ব প্রদেশে বেশি ছিল। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র এবং খন্ডিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল (খান, ১৯৭১ ঃ ৭৯২)। স্বত্বাধিকার সংহতকরণের কোন সংঘটিত প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে নেওয়া হয় নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে স্বত্বাধিকার সংহতকরণ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

ছক ৪.৪ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পরিমান হিসাবে জমির মালিকানা বন্টন (১৯৬০)

জমির পরিমাণ	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
(একরে)	মালিকদের হার (%)	মোট কৃষি জমি (%)	মালিকদের হার (%)	মোট কৃষি জমি (%)
১.০ এর নিচে	২৪	৩	১৫	১
১ থেকে ৪.৯	৫৩.৫	৩৯	৩৪	৯
৫ থেকে ১২.৪	১৯	৩৯	২৮	২২
১২.৫ থেকে ২৪.৯	৩	১৪	১৫	২৬
২৫ এবং এর উপরে	০.৫	৫	৮	৪২
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ খান, ১৯৭১, পৃ-৭৯২।

ঐতিহাসিক পটভূমি

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অতীত ইতিহাস খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ই বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনের আধার হিসেবে কাজ করেছে। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে এই দুই প্রদেশেরই একটি সাধারণ অভিন্ন ইসলামি ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গুরুত্বের সাথে এই বন্ধনকে বিস্তৃত করেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য পাকিস্তানি নীতি-নির্ধারকগণ প্রায়ই দুই প্রদেশের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার পদক্ষেপ নিতেন (জাহান, ১৯৯৪)। বস্তুতঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাকিস্তানের প্রথম দাবীটি ছিল সম্পূর্ণ

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক। চৌধুরী রহমত আলী এবং তাঁর অনুসারীরা যখন 'পাকিস্তান' নাম গঠন করেন তাঁরা এভাবে চিন্তা করেন, P-Panjab, A-Afganistan, K-Kashmir, S-Sindhu and TAN-Baluchistan সেখানে পূর্ব বাংলার কোন উলেণ্ঢখই ছিল না। মুসলিমপ্রধান উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠনের জন্য ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর সম্মেলন আহ্বান করেন। মুসলিম লীগের বাঙ্গালি নেতারা এটাকে দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৬ সালে ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কেবিনেট মিশন পণ্ঢ্যান গ্রহণ করে। এটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি। কেবিনেট মিশন পণ্ঢ্যানে তিনটি উপরাষ্ট্রের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়– হিন্দুপ্রধান যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে ও মাদ্রাজ; মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এবং মুসলিমপ্রধান পূর্ব বাংলা ও আসাম। কংগ্রেস দল কেবিনেট পণ্ঢান মিশন প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস দলীয় হাই কমান্ড যখন সম্মিলিত ও সার্বভৌম বাংলার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মুসলিমপ্রধান বাংলা ও আসামের সংযোজন ভেস্তে যায়, এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের শেষ ঠিকানা হয় পাকিস্তান (সোবহান, ১৯৯৩)। ১৯৪৫ সালের ৮ই নভেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন ঃ পাকিস্তান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং এর প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে (খান, ১৯৯৮)। একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলার কিছু কিছু মুসলিম লীগ নেতারা বাধা প্রদান করেন। ১৯৪৬ সালে দিলিণ্ঢতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে একমাত্র মুসলমান রাষ্ট্রের সমর্থনে লাহোর প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয়।

পূর্ব বাংলা ও সিলেট অঞ্চলে এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ জাতীয় পরিচিতি লাভ করে। যদিও ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২২ জন ছিল অমুসলিম (হ্যাক্সনার, ১৯৬৯)। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ এমন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে যেখানে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যা শুধুমাত্র হিন্দুদের বসতিতেই নয় মুসলমান বসতিও ছিল, তদুপরি যারা ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে বাঙ্গালি মুসলমানদের নব প্রতিষ্ঠিত জাতির কাছে প্রত্যাশ্যা ছিল বেশি, কারণ ইতিহাসে এরাই ছিল সর্বাধিক বঞ্চিত ভারতীয় মুসলমান। ভারতে সংখ্যালঘু উর্দুভাষী মুসলমানদের ব্যবসা, চাকুরি, ভূমি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাল দখল ছিল এবং কোন কোন অংশে তারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালি মুসলমানরাই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়, প্রথমত ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে হিন্দু জমিদারদের দ্বারা। দীর্ঘদিন

যাবৎ বহিঃশক্তির শাসনকে পূর্ব বাংলার পশ্চাদপদতার জন্য দায়ী করা যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ক্ষমতার লড়াই, যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে রূপ নেয়, যা বাঙ্গালিদের সচেতনতার ফলে পূর্ব বাংলার একটি অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে গড়ে উঠে এবং এসব ঘটনাকে পৃথক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসাবে দেখা যাবে না (সোবহান, ১৯৯৩)।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তানের দুই অংশে প্রাপ্ত অর্থনীতি খুবই নাজুক ছিল। এই দুই প্রদেশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে উপকূলবর্তী কৃষি জমি এবং সিলেট ও আসামের চা উৎপাদনকারী কিছু অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তান পেয়ে যায় অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী, সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন এবং এক দল পেশাজীবী; তবুও পূর্ব পাকিস্তান কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে হার মানায়। যেমন- অত্যন্ত উর্বর চাষের জমির উচ্চ ধারণক্ষমতা এবং কিছু শক্তিশালী গ্রামীণ শিল্প। উদাহরণ স্বরূপ তাঁতশিল্পের কথা বলা যায়। যেখান থেকে এ অঞ্চলের মানুষের উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করা হত। এমনকি শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও দুই অংশের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। পাকিস্তানি শাসনের প্রথম দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহিত অধিকাংশ নীতি ছিল সুবিধাবাদী। অর্থনৈতিক নীতিতেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ি করতেন। অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার অর্জিত দুর্বল অর্থনীতিকেই এর জন্য দায়ী করতেন। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণগুলি বিতর্কিত। তবে এ সম্পর্কিত দলিলপত্রগুলো প্রমাণ করে যে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে ছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অবকাঠামোগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন- প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জনপরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈসাদৃশ্য, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষভাবে জনগণের প্রত্যাশা ইত্যাদি ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্থানের পূর্বসূত্র হিসাবে কাজ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আশা করেছিল সম্মিলিত ভারতে হিন্দু জমিদার এবং মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানের মহাজনদের শোষণ থেকে নিজেদের শুধু মুক্তই করবে না; বরং নিজস্ব

সংস্কৃতি অনুসারে জীবন ব্যবস্থা গড়তে পারবে। যা তাদেরকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে।

ঐতিহাসিক কারণে বাংলার মুসলমানেরা বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ যা পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান হয়, অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষা, উভয় দিক থেকে পশ্চাদপদ ছিল। এই বাংলাতেই ব্রিটিশরা প্রথম তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং শাসন করার স্বার্থে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। এই ব্যবস্থা সাধারণ ও অভিজাত মুসলমানদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে যা তারা শাসক শ্রেণী হিসাবে ভোগ করত (সীল, ১৯৬৮ ঃ ৩০)। বাংলার পূর্বাংশে মুসলিম প্রধান এলাকায় এ বৈষম্য বিশেষভাবে চোখে পড়ত। তারা স্পষ্টত শিক্ষাদীক্ষাতেও পিছিয়ে ছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা ১৭৯৩ সালে কোম্পানী অ্যাক্টের মাধ্যমে নতুন ভূ-স্বামীদের উদ্ভব হয় যাদের বেশির ভাগ হিন্দু ছিল (সীল, ১৯৬৮, ৩২-৩৩)। হিন্দু জমিদারদের প্রভাবে ইসলামি সংস্কৃতিও বাধাগ্রস্ত হয়। মূলতঃ এই কারণে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৬৩-৬৪)।

একেবারে শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী যেসব নীতি-নির্ধারণ করেন, তা তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেণ্ঢষণ করা হয়েছে। এসব কর্মকান্ড পূর্ব-পাকিস্তানিদের প্রত্যাশার প্রতিকূলে চলে যায়। তাদের না ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার স্বাধীনতা, না ছিল শাসন ব্যবস্থায় কোন ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের সুযোগ, তাদেরকে উন্নয়নশীল অর্থনীতির ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬০ সালের শেষে পাকিস্তানের জনগণের সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পূনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত ছয় দফা কর্মসূচি। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী যদি ছয় দফা মেনে নিত, তবে প্রদেশগুলোর সর্বোচ্চ স্বাধিকারসহ পাকিস্তানে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকত। পশ্চিম পাকিস্তান কেন ছয় দফা মেনে নেয় নি তার কারণ চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেণ্ঢষণ করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈধতা প্রকৃত অর্থে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। এই ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। এই অবস্থায় পাকিস্তানি শাসকদের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা ছিল- তা হচ্ছে বল প্রয়োগ। এই বল প্রয়োগের ফলেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে স্বাধীন ''বাংলাদেশ" জন্ম নেয়। দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত পূর্ব পাকিস্তানের

জনগণ পাকিস্তানের সাথে একত্রিত হওয়ার খুব একটা সুযোগ পায় নি এবং অবকাঠামোগত প্রভেদ থাকায় অধিকাংশ সময় তারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় বিরোধী হিসাবেই ছিল। এভাবেই তারা বিপণ্ঢবের একটি প্রাণবন্ত শক্তিতে পরিণত হয়। এটাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক নীতির মাধ্যমে এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ত্বরান্বিত হয়েছিল, যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপট পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন *বিউরোক্র্যাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮০।

২। বলিথো, হেকটর. *জিন্নাহ ঃ ক্রিয়েটর অব পাকিস্তান*, লন্ডন, জন মারে, ১৯৫৪।

৩। চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী. *দি এমারজেন্স অব পাকিস্তান*, নিউ ইয়র্ক, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

৪। হ্যাক্সনার, টি. *ই.পি.আই.ডি.সি-এ কংগেণ্ঢামারেট ইন ইস্ট পাকিস্তান*, ক্যামব্রিজ, হাভার্ড ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট, ১৯৬৯।

৫। *জাহান*, রওনক. *পাকিস্তান ঃ ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্র্যাশন*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃঃ ১২-১৫,২০,৩০,৩৮,৬৯।

৬। খান, এফ. করিম. *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইকোনোমিক জিওগ্রাফি*, ঢাকা, গ্রীন বুক হাউস লি., ১৯৭১ পৃঃ ৬৯১, ৭৯১-৭৯৩।

৭। খান, কে. এম. রাইসুদ্দিন. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৯৮, পৃঃ ৬৩৮।

৮। মার্শাল, চার্লস বি., "*রিফ্লেকশনস অন এ রেভ্যুলিউশন ইন পাকিস্তান*", ফরেন এফেয়ার্স, xxxvii (১৯৫৯)।

৯। *রহমান*, মোহাম্মদ আনিসুর. *ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ঃ অ্যান এনালাইসিস অভ্ প্রবেণ্ঢমস ইন পলিটিক্যাল ইকোনোমি অভ্ রেজিওনাল পণ্ঢানিং*, ক্যামব্রিজ : সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৮, পৃ-৩৩-৩৬।

১০। রশিদ, হারুন-অর. *জিওগ্রাফী অব বাংলাদেশ*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লি., ১৯৯১, পৃ-১৫০।

১১। সীল, অনিল. *দি এমারজেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম*, ক্যাইমব্রিজঃ ক্যাইমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

১২। সুবহান, রেহমান. "*বাংলাদেশ ঃ প্রবলেমস অব গভর্ন্যান্স*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লি., ১৯৯৩ পৃ-৭৯, ৮১-৮৩, ৮৯, ৯৮,১৩২।

অধ্যায়-৫

পাকিস্তানি শাসকদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক নীতি

ভূমিকা

শুরু থেকে ক্ষমতাসীনদের কিছু নীতির কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের বিদ্যমান অবকাঠামোগত পার্থক্য ক্রমশ যে তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠে, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে । অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক নীতির ফল হিসাবে গড়ে উঠে "রাজপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা" (সাঈদ, ১৯৬৮, অধ্যায়-১০)। ১৯৩৫ সালের দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এর অধীনে, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। ঐ অ্যাক্ট একটি শক্তিশালী কেন্দ্রিভুত সরকার গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রদেশগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। ১৯৩৫-এর অ্যাক্ট-এর স্থলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, সেখানে কেন্দ্রের অপরিহার্য শক্তিশালী অবস্থানকে চিরস্থায়ী করা হয়। ১৯৪৭ সালে গৃহীত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত প্রাদেশিক স্বাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে সাংবিধানিক প্রধান মনে করা হত, যিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পরামর্শ মত কাজ করবেন। প্রকৃতপক্ষে যাহা হউক প্রাদেশিক গভর্নর কেন্দ্র মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। তিনি সর্বদা কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং কেন্দ্রীভূতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত। কেন্দ্রীয় সরকার 'গভর্নরকে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫' এর ৯২-A ধারা অথবা ১৯৫৬ সালের প্রণীত সংবিধানের ১৯৩ অনুচ্ছেদে প্রয়োগের এবং প্রাদেশিক প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়ার নির্দেশ দেয় এবং এভাবে প্রদেশগুলোতে সরাসরি কেন্দ্রের শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। এর ঘৃণ্য প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ১৯৫৪ সালে। যখন নগন্য অজুহাতে নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিতাড়িত করা হয়। অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ৯০% জনগণের প্রতিনিধি ছিল। Public and Representative officers (Disqualification) Act (PRODA)-এর মাধ্যমে কেন্দ্র নির্দিষ্ট প্রাদেশিক রাজনীতিবিদদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। এর ব্যবহার সুদূরপ্রসারী ছিল।

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতিমালা

কেন্দ্রীভূতকরণের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল সার্ভিসকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয়ের অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ধরা হয়। যেমন ঃ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেন্ট্রাল অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস ইত্যাদি। এমনকি তারা যখন প্রদেশগুলোতে কাজ করত তখনও এসব কাজগুলোর সমন্বয় সাধন এবং চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রের হাতে। এটা ছিল অনেকটা স্বাধীন-পূর্ব ভারতের মত, যেখানে কেন্দ্রের সাথে প্রদেশগুলোর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী বন্ধন রচনা করত সেন্ট্রাল সার্ভিসেস। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করার পর থেকে শীর্ষ স্থানীয় সেনাকর্মকর্তারা প্রতিরক্ষা নীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সরাসরি আর্থিক নীতি প্রণয়নে জড়িয়ে পড়েন। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের এসব অফিসার প্রবল প্রভাব বিস্তার করে যা ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ (উইলকক্স, ১৯৬৫)। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় (জাহান, ১৯৭২ঃ ২৮-৩০)। কারণ তারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নিতে পারত না। এমনকি নিজেদের প্রদেশের শাসনও তাদের হাতে ছিল না। সংগতকারণে প্রাদেশিক পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসন যুক্তিসঙ্গত হয়ে উঠে। ১৯৫০ সালের শুরুতে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উঠতে থাকে, কেন্দ্রীভূতকরণ প্রক্রিয়ার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তীব্রতর হতে থাকে এবং প্রবল জনসমর্থন লাভ করে। এই স্বায়ত্তশাসনের দাবিটিই ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর ৯২-A ধারার অব্যাহত প্রয়োগ, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার প্রতি অবহেলা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমতাসীনদের অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি কারণে স্বায়ত্তশাসনের দাবী আরও জোরালো হতে থাকে।

হামজা আলাভি এবং এঙ্গাস মেডিসন এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শুরু থেকেই আমলাতান্ত্রিক এলিটরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে (আলাভি ১৯৭৩ ঃ ১৫২; মেডিসন, ১৯৭১ ঃ ১৩৬)। ১৯৫০-এর দশকে তারা ''রাজনীতিবিদদের সংসদীয় মুখোশ" পরে কাজ করতেন। ১৯৫৮ সালে তারা প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করে যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। পাকিস্তানে আমলাদের এই শক্তিশালী অবস্থান কিছুটা ঐতিহাসিক এবং কিছুটা সামাজিক অস্থিরতার ফল।

বৃটিশ ভারতে আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার ছিল আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচেটিয়া অধিকার ছিল উপনিবেশিক শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার

জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সকল প্রধান কর্মকর্তার উপর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ এবং অধীনস্থদের তদারকি। যেহেতু একটি জনবহুল দেশের শাসনে তারা ছিল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে কর্মকর্তার ছোট একটি দল তাদের প্রয়োজন ছিল, যাতে তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব হুমকির মুখে না পড়ে। এসব দিক বিবেচনায় এলিট আমলাতন্ত্র, যেমন- ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস গড়ে উঠে। এর সদস্যরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী, রাজনৈতিক এবং বিচারিক পদ পূরণের দায়িত্ব পালন করতেন। এটা শুধু সরকারের নির্বাহী বিভাগেই ছিল না বরং নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করত। এই আমলারা সর্বদাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ দখল করে থাকত এবং যতদূর সম্ভব স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। প্রশাসনের ক্ষেত্রে যাদেরকে তারা শাসন করত, তাদের প্রতি কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না এবং তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ করত না। শ্রেষ্ঠতর অবস্থান এবং পদমর্যাদার জন্য সিভিল সার্ভিসের সদস্যরাই ছিল শাসন ব্যবস্থায় মূল চালিকা শক্তি। পুরো শাসন ব্যবস্থা এমন সুচারুরূপে সম্পাদন করা হত যে এটা সনাতনী আমলাতন্ত্রের ন্যায় 'যন্ত্রের' মত কাজ করত (হাওটন, ১৯১৩ ঃ ৩০)। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার সুসংহত কার্যপ্রণালী দেখে লয়েড জর্জ এই সার্ভিসকে "ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামো" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৪৯-৫০)। ব্রিটিশ ভারতে সামরিক কর্মকর্তারাও ভারতের শাসন ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করত। তারা "রাজপ্রতিনিধিত্বমূলক" ব্যবস্থাকে জোরালোভাবে সমর্থন করত। বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল শাসনের জন্য প্রায়শঃ তাদের ব্যবহার করা হত (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৫০)।

উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান ব্রিটিশ ভারতের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে "অস্বাভাবিকভাবে বিকশিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি লাভ করে" (আলাভি, ১৯৭৩ ঃ ১৪৭)। পাকিস্তানের আমলারা "ঔপনিবেশিক আমলাদের" উত্তরসূরী হিসাবে তাদের পূর্বসূরীদের "দৃষ্টিভঙ্গি" এবং "নির্দেশনা" লাভ করে। এই সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত একই ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত, একই ধরণের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মজবুতভাবে সমন্বিত এক দল অফিসার নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের আদর্শ হয়ে উঠে। একইভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে মিলে যায় (টিংকার, ১৯৬২ ঃ ১৫৬-৬০)। স্যান্ডহার্স্ট, ক্র্যানওয়েল এবং উলউইচ প্রশিক্ষিত সিনিয়র অফিসারদের দিয়ে সেনা অফিসারদের গড়ে তোলা হত এবং তারা বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর মর্যাদা ও ঐতিহ্য সযত্নে সুরক্ষা করে চলত (আহমদে, ১৯৮০ ঃ ৫০)।

পাকিস্তানি আমলারা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বুদ্ধিদীপ্ত নির্দেশনা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। তারা উপনিবেশিক আমলাতন্ত্র গঠন এবং বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্দেশনাও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। একই নিয়মে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এবং একই প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোয় কাজ করার ফলে তারা তাদের প্রভাবশালী স্বভাব ধরে রাখতে সক্ষম হয়; এবং পাকিস্তানে তারাই সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণী হয়ে উঠে। একটি স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েকবছরের মধ্যে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জন্ম হয়। উপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকে বিলম্বিত এবং সন্দিগ্ধভাবে গড়ে উঠা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন- আইনসভা এবং স্থানীয় সরকারেরও সুগভীর ভিত্তিমূল ছিল না। পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না, আমলাদের দ্বারা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং একক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।

বর্নিত ঐতিহাসিক কারণ ছাড়া সামাজিক অস্থিরতাও সরকার কাঠামোয় আমলাদের এমন জোরালো অবস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আমলাতান্ত্রিক এলিট, শীর্ষস্থানীয় বেসামরিক চাকুরিজীবী এবং সামরিক কর্মকর্তারা অধিক সংখ্যক ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ হতে আগত। পাকিস্তানের প্রধান প্রধান সরকার নীতি প্রণয়নে এদের মুখ্য ভূমিকা ছিল (ব্রাইবানটি, ১৯৬৬ ঃ ৩৬০-৭৭)। উপমহাদেশের ঐ উত্তর-পশ্চিম অংশে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। এর পিছনে দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত, ভারতের এই অংশ ছিল অনিয়মতান্ত্রিক এলাকা (সাঈদ, ১৯৬৮ ঃ ১০৩) এবং এই এলাকায় আমলাদের শাসন ছিল ব্যক্তিগত ও পিতৃতান্ত্রিক। এখানে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে কেন্দ্র বা প্রাদেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল নূন্যতম। দ্বিতীয়ত, এই এলাকায় অনেক জমিদার ছিল এবং রাজনীতিতে তারাই আধিপত্য বিস্তার করত। সাধারণ আলোচনা অথবা রাজনৈতিক দরকষাকষি ছাড়া দলাদলী, হানাহানী অথবা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নিরসন হত। এরূপ চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির কারণে আমলাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হত। ফলে ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমলাদের হাতে চলে যেত।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব-পাকিস্তানে জেলা কর্মকর্তাদের স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে, কারণ এটি ছিল নিয়ন্ত্রিত এলাকা (সাঈদ, ১৯৬৮ ঃ ১০৩)। অধিকন্তু, পূর্ব-পাকিস্তানে জমিদারদের আধিপত্য বেশি ছিল না, কারণ এদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু এবং দেশ বিভাগের পরে এদের অধিকাংশ ভারতে চলে যায়। এই অবস্থা থেকে বুঝা যায় কেন এই এলাকায় আমলারা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রে

পূর্ব-পাকিস্তানি আমলাদের সংখ্যা ছিল কম এবং তারা কেউ উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিল না (চৌধুরী, ১৯৬৩ঃ ৭৮)। যার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষমতা রাজনীতিবিদদের হাতে চলে যায়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি বিষয়কে সমর্থন করতেন। ফলে তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং প্রায়শই নীতি-নির্ধারণী কাঠামোতে তাদের এড়িয়ে যাওয়া হত।

আমলাতন্ত্রের অঞ্চলভিত্তিক ভারসাম্যহীনতা

দেশ বিভাগের সময় থেকেই আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নয়; পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান ছিল। বেসামরিক চাকুরিজীবিদের অভিজাত স্তরে সিন্ধু প্রদেশের সদস্য ছিল মোট সদস্যের মাত্র ৫ ভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ক্ষেত্রে এই হার ছিল মাত্র ৭ ভাগ (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৬৩)। সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল সবচেয়ে কম। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। এই বাংলাতে ব্রিটিশরা প্রথম তাদের রাজত্ব কায়েম করে এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থে এখানে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মুসলমান, বিশেষভাবে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ শাসকশ্রেণী হিসাবে যে, সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তা হতে বঞ্চিত হন (সীল, ১৯৬৮ ঃ ৩০)। এহেন অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণে তারা শিক্ষার দিক থেকেও পিছিয়ে পড়ে। মাত্র বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলায় কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। এসব কারণে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্য ছিল খুব কম।

দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান হতে মাত্র ২ জন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অফিসার ছিল। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে মাত্র ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। যেখানে মোট নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৭৫ জন (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৬৪)। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য ১৯৫০ সালে কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়। কিন্তু এতে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় নি। ফলে এই দুই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ছক ৫.১ ঃ ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

বছর	সিএসপি অফিসারের মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৯৫০	১১	৪	৩৬.৪	৭	৬৩.৬
১৯৫১	১৭	৫	২৯.৪	১২	৭০.৬
১৯৫২	১৩	৩	২৩.০	১০	৭৭.০
১৯৫৩	২৫	৭	২৮.০	১৮	৭২.০
১৯৫৪	১৭	৫	২৯.৪	১২	৭০.৬
১৯৫৫	২১	১১	৫২.৪	১০	৪৭.৬
১৯৫৬	২০	৭	৩৫.০	১৩	৬৫.০
১৯৫৭	২৪	১০	৪১.৭	১৪	৫৮.৩
১৯৫৮	২৫	১২	৪৮.০	১৩	৫২.০
১৯৫৯	৩০	১০	৩৩.৩	২০	৬৬.৭
১৯৬০	২৮	১১	৩৯.২	১৭	৬০.৮
১৯৬১	২৭	১২	৪৪.৫	১৫	৫৫.৫
১৯৬২	২৮	১৩	৪৬.৫	১৫	৫৩.৫
১৯৬৩	৩১	১৩	৪১.৯	১৮	৫৮.১
১৯৬৪	৩৩	১৪	৪২.২	১৯	৫৭.৮
১৯৬৫	৩০	১৫	৫০.০	১৫	৫০.০
১৯৬৬	৩০	১৪	৪৬.৭	১৬	৫৩.৩
১৯৬৭	২০	১৩	৬৫.০	৭	৩৫.০
১৯৬৮	২০	১১	৫৫.০	৯	৪৫.০
মোট	**৪৫০**	**১৯০**		**২৬০**	

উৎস ঃ আহমেদ, এমাজউদ্দিন; *বিউরোক্রাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*। ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লি., ১৯৮০, পৃঃ ৬৫-৬৬।

ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-১৯৬৮ সাল সময়কালে নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের ৪২ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, যদিও সার্বিক প্রতিনিধিত্ব ছিল ৩০ ভাগের কম। ঐ সময় ফরেন সার্ভিস, অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস এবং ট্যাক্সেসন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৩৭.৫ ভাগ, ২৫.৫ ভাগ এবং ৩৮ ভাগ (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৬৪)।

ছক ৫.২ ঃ ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সচিবদের সংখ্যা

	সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
সচিব	১৯	-	১৯
যুগ্মসচিব	৪১	৩	৩৮
উপ-সচিব	১৩৩	১০	১২৩
সহকারি সচিব	৫৪৮	৩৮	৫১০
মোট	**৭৪১**	**৫১**	**৬৯০**

উৎস ঃ আহমদ, এমাজউদ্দীন, Op.Cit. পৃষ্ঠা-৬৬.

এই প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নস্তরে; ফলে নীতি নির্ধারনের অপরিহার্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল না। ১৯৫৬ সাল পর্যন্তও পূর্ব-পাকিস্তানের কোন লোক সচিব ছিল না এবং মাত্র তিন জন যুগ্ম সচিব, ১০ জন উপ-সচিব ও ৩৮ জন সহকারী সচিব ছিল।

ছক ৫.৩ ঃ কিছু বিভাগে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব (১৯৬৮-১৯৬৯) ঃ

বিভাগ	১৯৬৮		১৯৬৯	
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
	সংখ্যা %	সংখ্যা %	সংখ্যা %	সংখ্যা %

অর্থনৈতিক বিষয়ক	১৬	৩৬.০	২৮	৬৪.০	২০	৪৪.০	২৯	৫৯.০
বাণিজ্য	১৯	৩৮.০	৩৩	৬২.০	২০	৩৩.০	৪১	৬৭.০
অর্থনীতি	১০	২৯.০	২৭	৭১.০	১২	৩০.০	৩০	৭০.০
কৃষি	৪	১৩.০	২৬	৮৭.০	৬	১৭.০	২৮	৮৩.০
শিল্প	৯	২৮.০	২৩	৭২.০	১০	৩২.০	২১	৬৮.০
মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	৩	১৩.০	২১	৮৭.০	৪	১৬.০	২২	৮৪.০
সংস্থাপন বিভাগ	১২	৩২.০	২৫	৬৮.০	১১	৩০.০	২৫	৭০.০
পরিকল্পনা	২১	৩০.০	৫১	৭০.০	২৮	২৯.০	৬৭	৭১.০
তথ্য ও সম্প্রচার	৫	২৫.০	১৫	৭৫.০	৬	২৬.০	১৭	৭৪.০
শ্রম ও সমাজ কল্যাণ	৪	২৮.০	১০	৭২.০	৫	৩৩.০	১০	৬৭.০
প্রতিরক্ষা	৪	১০.০	৩৫	৯০.০	৫	১৩.০	৩১	৮৭.০

উৎস ঃ আহমদ, এমাজউদ্দীন, Op.Cit. পৃষ্ঠা-৬৬-৬৭।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র ২ জন সচিব এবং ৫ জন যুগ্ম সচিব ছিল। এমনকি ১৯৬৮ সালেও পূর্ব পাকিস্তান হতে ২ জন সচিব এবং ৮ জন যুগ্ম সচিব ছিল। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ অথবা অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগ, অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র–এসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ কোন পূর্ব-পাকিস্তানি কর্মকর্তার অধীনে ছিল না। এমনকি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়েও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব কম। কিছু বিভাগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১০% থেকে ১৩%।

ছক ৫.৪ ঃ সশস্ত্র বাহিনীতে ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

সেনাবাহিনী	শতকরা হার
১. অফিসার	৫.০
২. জুনিয়র কমিশন পদ	৭.৪

৩. অন্যান্য পদবী	৭.৪
বিমান বাহিনী	
১. অফিসার	১৬.০
২. ওয়ারেন্ট অফিসার	১৭.০
৩. অন্যান্য পদবী	৩০.০
নৌবাহিনী	
১. অফিসার	১০.০
২. ব্রাঞ্চ অফিসার	৫.০
৩. চীফ পেটি অফিসার	১০.৪
৪. পেটি অফিসার	১৭.৩
৫. লিডিং সিমেন এবং নিম্নপদস্থ	২৮.৮

উৎস ঃ আহমদ, এমাজউদ্দীন, Op.Cit. পৃষ্ঠা-৬৯।

সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মত সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদস্থ অফিসারেরাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। এর পেছনেও ঐতিহাসিক কারণ ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে ব্রিটিশরা ভারতের উত্তর ও পূর্ব অংশের কিছু নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ধীরে ধীরে অপসারণ করে। (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ৬৭)। ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অধিকাংশ নিয়োগ দেওয়া হত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের তথাকথিত ''যুদ্ধবাজ জাতি" থেকে (কোহেন, ৩২-৩৬)। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে "সেনাবাহিনীতে আসীন যারা সিপাহী হিসাবে ভাল করত ঐসব জাতি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারত না।" তবুও তাদের অধিকাংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হত (দি ইন্ডিয়ান স্টেটিউটরি কমিশন, ১৯৩০)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবাজ জাতি হিসাবে পরিচিত না হওয়ার পরও তাদের মধ্য থেকে উলেণ্টখযোগ্য সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এতো চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে যে তথাকথিত যুদ্ধবাজ জাতিকে ঘিরে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীকেও হার মানায়। যুদ্ধের পর তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভাল অবস্থানে চলে আসে। কিন্তু পাকিস্তানে ঐ পৌরাণিক রীতি বজায় ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিসর বৃদ্ধি করা হত মূলতঃ পশ্চিম

পাকিস্তান থেকে; বিশেষ করে উত্তর পাঞ্জাবের চারটি জেলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দু'টি জেলা থেকে। সার্বিক বিবেচনায় অফিসার পদে এবং অন্যান্য পদে পূর্ব-পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব ১০% থেকে ১১%-এর বেশি ছিল না (ছক ৫.৪)। তাই পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা ছিল আঞ্চলিক দিক থেকে একটি সংরক্ষিত গোষ্ঠী।

শুরু থেকেই পাকিস্তানে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতির অনুসরণ করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক আমলাতন্ত্রের শোষণনীতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দশকে জাতীয় ক্ষমতার শীর্ষে বাঙ্গালীদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিবেচনায় কিছুটা ভারসাম্য ছিল। ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের পর এই ভারসাম্যটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ সেনাবাহিনীর শাসন ছিল কার্যত আমলাতান্ত্রিক এলিটদের শাসন, সেনা অফিসারগণ ভাগাভাগি করে এই ক্ষমতা ভোগ করতেন; যেখানে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল সর্বনিম্ন।

ছক ৫.৫ ঃ কেন্দ্রীয় শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯৪৭-৫৮

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাষ্ট্রপ্রধান	২	২
প্রধানমন্ত্রী	৩	৪
মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীসহ	২৭	২৭
জাতীয় সংসদ এবং সাংবিধানিক সংস্থার সদস্য	৮৪	৭৫

উৎস ঃ জাহান, রওনক; পাকিস্তান ঃ ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লিঃ, ১৯৭৩, পৃ-২৫।

১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানের উন্নয়ন কৌশল এবং নীতি-নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত আমলাদের মাত্র গুটি কয়েকজন ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। ১৯৫৮-১৯৭০ সাল পর্যন্ত দুইজন প্রধান সামরিক শাসক, জেনারেল এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। ঐ সময়ে ৯ জন গভর্নর এর সাতজন ছিল উচ্চ পদস্থ আমলা এবং তাদের মধ্যে ছয়জনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। অর্থ, শিল্প, খাদ্য, কৃষি, অর্থনীতি বিষয়ক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সতেরজন মন্ত্রীর এগারজনই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি। এদের মধ্যে ছিল দশজন আমলা যাদের আটজনই পশ্চিম-পাকিস্তানের। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনগুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত

একচল্লিশজন সচিব ও যুগ্মসচিবের মধ্যে মাত্র তিনজন সচিব এবং চারজন যুগ্মসচিব ছিল পূর্ব-পাকিস্তানি। গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেশনগুলোর চেয়্যারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োজিতদের শতকরা আশিজনেরও বেশি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ নীতি

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ নীতি যখন বাঙ্গালীদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যু উত্থাপনে উৎসাহিত করে তোলে, তখন সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ নীতি তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আরও প্রবল করে তোলে। এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। জাতীয় নেতারা বিশ্বাস করতেন কেবল একটি ভাষা এবং সংস্কৃতিই পাকিস্তানের দুই অংশকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রথম এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি বক্তব্যে বলেন ঃ "আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, অন্য কোন ভাষা নয়, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। এ ব্যাপারে যারা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তারা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের শত্রু। একটি অভিন্ন রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না এবং কোন কাজ করতে পারে না" (আহমেদ ১৯৬০ ঃ ৪৯০)।

জাতীয় পরিষদে সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, উর্দূ এবং ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকে সংসদে ব্যবহারের অনুমতি দেন। একই সুরে সুর মিলিয়ে তিনি ঘোষণা করেন– "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং অবশ্যই ভাষার মাধ্যম মুসলমানদের জন্য একটি হওয়া উচিত। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে এই উপমহাদেশের শত মিলিয়ন মুসলমানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং এদের ভাষা উর্দূ। একটি জাতির জন্য একটি অভিন্ন ভাষা প্রয়োজন এবং পাকিস্তানে এটা হবে উর্দূ, অন্য কোন ভাষা নয়" (জাতীয় পরিষদ বিতর্ক, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

ভাষা ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের এই নীতি বিভিন্ন ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠী সমৃদ্ধ অসাদৃশ পাকিস্তান সমাজে একটি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বাত্মকভাবে এর প্রতিবাদ করে। কারণ তারা বুঝতে পারেন এটা প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব-পাকিস্তানিদের চিরতরে পরাভূত করে রাখার অপকৌশল। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের লোকজন ১৯৫০ সালের প্রথম বেসিক

প্রিন্সিপাল কমিটি রিপোর্ট (বি.পি.সি.) প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এতে উর্দূকে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। শুধু ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীই নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলও এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

তবে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। অবশেষে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা এবং উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে এর জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়। এভাবে কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক নীতি পাকিস্তানের দুই অংশকে সমন্বিত করার পরিবর্তে তাদের সম্পর্কে পারস্পারিক বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। অনেক আগে থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে দানা বাঁধতে থাকা ভাষা আন্দোলন, সুশীল সমাজের উত্থানের সাথে সাথে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে (জাহান, ১৯৭৩ ঃ ৪২-৪৩)। এই আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের একটি ভাষাগত জাতীয়তাবাদ লালন এবং "ছাত্র-পেশাজীবি-বুদ্ধিজীবি" ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা পরবর্তীকালে আন্দোলনগুলোতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। এটা সুশীল সমাজকে একটি জনপ্রিয় ইস্যু প্রদান করে, যার ফলে বাঙালিরা সমন্বিত হতে থাকে এবং নেতা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যবধান কমানো সহজ হয়ে উঠে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র এবং শিক্ষকগণ এই ইস্যুর বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং দাবি তুলতে থাকেন যে, বাংলাও একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত। কারণ এটি পাকিস্তানের ৫৪% জনগণের মাতৃভাষা। সুশীল সমাজের মুখপাত্র হিসাবে ছাত্ররা এই জনপ্রিয় ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে। ১৯৫২ সালে বিশেষভাবে ২১ ফেব্রুয়ারিতে, এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। সেদিন সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢাকায় বিশাল জনসমাবেশ হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন ছাত্র প্রাণ হারায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্থানে গভীর প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালি সমাজে একটি নতুন আদর্শ, নতুন প্রতীক এবং নতুন শ্লোগানের জন্ম দেয় যা বিকাশমান স্বদেশীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তোলে। এই আন্দোলন তাদেরকে মাত্র একটি অভিন্ন ইস্যুই এনে দেয়নি, এই ঘটনা তাদেরকে দিয়েছে শহীদদের স্মৃতি। সমগ্র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা থেকে নব জন্ম লাভ করেছে। প্রতি বছর স্মরণীয় দিন হিসাবে এই দিনটি মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়।

১৯৯৯ সালে ১৮৮ জাতি নিয়ে গঠিত ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এক কথায়, পাকিস্তানের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ এবং সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যকরণ নীতি পূর্ব পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শুধু পৃথক করেই দেয় নি; এর ফলে জাতি হিসাবে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের ব্যাপারে বাঙ্গালীরা সচেতন হয়ে উঠে। পাকিস্তানভিত্তিক শীর্ষ আমলারা সবসময় তাদের মনে করিয়ে দিত যে, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে বাঙালীরা সমান অংশীদার নয়। অন্যদিকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালীদের একটি অনন্যতার ধারণা লালন করতে শেখায়, যা তারা পূর্বে কখনও অনুভব করে নি। সর্বোপরি, এসব ঘটনা পূর্ব-পাকিস্তানের নেতাদের মনে এক প্রকার প্রত্যাশার জন্ম দেয়। যার অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ গৃহীত ছয় দফা কর্মসূচি।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক নীতির ফলে সৃষ্ট পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্কহীনতা আরও গভীর হয়ে উঠে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে যা ১৯৫০ দশকের শুরু থেকেই অনুসৃত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, *বিউরোক্র্যাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লি., ১৯৮০।

২। আহমেদ, জামিলউদ্দিন সম্পাদিত, *স্পিচেস এন্ড রাইটিং অভ্ মি. জিন্নাহ, ভলিউম ২"* লাহোর ঃ আশরাফ।

৩। আলাভি, হামজা, *"দি স্টেটস্ ইন পোস্ট কলোনিয়াল সোসাইটি"* ইন কেথলিন গফ এবং এইচ শর্মা সম্পাদিত" ইমপেরিয়ালিজম এন্ড রেভোলিউশন ইন সাউথ এশিয়া, লন্ডন ঃ মানথ্লি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৩।

৪। ব্রাইবেনটি, রালফ, *রিসার্চ অন দি বিউরোক্র্যাসি অভ্ পাকিস্তান*, ডুরহাম, এন.সি ঃ ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬।

৫। চৌধুরী, এম. এ., *দি সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান, ঢাকাঃ* এন আই পি এ, ১৯৬৩।

৬। কোহেন, স্টিফেন পি., *আর্মস এন্ড পলিটিকস্ ইন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান*, বাফেলো ঃ কাউন্সিল অভ্ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩।

৭। *"কন্সটিটিউন্ট অ্যাসেম্বলি অব পাকিস্তান*, ডিবেইটস, ইসলামাবাদ ঃ ভলিউম ২, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

৮। *হুটন*, বানার্ড, *বিউরোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট*, লন্ডনঃ পি.এস. কিং এন্ড সান, ১৯১৩।

৯। *জাহান*, রওনক, *পাকিস্তান ঃ ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৭৩।

১০। মেডিসন, অ্যাঙ্গাস, *ক্লাস, স্ট্রাকচার এবং ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান সিন্স দি মোঘলস*, লন্ডন ঃ জর্জ এলেন এন্ড হুউইন লিঃ, ১৯৭১।

১১। সাঈদ, খালেদ বিন, *পাকিস্তান ঃ দি ফরমেটিভ ফেজ*, লন্ডন ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

১২। সাঈদ, খালেদ বিন, *দি পলিটিক্যাল সিসটেম অব পাকিস্তান*, বোসটন ঃ হওটন মিফলিন, ১৯৬৭।

১৩। *সীল*, অনীল, *দি এমারজেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম*, ক্যাইমব্রিজ ঃ ক্যাইমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

১৪। *দি ইন্ডিয়ান স্টেটিউটরি কমিশন রিপোর্ট*, লন্ডন ঃ হার ম্যাজেস্ট্রিস স্টেশনারী অফিসার, ভলিউম ১, ১৯৩০।

১৫। টিংকার, হিউ, *ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান ঃ এ পলিটিক্যাল এনালাইসিস*, নিউইয়র্ক ঃ প্রেজার, ১৯৬২।

১৬। উইলকক্স, ওয়েনি এ., *পাকিস্তান ঃ দি কনসলিডেশন অভ্ এ ন্যাশন*, নিউইয়র্ক ঃ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

অধ্যায়-৬

পাকিস্তানি শাসকদের অর্থনৈতিক নীতি

ভূমিকা

পাকিস্তানের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূতকরণ ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নীতি যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাঙ্গালিদের উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, তখন তাদের অর্থনৈতিক নীতি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সরাসরি আঘাত করে। ফলে বাঙ্গালীদের বিচ্ছিন্নতা দাবি আরও প্রকট হয়ে উঠে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী ও ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পকিস্তানিরা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক হয়ে উঠতে শুরু করে।

পূর্বেই উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। কিন্তু যে বিষয়ে এই দুই অংশের মধ্যে মিল ছিল, তা হচ্ছে উভয় অংশই শিল্পে অনুন্নত। পাকিস্তানে শুধু কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপন্ন হত। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের পাঠের মধ্যে ৮৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হত। পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন হত উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণ ভাল মানের তুলা। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশেই শিল্প কারখানার ভিত্তি অভিন্ন প্রকৃতির ছিল (পাপানেক, ১৯৬৪ ঃ ৪৮)। শিল্প উন্নয়নের দিক থেকে দুই অংশের ব্যবধান ছিল অতি নগন্য। যদিও টেক্সটাইল ও চা শিল্পে পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে চিনি ও ধাতব শিল্পে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল এগিয়ে (সোবহান, ১৯৬২ ঃ ৩১-৩৭)। তবে সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অগ্রসর ছিল। যদিও ব্যাংকিং কার্যক্রম বিবেচনায় পূর্ব-পাকিস্তান কিছুটা ভাল অবস্থানে ছিল (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ১১৮-১১৯)। সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল অত্যন্ত নগণ্য। অবশ্য মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু বেশি ছিল।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য

দুই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিদ্যমান সামান্য ব্যবধান দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ সালের মধ্যেই বৈষম্য জটিল আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রস রিজিওনাল প্রোডাক্টস (জি.আর.পি) ১৯৪৯/৫০ সালে ছিল ১২,৩৬০ মিলিয়ন রুপি, ১৯৫৯/৬০ সালে হয় ১৪,৯৪৫ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে ২৩,১১৯ মিলিয়ন রুপিতে গিয়ে দাড়ায়। দেশ বিভাগের পর ১ম দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.২% এবং দ্বিতীয় দশকে ৫.৪%।

অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের জি.আর.পি ১৯৪৯/৫০ সালে ছিল ১২,১০৬ মিলিয়ন রুপি, ১৯৫৯/৬০ সালে ছিল ১৬,৪৯৪ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে ৩১,১৫৭ মিলিয়ন রুপিতে গিয়ে পৌঁছে। পশ্চিম পাকিস্তানে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রথম দশকে ছিল ৩.৬% এবং দ্বিতীয় দশকে ৭.২ %। (ছক ৬.১)

ছক ৬.১ ঃ ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জি.আর.পি (মিলিয়ন রুপি)

	১৯৪৯/৫০	১৯৫৯/৬০	১৯৬৯/৭০
পূর্ব পাকিস্তান	১২,৩৬০	১৪,৯৪৫	২৩,১১৯
পশ্চিম পাকিস্তান	১২,১০৬	১৬,৪৯৪	৩১,১৫৭

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬৫-৭০, অফ সিট, পৃ-১১; পাকিস্তান সরকার, পণ্ঢানিং কমিশন, ১৯৭০-৭৫ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট; (ইসলামাবাদঃ জুলাই ১৯৭০) ১, পৃঃ ১৩৪।

প্রবৃদ্ধির হারের প্রতিফলন ঘটে দুই অংশের জনগনের মাথাপিছু আয়ের উপর। ১৯৪৯/৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৮ রুপি, ১৯৫৯/৬০ সালে ৩৬৭ রুপি, এবং ১৯৬৯/৭০ সালে ৫৩৩ রুপি। অন্যদিকে পূব-পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৯৪৯/৫০ সালে ছিল ২৮৭ রুপি, ১৯৫৯/৬০ সালে ২৭৭ রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে ৩৩১ রুপি (ছক ৬.২)

ছক ৬.২ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়, ১৯৫৯/৬০ মূল্য (রুপি)

	১৯৪৯/৫০	১৯৫৯/৬০	১৯৬৯/৭০
পূর্ব পাকিস্তান	২৮৭	২৭৭	৩৩১
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৩৮	৩৬৭	৫৩৩

উৎস ঃ পাকিস্তান সরকার, পণ্ঢানিং কমিশন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬৫-৭০ (করাচি ঃ ১৯৬৫) পৃঃ-১১; ১৯৭০-৭৫ সালে পাকিস্তান সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (ইসলামাবাদ, জুলাইঃ ১৯৭০) ভলিউম ১, পৃঃ-১৩৪।

cÖe„w×i nvi gv_vwcQy Av‡qi AvšÍ-AvÂwjK ˆel‡g¨i Awbevh© dj| ¯^vaxbZvi ci GB ˆelg¨ `ª“Z e„w× †c‡Z _v‡K| 1949/50 mv‡j GB ˆelg¨ wQj 19%, 1959/60 mv‡j e„w× †c‡q 32% Ges 1969/70 mv‡j 61% wM‡q †cŠu‡Q (QK 6.3)| G cwimsL¨vb `yB AÂ‡ji ˆelg¨g~jK Dbœq‡bi wb`k©b|

ছক ৬.৩ ঃ ১৯৫৯/৬০ সালের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু জি.আর.পি হারের মূল বৈষম্য

	মাথাপিছু জি.আর.পি	মাথাপিছু জি.আর.পি	পূর্ব ও পশ্চিম

	(পূর্ব পাকিস্তান)	(পশ্চিম পাকিস্তান)	পাকিস্তানের বৈষম্যের হার %
১৯৪৯/৫০	Rs ২৮৭	Rs ৩৪৫	১.১৯
১৯৫৯/৬০	Rs ২৬৯	Rs ৩৫৫	১.৩২
১৯৬৯/৭০	Rs ৩১৪	Rs ৫০৪	১.৬১

উৎস ঃ উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট; চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭০-৭৫, অফ সিট, পৃঃ-২২,১৩৬।

দু'টি কারণে এই বৈষম্যকে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। প্রথমত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন বা মূল্য সংযোজন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল বেশি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল কম (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ১১৯)। দ্বিতীয়ত, এসব তুলনা একই জিনিসের আন্তঃ-আঞ্চলিক মূল্যের পার্থক্য প্রকাশ করে না। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানে টাকার মান ছিল কম। ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৬-৬৯ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় গড়ে ৫%−৭% বেশি ছিল।

এই পার্থক্যমূলক প্রবৃদ্ধির হারের প্রাথমিক কারণ হল শিল্পায়নের প্রভেদ। ১৯৪৯/৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৯.৪ ভাগ আসে শিল্পক্ষেত্র থেকে। ১৯৬৯/৭০ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২০ ভাগ গিয়ে দাড়ায়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৯/৫০ সালে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪.৭ ভাগ এবং ১৯৬৯/৭০ সালে এই পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত হয় (গ্রিফিন এবং খান, ১৯৭২ ঃ ৪)। শিল্প কর্মসংস্থানের মোট শ্রমিক শক্তির অংশকে সূচক হিসাবে ধরা হলে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন অত্যন্ত নগন্য ছিল। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫১-৬১ সালে শিল্পায়নে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের হার এই সময়ে ৮৪.৭% থেকে ৮৫.৩% উন্নীত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি শ্রমিকের হার ৬৫.৩% থেকে ৫৯.৩%-এ নেমে আসে। ১৯৬৬/৬৭ সালে এই হার আরও ৫৩.৪%-এ নেমে আসে (গ্রিফিন এবং খান, ১৯৭২ ঃ ৪)। এ পরিসংখ্যানে অর্থনীতির তুলনামূলক গতি প্রকৃতি ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত।

১৯৪৮ সাল হতে সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতি, ভারসাম্যহীন বিনিয়োগ পাকিস্তানের দুই প্রদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির বৈষম্যের অন্যতম করণ। ১৯৫০ -এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগের অংশ ২১%-২৬% এবং ৬০-এর দশকে ৩২%-৩৬% -এর মধ্যে উঠানামা করত। কিন্তু রাজস্ব ব্যয় এবং উন্নয়নের বিরাট অংশ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। (ছক ৬.৪)

ছক ৬.৪ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় (কোটি রুপি)

বছর	রাজস্ব ব্যয়	উন্নয়ন পরিকল্পনা	বহির্বিভাগ পরিকল্পনা	মোট	পাকিস্তানের মোট উন্নয়ন

		ব্যয়	ব্যয়		ব্যয় (%)
পূর্ব পাকিস্তান					
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	১৭১	১০০	-	২৭১	২০
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	২৫৪	২৭০	-	৫২১	-
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	৪৩৪	৯২৫	৪৫	১,৪০৪	৩
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০	৬৪৮	১,৬৫৬	-	২,১৪১	৩৬
পশ্চিম পাকিস্তান					
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	৭২০	৪০০	-	১,১২৯	৮০
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	৮৯৮	৭৫৭	-	১,৬৫৫	৭৪
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	১,২৮৪	১,৮৪০	২১১	৩,৩৫৫	৬৮
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০	২,২২৩	২,৬১০	৩৬০	৫,১৯৫	৬৪

উৎস ঃ উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট; চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭০-৭৫, অফ সিট, পৃঃ-২৫।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১১৬০ কোটি রুপি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাত্র ২৫৪ কোটি রুপি পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাকি ৮৯৮ কোটি রুপি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি এবং বেসরকারী খাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বরাদ্ধ ছিল যথাক্রমে ৪৭% এবং ৩০%। প্রকৃতপক্ষে সরকারি এবং বেসরকারী খাতে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ব্যয় হয় মাত্র ৩২%। তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৩৬%।

মাথাপিছু হিসাব দেখলে উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয়ের অবস্থান পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। ১৯৪৭-৫৫ সাল পর্যন্ত গড়ে মাথাপিছু রাজস্ব এবং উন্নয়ন ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৩৭.৭৫ রুপি এবং ২২.০৮ রুপি। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ২০১.৯৪ রুপি এবং ১০৮.০৩ রুপি (ছক ৬.৫)।

ছক ৬.৫ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয় ১৯৫০-৭০

বছর	রাজস্ব ব্যয় (কোটি)	উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় (কোটি)	গড়ে জনসংখ্যা মিলিয়ন (এম)	মাথাপিছু ব্যয় (রুপি) উন্নয়ন	মাথাপিছু ব্যয় (রুপি) উন্নয়ন
পূর্ব পাকিস্তান					
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	১৭১	১০০	৪৫.৩	২২.০৮	৩৭.৭৫

১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	২৫৪	২৭০	৫২.০	৫১.৯২	৪৮.৮৬
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	৪৩৪	৯৭০	৫৯.৪	১৬৩.৩০	৭৩.০৬
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০	৬৪৮	১,৬৫৬	৬৯.০	২৪০.০	৭০.২৯
পশ্চিম পাকিস্তান					
1950/51-1954/55	729	400	36.1	108.03	201.94
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	৮৯৮	৭৫৭	৪২.৩	১৭৮.৯৬	২১২.২৬
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	১,২৮৪	২,০৭১	৪৯.১	৪২১.৭৯	২৬১.৫১
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০	২,২২৩	২,৯৭০	৫৭.০	৫২১.০৫	৩৯০.৩৫

উৎস ঃ ছক ৬.৪ এর অনুরূপ।

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হত। ১৯৪৭/৪৮-১৯৫৯/৬০ পর্যন্ত ৫৪২.১৪ কোটি রুপি বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতার মধ্যে মাত্র ৯৩.৮৯ কোটি রুপি পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয় হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য-সহযোগিতার ৪০৯ কোটি রুপির মাত্র ১২৯ কোটি রুপি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়। যা মোট অংশের যথাক্রমে ১৭% এবং ৩০%। বাকি অংশ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে (গভর্নমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান, পণ্যানিং ডিপার্টমেন্ট, ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি বিটুয়েন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, ১৯৬১ ঃ ২১)। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার অনুদান ও ঋণসহ মোট ৭০০৩ মিলিয়ন রুপি অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করে (আহমেদ, ১৯৮০ ঃ ১২৩)। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনা পূর্ব-পাকিস্তান গ্রহণ করেছে বৈদেশিক সাহায্যের ২৫% এবং তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে মাত্র ৩০%।

অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পদের অসম বন্টন দুই অঞ্চলের উন্নয়ন কৌশলের অনিবার্য ফল। পাকিস্তানের উন্নয়ন কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এক-আর্থিক নীতির ভিত্তিতে উদ্যোক্তা আহ্বান। দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতার দোহাই দিয়ে আমলারা এ নীতিকে সমর্থন করত। তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হলেও বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, পরিবহণ সুবিধা এবং আনুপাতিক হারে অধিক প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিক উন্নত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এগুলো কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করাচি বন্দর বেশ উন্নত ছিল। অধিকন্তু অধিকাংশ শরণার্থী শিল্পপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি গড়ে তোলে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকসংখ্যক ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও কারিগরি দক্ষতা

সম্পন্নদের সমাবেশ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল দূর্বল। চট্টগ্রাম বন্দর তখন এত উন্নত ছিল না। সল্পসংখ্যক উদ্যোক্তা ছিল। এভাবে উদ্যোক্তাদের সুবিধাভিত্তিক একমুখী আর্থিক নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালে শিল্প উন্নয়নের অবস্থা দুই প্রদেশে মোটামুটি একই রকম ছিল। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক সাফল্য বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল; পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শহরে। একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার দেশের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষ করে শিল্প উদ্যোগ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আমদানি নীতিমালা, সম্পদের বন্টন প্রভৃতি বিষয়কে কুক্ষিগত করে রেখেছিল (রহমান, ১৯৬৮ ঃ ১৬)। পশ্চিম পাকিস্তান বিপুল সাফল্য অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রন নয়, বরং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের ১০০ ভাগ দখল করে নিয়েছিল।

মোট ব্যয়ের অনুমান ৭৫ ভাগ বরাদ্দ করা হত পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে। অথচ সেখানে বাস করত দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৬ ভাগ। এহেন পক্ষপাতমূলক বন্টন ব্যবস্থা শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেনি; সাথে সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করে। পৌনে এক মিলিয়নের অধিক সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের সিংহভাগই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি এবং অধিকাংশই পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থান করত। বিদ্যমান সামরিক শিল্প ব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষার জন্য কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ কুটনীতিকদের প্রায় ১০০ ভাগের সপরিবারে পশ্চিম-পাকিস্তানভিত্তিক অবস্থান ছিল। যা পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্প-উৎপাদনের বাজার সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মুলধন যোগাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সকল কারণে পশ্চিম-পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল (রহমান, ১৯৬৮ ঃ ১৬)। পূর্ব-পাকিস্তানের দূর্বল আর্থিক অবস্থা হতে যাত্রা শুরু হয়, শিল্পোদ্যোক্তার অভাব ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধা নীতি-নির্ধারকদের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পায়নের যা বরাদ্দ করা হত তা দিয়ে তারা কাজ করে যেত।

পাকিস্তানের অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আই.ডি.বি.পি) শিল্পোন্নয়নের জন্য ১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৯/৭০ পর্যন্ত ঋণ বাবদ ২,০৪৪ মিলিয়ন রুপি বরাদ্ধ করে। তম্মধে পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্ধ ছিল মাত্র ৯৯০.৮ মিয়িলন রুপি। পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল

ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (পি.আই.সি..আই.সি) ১৯৫৭/৫৮ থেকে ১৯৬৮/৬৯ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের ঋণ হিসাবে ২,৫২১.৯৩ মিলিয়ন রুপি প্রদান করে; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানি বিনিয়োগকারীরা পায় মাত্র ৮২১.২৮ মিলিয়ন রুপি (৩২.২৮%)। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাইভেট সেক্টর সমৃদ্ধশীল হওয়ার সুযোগ ছিল না।

উভয় অঞ্চলের অসমঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয় এবং, বেসরকারি খাতসমূহে বৈষম্যমূলক বৃদ্ধি ছাড়াও সরকারের কৃষিনীতি বিশেষ করে প্রথম দশকে, বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। পাকিস্তান সরকার বেসরকারি খাতের মাধ্যমে শিল্পায়নের নীতি অবলম্বন করে। শিল্পায়নকে স্বার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য কৃষিখাতের ভর্তুকির পর্যাপ্ত অংশ টেনে নিয়ে শিল্প খাতে বরাদ্ধ করা হত। মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ শিল্পক্ষেত্রে পুনঃ সংযোজনের জন্য উদ্বৃত্ত রাখা হত এবং কৃষকের উপর এর দায় ছিল তাদের আয়ের শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি। এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অধিক রপ্তানী করত (হক ৬.৬) । মোট রপ্তানিতে কৃষি পণ্যের একটি বড় অংশ পূর্ব পাকিস্তান আয় করত। কৃষি খাত থেকে উদ্বৃত্ত আয় শিল্পক্ষেত্রে নিয়ে আসার নামে মূলত পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি খাত থেকে উদ্বৃত্ত আয় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পে স্থানান্তর করা হত। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিপরীতে পশ্চিম-পাকিস্তানি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের নিকট আমদানী লাইসেন্স প্রদান করা হত। ১৯৫০-এর দশক ধরেই এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৬০-এর দশকে সরকার যখন কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা দিতে শুরু করে তখন জমিদার এবং ধনী কৃষকরাই বেশির ভাগ সুবিধা পায়। যাদের শতকরা ৯০ জনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্তি এবং আন্ত-আঞ্চলিক বানিজ্যে ঘাটতিসহ পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হত। পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক মুদ্রার একটি বৃহৎ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে অর্জন হত। একই সাথে আমদানির সিংহভাগ বরাদ্দ হত পশ্চিম পাকিস্তানে। আঞ্চলিক পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুর্ব পাকিস্তানের চলতি হিসাবে অব্যাহত ঘাটতি ছিল যা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এর বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অপেক্ষা কম ছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হত। (ষ্টার্ন, ১৯৭০ ঃ ১৪; রহমান, ১৯৬৮ ঃ ১১-১৫)। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হত। হক ধারণা করেন যে এরূপ সম্পদ স্থানান্তরের পরিমাণ ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ২১০ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ১০০ মিলিয়ন রুপি (হক ১৯৬৩ঃ১০০)। অর্থনীতিবিদদের উপদেষ্টা পরিষদ এর মতে প্রতি বছর সর্বমোট ১,৫৫৬ মিলিয়ন রুপি হারে স্থানান্তরের মোট পরিমাণ হবে ৩১,১২০

মিলিয়ন রুপি (চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনার ১৯৭০-৭৫) উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট, ভলিয়ম-১ পৃঃ ৮৪-৮৬)। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান উন্নতি লাভ করে।

কিন্তু এতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর মানুষ দারিদ্রের কবলে পতিত হয় নি বরং পূর্ব-পাকিস্তানের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের আয় আরও বেড়ে যায়। তাদের এই আয় আরো স্ফীত হয়ে ওঠে সরকার যখন ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করার এবং সরকারি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বাঙ্গালী অভিজাত পরিবারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তাঁদের আকাঙ্খা বেড়ে যায়, ফলে তারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে আমলাদের সৃষ্ট ব্যবস্থায় তাঁদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন তাঁরা এই ব্যবস্থার অবকাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নীতি নির্ধারকদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা স্বরূপ সৃষ্ট ছয়দফা কর্মসূচিকে বর্ণিত অবস্থার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল ঃ ছয়দফা কর্মসূচির উত্থান

ছয় দফা কর্মসূচী একটি তাৎপর্যপূর্ণ আর্থ-রাজনৈতিক দলিল। রাজনৈতিক ভাবে এই কর্মসূচি পুরো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর একটি প্রয়াস। যাতে বাঙ্গালি নেতারা রাজনীতিতে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ পান। আর্থিক বিবেচনায় এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের ব্যবস্থাপনা এ অঞ্চলের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সামরিক দিক থেকে এটা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্যোগ। বাঙ্গালি রাজনৈতিক নেতারা মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংসদীয় ব্যবস্থা নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে তাঁদের অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তুলবে। ছয় দফা কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়। যেখানে সার্বজনীনভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এবং জোটবদ্ধ ইউনিটগুলোর পার্লামেন্টে সরাসরি নির্বাচন হবে (রহমান, ১৯৬৬)।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের ফলপ্রসু অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ ও আমলারা উন্নয়ন কৌশল এবং নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করত। তাঁরা বলেন যে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের কারণে পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে আছে। তাঁরা বলতেন, দুই অঞ্চলের জন্য দুটি অর্থনৈতিক কৌশল থাকা উচিত। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান অভিন্ন ভিত্তি থেকে যাত্রা শুরু করলেও স্বাধীনতার পর শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায়। এর প্রধান কারণ, পূর্ব পাকিস্তানি কৃষকদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে ব্যয়। তাঁরা আরো বলেন যে, যদিও ১৯৫০ এর দশকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ৭০% থেকে নেমে আসে, তবুও তা ১৯৬০ এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশের চেয়ে বেশি। এমন কি ১৯৬৬ সালেও এই হার ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ।

ছক ৬.৬ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় (মিলিয়ন রুপি)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট বৈদেশিক আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)
১৯৬০/৬১	১,২৫৯	৫৪০	৭০
১৯৬১/৬২	১,৩০১	৫৪৩	৭০
১৯৬২/৬৩	১,২৪৯	৯৯৮	৫৫
১৯৬৩/৬৪	১,২২৪	১,০৭০	৫৪
১৯৬৪/৬৫	১,২৬৮	১,১৪০	৫৩
১৯৬৫/৬৬	১,৫১৪	১,২০৪	৫৫
১৯৬৬/৬৭	১,৬৬০	১,৩২৫	৫৬

উৎস ঃ এমাজউদ্দিন আহমদে, অফ সিট, পৃঃ-১২৮।

পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার কারণে বাঙ্গালীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মালামাল ও সেবা কিনতে বাধ্য হয়। ফলে তারা তাদের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে সমর্পন করতে হয়। অধিকন্তু, যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানি কারখানাগুলো নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় পরিচালিত হত, তাই বাঙ্গালীদের উচ্চ দরে পাকিস্তানি পণ্য কিনতে হত। এ জন্য বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ এবং আমলারা বলেন যে শাসক শ্রেণীর গৃহীত উন্নয়ন কৌশলই আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য দায়ী। শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিকসংখ্যক লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানের মাধ্যমে সেখানে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করত। এলক্ষ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানে অধিক বরাদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণ এবং অনুদান দেয়া হত। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মাত্র ৮ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য পায়। ১৯৭০ সালে এর পরিমাণ ৭.০৩ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে

পৌঁছে (পাকিস্তান ইকোনোমিক সার্ভে, ১৯৭০-৭১)। বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ এবং আমলারা আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণই শুধু তুলে ধরেন নি; তাঁরা এর সমাধানের সম্ভাব্য পরামর্শও দিয়েছেন ঃ- "পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অবশ্যই গতিশীল প্রবৃদ্ধি থাকবে; অন্যভাবে বলা যায়, পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনীতি পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা কম গতিশীল থাকবে যদিও সন্দেহাতীত ভাবে এটা এখন গতিশীল" (ফিন্যান্স কমিশনের ৫ জন সদস্যের রিপোর্ট, ১৯৬৩ ঃ ১১-১২)। অর্থনীতিবিদদের উপদেষ্টা পরিষদও উলেণ্টখ করেন– "কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের নির্বাহী পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানিদের অনুপস্থিতির কারণে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক উদ্যোগ ছিল প্রকৃতঅর্থে সীমিত"। (চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ জন সদস্যের রিপোর্ট, ১৯৭০-৭৫ ঃ ২৭)।

ছক ৬.৭ ঃ কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের মাথাপিছু আয় (রুপি, ১৯৫৯/৬০-এর ধার্য মূল্যে)

	১৯৫১/৫২	১৯৫৫/৫৬	১৯৫৯/৬০	১৯৬১/৬২	১৯৬৪/৬৫	১৯৬৬/৬৭	১৯৬৭/৬৮
পূর্ব পাকিস্তান	৭১৪	৭২৪	৬৮৮	৬৫২	৬৩০	৫৮৫	৬২০
পশ্চিম পাকিস্তান	৯০৩	৯৯০	৯৭১	৮৯১	৯১১	৮৯২	৮৮১

উৎসঃ ছক ৬.৬ এর অনুরুপ।

সুতরাং ছয়দফা দাবি ছিল প্রত্যাশার জনক। এটা আত্মপ্রত্যয়ের চেতনার প্রতিফলক। পূর্ব-পাকিস্তানি নেতারা বুঝতে পারেন যে, কেবল একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় অবকাঠামোয় সংসদীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁরা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। মূলতঃ এটাই ছিল ছয় দফার প্রথম দাবী। দ্বিতীয় দফায় বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু দু'টি বিষয়ে তদারকি করবে– প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক; অন্য সব বিষয় রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে (রহমান, ১৯৬৬)। তৃতীয় দফায় বলা হয় দুই অঞ্চলে, সহজে বিনিময়যোগ্য দু'টি পৃথক মুদ্রা অথবা একটি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ, পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি থাকা দরকার। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, পূর্ব পাকিস্তানের খরচে পশ্চিম পাকিস্তান বেড়ে উঠতে পারবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের হাতে থাকবে। এই কর্মসূচির ৪ নম্বর দাবিতে করারোপের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করা হয়। এখানে বলা হয়, করারোপের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর

থাকবে তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হবে। পাঁচ (৫) নম্বর দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে দুই অংশের দুটি পৃথক হিসাব থাকতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দুই অংশের সমান অথবা নির্দিষ্ট অনুপাতের অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মেটাতে হবে। দুই অঞ্চলের মধ্যে স্বদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। বর্হিবিশ্বের সাথে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণে এবং কোন চুক্তিতে আসার জন্য আঞ্চলিক সরকারকে শক্তিশালী করতে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শেষ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে একটি মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের দাবী করা হয়।

পাকিস্তানে সবসময়ই সশস্ত্র বাহিনীর ব্যয় অত্যাধিক ছিল। ১৯৪৮/৪৯ সালে বাজেট ব্যয়ের শতকরা ৭১.৫ ভাগ সশস্ত্র বাহিনী খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রতি বছর এটা কমতে থাকে তবুও একটি বড় অংশ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হত। ১৯৫৭/৫৮ সালে এই পরিমাণ ছিল বাজেটের ৫৬ ভাগ এবং ১৯৬৮/৬৯ সালে ৪৩ ভাগ (আহমেদ, ১৯৭৯ ঃ ৪৪-৪৫)। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিভাগ সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। এর উপর পূর্ব পাকিস্তানের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে বাঙ্গালীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত; পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল। ভারত আক্রমণ করেনি বলে কেবল পূর্ব-পাকিস্তান নিরাপদ ছিল। এই প্রেক্ষাপট পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর বাঙ্গালি নেতাদের নিয়ন্ত্রণের দাবি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

সুতরাং ১৯৬৬ সালের ছয়দফা কর্মসূচি ১৯৫০ সালের স্বায়ত্তশাসনের দাবি হতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়। ছয়দফায় করারোপের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারকে জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়। এছাড়া বিদেশের সাথে প্রাদেশিক সরকারের পৃথক বাণিজ্য ও বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে পৃথক হিসাব সংরক্ষণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হয। তদসাথে প্রাদেশিক সরকারকে নিজস্ব মিলিটারি বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনেরও পরামর্শ ছয়দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ছয়দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় (Federal) সরকারের পরিবর্তে কনফেডারেশন পদ্ধতির সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত সে সকল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যে

সকল নীতিমালা পাকিস্তানি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ধনকুবে পরিণত করেছিল। কৃষিনীতির ফলে ভূস্বামী ও ধনী-মহাজনেরা দ্র ত ধনী হতে থাকে। নগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকা পশ্চিম পাকিস্তানের নগরবাসী পেশাজীবীদের সুবিধা সৃষ্টি করে। এমন কার্য-নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাঙালি অভিজাত প্রতিপক্ষের উন্মেষ ঘটে, যারা পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদ-ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন।

ছয় দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রবল উৎসাহের সাথে সমর্থিত হয়। পেটিবর্জুয়া শ্রেণী এবং উঠতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কারণ এর অর্থ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই পাওয়া। অধিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হতে পারে আশায় শহরে বেতনভূক্ত কর্মচারীদেরও আকৃষ্ট করে। বাঙ্গালী আমলারা ছয়দফা কর্মসূচিকে প্রবল উৎসাহের সাথে সমর্থন করেন। কারণ এ দাবিকে তাঁরা কেন্দ্রের রাজস্ব ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতার চাবিকাঠি হিসাবে মনে করেন। এতে তাঁরা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবণ দেখতে পায়। সেনা অফিসারগণ এটাকে সমর্থন করেন, কারণ এতে তাঁদের পদোন্নতির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের অবস্থান সংহত হবে। স্পষ্টভাবে না হলেও সাক্ষাতদাতাদের উত্তর থেকে গবেষক এই ধারণায় উপণীত হন। এই অভিজাত গ্র পটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের প্রধান নির্বাচকম লী। এরা রাজনৈতিক ভাবে সম্পর্কিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শ্রমিকগণ এই কর্মসূচী সমর্থন করেন অধিক মজুরির আশায় নয় বরং তাদের কম মজুরির কারণে; এর সাথে আর একটি বিষয় জড়িত ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ফলে শ্রেণীগত আঞ্চলিক এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। গ্রাম্য কৃষককূল একটি পরিবর্তনের আশা করছিলেন এবং ছয়দফা কর্মসূচি ছিল একটি বড় পরিবর্তনের প্রতীক (আহমেদ, ১৯৭৯ ঃ ৪৫-৪৬)।

ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হতে থাকে এবং ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলিতে একটি গনআন্দোলনে রূপ নেয়। এবং অত্যন্ত গতিশীল হয়ে উঠে। হারবার্ট ফিল্ডম্যানের ভাষায়– "যদি ঐ বছর জুলাই মাসে নির্বাচন হত তবে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে এই প্রদেশে ব্যাপক সাফল্য পেত" (ফিল্ডম্যান, ১৯৭২ ঃ ১৮)। অবশেষে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ছয় দফার উপর ভিত্তি করে আওয়ামীলীগ একচেটিয়া বিজয় অর্জন করে এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের পূর্ব পাকিস্থানের জন্য সংরক্ষিত সর্বমোট ১৬২টির মধ্যে ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে।

আওয়ামীলীগের এই বিপুল বিজয় বাঙ্গালী অভিজাতদের ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকিস্তানের ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তাঁরা ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন। কিন্তু বাঙ্গালী নেতাদের হতাশায় ডুবিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানি জেনারেলদের হাত ছিল বলে মনে করা হয়। ১৯৭১ সালে আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করা সত্বেও বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁরা এটাকে একটি ষড়যন্ত্র হিসেবেই নিলেন। এসব জেনারেলরা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা মনে করেন যে, করারোপ ক্ষমতা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকার অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের বিশালাকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাপ্তি। এই ভয়ে তাঁরা ছয় দফা দাবিকে বিভক্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করে আওয়ামীলীগ নেতাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ বিভিন্ন সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের অধস্তন সহকারী হিসাবে থাকার কারণে রাজনৈতিক নেতাদের পূর্বেই তাঁদের ষড়যন্ত্র জানতে পারেন এবং প্রতিহত করার জন্য পাল্টা ব্যবস্থার কথা ভাবেন। তাই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ যখন আলোচনা ব্যর্থ হল এবং পাকিস্তানী জেনারেলরা তাঁদের পাশবিক শক্তির সাহায্যে বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের দমন করতে মরিয়া হয়ে উঠেন তখন বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ বিপণ্ঢবের তাড়না অনুভব করেন। বাঙালী সেনারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। লেলিয়ে দেওয়া এই অত্যাচারী রাজত্বের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে তাঁরা অগ্রসর হন; ২৫ শে মার্চ থেকে যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। যার অবসান ঘটে ।

গবেষক উলেণ্ঢখ করেছেন যে, ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকেই পাকিস্তানী রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বাঙ্গালী নেতাদের বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিছু নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা আরও অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ছয় দফা কর্মসূচী এসব নীতিরই ফসল এবং এইসব নীতি নির্ধারণীর বিরুদ্ধে একটি প্রক্রিয়া। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁরা পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা একটি পক্ষপাতহীন নীতি পেতে পারেন। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধিতাকে আরও ধারালো করার ক্ষেত্রে যথার্থ উপাদান হিসাবে কাজ করে। আওয়ামী লীগ উঠতি মধ্যভিত্ত পরিবারদের প্রতিনিধি হিসাবে এই নির্বাচনকে ছয় দফা

কর্মসূচীর উপর একটি গণভোট হিসাবেও বিবেচনা করে। নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের প্রত্যাশার চেয়েও ভাল হয়। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ টি আসনের মধ্যে ২টি আসন ছাড়া বাকি ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।

জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় বসার লক্ষ্যে নির্বাচনের পর শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈরিতে ব্যস্ত হয়। শেখ মুজিব নিজেও পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তার ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেন। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে কার্যত সংসদীয় গনতন্ত্রের ক্ষমতার রদবদল হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন যা ক্ষমতা হস্তান্তরকে সহজতর করবে। সবকিছু যখন শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং স্বাভাবিক দেখা যাচ্ছিল তখন অধিবেশনে যোগ দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনিচ্ছার কথা উলেণ্ডখ করে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খানের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা ছিল সমালোচনা মূলক। এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে স্বতঃস্ফুর্ত বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন মানুষ; বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষিত সমাজ এবং পেশাজীবীদের কাছে ছয় দফা আন্দোলন এক দফা আন্দোলনে রূপ নেয়। এই এক দফা হল, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তার নিজ দল আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় নেতা হিসাবে ভাষণ দেন; তিনি তাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি। তিনি বলেন "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম" এবং যতদূর সম্ভব কঠোর ভাষায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে যুক্তি দেখান। একইভাবে, আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়, যার সাহায্যে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

পূর্ব পাকিস্তানের পুরো প্রশাসন, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থায় ও সশস্ত্র বাহিনীর সিভিল শাখায় কর্মরত বাঙ্গালী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও শেখ মুজিবর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করেন। ক্ষমতায় শেখ মুজিবের কার্যত জোর অধিকারের মুখোমুখি হয়ে সম্ভবতঃ উদ্ধুত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নেতারাও তাঁর সাথে ছিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম-পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের দীর্ঘ নয় দিন আলোচনা চলে, কিন্তু কোন

সমাধান হল না। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতারা একটি খসড়া ঘোষণা উপস্থাপন করেন, যাতে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্ব শাসনের কথা বিধৃত হয়। ২৫শে মার্চ পর্যন্তও আওয়ামী লীগের নেতারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি না ঘটিয়ে উদ্বোধ সমস্যার সামরিক সমাধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐক্য এবং উপযোগবাদী শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। সরকারের এই দমন নীতি সমস্যাকে শুধু একশ গুণ বাড়িয়ে দেয় নি বরং নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। এই পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে বৈধতা হারায় এবং শাসকদল বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এ সময় বাঙালী নেতারা আর পাকিস্তানের একতা রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন না। শাসক শ্রেণীও বাঙ্গালীদের প্রাধান্য দিয়ে একতা রক্ষায় অনিচ্ছুক ছিল। এমতাবস্থায় বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণ বিদ্যমান ব্যবস্থা ভেঙ্গে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁরা কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন, ৫ম অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

সহায়ক বই সমূহঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, *"দি সিক্স-পয়েন্ট প্রোগ্রাম ঃ ইট্স ক্লাস বেসিস"* দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিস, ভলিউম ৩০, জুলাই ১৯৭৯।

২। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, *বিউরোক্র্যাটিক এলিট ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ ঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮০।

৩। ফেল্ডম্যান, হার্বার্ট, *ফ্রম ক্রাইসিস টু ক্রাইসিস ঃ পাকিস্তান* ১৯৬২-৬৯, লন্ডনঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

৪। গভর্ণমেন্ট অফ ইষ্ট পাকিস্তান, পণ্যানিং ডিপার্টমেন্ট, *ইকোনোমিক ডিসপ্যারিটিস বিটুয়েন ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান*, ঢাকা, ১৯৬১।

৫। গভর্ণমেন্ট অফ ইষ্ট পাকিস্তান, *দি রিপোর্ট অব দি ফাইভ মেম্বার্স অফ দি ফিন্যান্স কমিশন.* ঢাকা ঃ জুলাই ১৮, ১৯৬৩।

৬। গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান, *ইকোনোমিক সার্ভে অব পাকিস্তান*, ইসলামাবাদ ঃ ১৯৭০-৭১।

৭। গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান, পণ্যানিং কমিশন, চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনার উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট, ১৯৭০-৭৫, ইসলামাবাদ ঃ জুলাই ১৯৭০।

৮। গ্রিফিন, কেইথ এন্ড এ আর খান, *গ্রোথ এন্ড ইনইকুয়ালিটি ইন পাকিস্তান*, লন্ডন ঃ ম্যাকমিলান, ১৯৭২।

৯। হক, মাহবুব-উল *দি ষ্ট্রাটেজি অফ ইকোনোমিক পণ্ডানিংঃ এ কেইস স্টাডি অফ পাকিস্তান*, করাচি ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

১০। পাপানেক, জি.এফ.,"*ইন্ডাসট্রিয়াল প্রোডাকশান এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ইন পাকিস্তান*", পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ৪ (অটাম, ৬৪)।

১১। রহমান, মোহাম্মদ আনিসুর, *ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান ঃ অ্যান অ্যানালাইসিস অফ প্রবেণ্ঢমস ইন দি পলিটিক্যাল ইকোনোমি অফ রেজিওয়ানাল পণ্ড্যানিং,"* ক্যামব্রিজ, সিআইএ, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৮।

১২। রহমান, শেখ মুজিবর,*আওয়ার ডিমান্ডস ফর সার্ভাইভাল*, ঢাকা, ১৯৬৬।

১৩। সোবহান, রেহমান,"*দি প্রবেণ্ঢমস অফ রেজিওনাল ইমব্যালান্স ইন দি ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অফ পাকিস্তান*", এশিয়ান সার্ভে, ২ (জুলাই ১৯৬২)।

১৪। ষ্টার্ন, জোসেফ এন্ড ওয়াল্টার পি ফ্যালকন, *গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান*, ক্যামব্রিজ, সিআইএ, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৭০।

অধ্যায়-৭

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অফিসারগণের ভূমিকা

ভূমিকা

বিশেষ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসের সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকরা কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন গবেষক এই অধ্যায়ে সে সকল বিবরণ বিধৃত করার প্রয়াস নিয়েছেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সংকটময় দিনগুলোর বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ ও ব্যক্তিগত ধারণা এ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে গবেষকের নিজের অনুপ্রেরণা স্থান পেয়েছে। আত্মবিবরণমূলক পদ্ধতিতে নিজকে তৃতীয়পক্ষ হিসেবে বিশেণ্ডষণ করে গবেষক সে সময়ের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। আত্মবিবরণমূলক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ গবেষণায় সাধারণভাবে এলিস, ডেনজিন, টেডলক এবং রিড-ডনাহির ব্যবহৃত নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। (এলিস ১৯৯১, ডেনজিন ১৯৮৯, টেডলক ১৯৯১ এবং রিড-ডনাহি ১৯৯৭)।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এটি ছিল একটি সুদীর্ঘ আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায়। যা ৫০ এর দশকের প্রারম্ভে শুরু হয় এবং ১৯৭১ সালের মার্চে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে জাতির মনোযোগ আকর্ষনের মাধ্যমে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং একজন সৈনিক হিসেবে গবেষক, কর্নেল অলি আহমদ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মূল বিষয়ের উপর অনেক অজানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। তাদের অধিকাংশই ছিল নিম্ন পদমর্যাদায়। পদমর্যাদায় ছোট হওয়া সত্বেও এ সকল সেনা অফিসার মুক্তিযুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জাতির ভাগ্যগঠনে সহযোগিতা করেছেন। এদের একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অন্যরা এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের প্রত্যেকে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতায় যুদ্ধকে সমন্বিত করে সম্মিলিতভাবে কাজ করে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য রাজনীতিক শক্তির সাথে সেনাবাহিনী কীভাবে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন- ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের সূচনা করেন এবং প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী তাদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ পরিচালনা করেন (নী এবং বেক ১৯৭৩ ঃ ৩-২৫; কারনো

১৯৮৩ ঃ ৫-১৫)। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরাই সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীই ছিল স্বাধীনতার প্রতীক। বস্তুত তাঁরাই বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান রেখেছিল।

বাঙালি সেনা অফিসারগণ, বিশেষভাবে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অফিসারগণ কেন এবং কীভাবে ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চের কালো রাত্রে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন ইত্যাদি বিষয়ের উপর এ অধ্যায়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেহেতু, গবেষক নিজেই ঘটনাবলীর সাথে জড়িত, তাই তাঁর নিজের এবং অন্যদের ভূমিকা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংকটময় মুহূর্তে তাঁরা যে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা শুধু তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য নয় বরং পুরো বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের সাথে জড়িত ছিল। তাই তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উদ্দীপনা স্বীয় নিরাপত্তার সহজাত প্রবৃত্তি ছড়িয়ে জাতীয় মুক্তির মহৎ উদ্দেশ্যে বিস্তার লাভ করে। তারা এভাবে এটিকে দেখেন। গবেষক তাদের একজন হওয়ায় তিনিও এভাবেই এটি অনুধাবন করেন। এই অধ্যায়ে ঘটনার দ্রুত উদ্‌ঘাটন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়কদের উপলব্ধিও প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ যে, ইতোপূর্বে এ বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোন গবেষণা হয় নি।

ঘটনার সময় চট্টগ্রাম, কুমিলণ্ডা, যশোর, সৈয়দপুর এবং ঢাকা সেনানিবাসে প্রায় ৫০ জন সুদক্ষ বাঙালি অফিসার এবং বিভিন্ন পদবীর প্রায় ৫০০০ বাঙালি সৈনিক ছিল (পরিশিষ্ট -১ দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া ছিল জাতীয় সীমান্ত এলাকা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের (ইপিআর) ১৫ হাজার সৈনিক। ঢাকা থেকে দূরে হলেও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। কীভাবে পাকিস্তানি সমরবিদ্‌রা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ এনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে অবস্থান সুদৃঢ় করতে চান, চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অফিসারগণ তা খুব কাছ থেকে দেখার যথেষ্ট সুযোগ পান। কুমিলণ্ডা সেনানিবাস চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেনা অফিসারদের মধ্যে সহজ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রামের যে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালী সেনা অফিসারগণের সংস্পর্শে আসেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে প্রভাবশালী ছিলেন। চট্টগ্রামে একটি রেডিও স্টেশনও ছিল।

গবেষক, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন এবং ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে ৪র্থ-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বদলি হন এবং

চট্টগ্রামের ষোলশহরে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নব গঠিত ৮ম ব্যাটালিয়নে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পান। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সূচনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে সকল ঘটনা উদ্বুদ্ধ করে, সে সকল ঘটনা সূচারুরূপে পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টারের অফিস।

বিপণ্ঢবী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের পটভূমি

কেউ অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজনীতিক নেতাদের পরিবর্তে কেন সেনাবাহিনীর অফিসারগণই প্রথম গুলি চালায়? তাদের জ্ঞাতার্থে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিব্যক্তি তুলে ধরা প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহতি পর সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একটা সময় পর্যন্ত তাঁরা শাসক গোষ্ঠীর নীতিমালায় সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ সামরিক বাহিনী তাঁদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। অধিকন্তু, পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণিতে মূল প্রোথিত হওয়ায় সেনাবাহিনী অভিজাত শ্রেণির সাথে শ্রেণি-সাদৃশ্য অনুভব করতেন (আহমেদ ১৯৮৮, ৪০-৪১)। ঘোর ভারত বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির সাথে ১৯৪৮ সালের প্রথম কাশ্মির সংঘাত এবং নদীর পানি বণ্টন সমস্যা ও সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ে ভারতের সাথে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ কারণে শুরু থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কট্টর ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত এসব কারণে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। বৈশ্বিক অবকাঠামোর সুবিধা ও কমিউনিজমকে নিয়ন্ত্রনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের, দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের মত একটি বিশ্বস্ত মিত্র প্রয়োজন ছিল।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি (Mutual Defense Assistance Agreemant) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র লাভ করে। এটি শুধু পাকিস্তানের বিদ্যমান শক্তিই বাড়ায় নি, সাথে সাথে দর কষাকষির ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। এটা ধীরে ধীরে পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারের মধ্যেও প্রবেশ করতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যখন পাকিস্তানের প্রকৃত রাজনীতিক ক্ষমতা আমলাদের হাতে চলে যায় তখন পাকিস্তানি জেনারেলরা রাজনীতিক অঙ্গনে প্রকাশ্যে প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ খুজে পায়। প্রেসিডেন্ট গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক জাতীয় সরকারকে বরখাস্তকরণ, জাতীয় পরিষদের বিলুপ্তি, মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নতুন সরকারে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ ইত্যাদি পাকিস্তানের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এই নতুন মন্ত্রী ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। যিনি শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা এবং সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজসে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। তিনি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে একনায়ক সুলভ ক্ষমতা লাভ করে সেনাবাহিনীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

যেসব বাঙালি সেনা অফিসার স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা ঐ সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। সবাই আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। বাঙালি সেনা অফিসারদের উপর বিভিন্নভাবে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। প্রথমত, সশস্ত্র বাহিনীতে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারে তাঁরা সজাগ হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন যে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে যে স্বল্প সংখ্যক অফিসার ও সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয় তাদের সাথেও সমান ব্যবহার করা হয় না। তাঁরা আরও দেখতে পান যে, বেতন-ভাতা, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তানিরা বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে। এ বৈষম্যমূলক নীতির ফলে বাঙালী অফিসাররা পাকিস্তানি শাসকদের উপর অসন্তুষ্টই হয় নি বরং সরব প্রতিবাদীও হয়ে উঠেন। (আহমেদ ১৯৮৮ ঃ ৩৫-৫০)।

১৯৬০ এর দশকে যখন আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব "গতানুগতিক রাজনৈতিক ধারা ছড়িয়ে আমলাতন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়" তখন তাদের অভিযোগ আরও তীব্রতর ও সুসংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন চাপিয়ে দেয়ার পর রাজনীতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে আমলতন্ত্র "রাজনীতক দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য ক্ষেত্র" হিসেবে মোড় নেয় (আহমেদ ১৯৮৮ ঃ ৪১)। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা এবং সামরিক ও বেসামরিক উভয়ক্ষেত্রে বাঙালি রাজনীতিক নেতা তথা বাঙালি আমলার অনুপস্থিতির ফলে বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক আমলারাই ছিল বিদ্যমান একমাত্র বাঙ্গালী গোষ্ঠী, যাঁরা জাতীয় নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে অংশ নিতেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক আমলারাই বাঙালিদের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন, যদিও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের বড় পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমলাদের এ ভূমিকা তাদেরকে আরও রাজনীতি সম্পৃক্ত করে তুলে। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানের ৩৩ জন রাজনীতিক, বেসামরিক ও সামরিক অফিসারকে অভিযুক্ত করা হয়। বাঙালি আমলাদের এতে জড়ানোর কারণ তারা বাঙালিদের স্বার্থের কথা বলতেন (জিরিং, ১৯৭১; আহমেদ, ১৯৮৮ ঃ ৪২)। সংশিণ্টষ্ট সামরিক অফিসারগণের বিবৃতিও প্রমাণ করে যে, তাঁরা রাজনীতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এসব অফিসার অভিযোগ করেন যে, তাঁরা পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে সমান ব্যবহার পান না, বরং তাদের নিকৃষ্ট মনে করা হয়।

অনেক সামরিক ও বেসামরিক অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনীতিক দল আওয়ামী লীগের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। তাঁদের অনেকে আওয়ামী লীগকে অনেক

গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন যা স্বাধিকার আন্দোলন জোরদার করার ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে সাহায্য করে (জাহান, ১৯৭২ ঃ ১৯৮-২০২)। সুতরাং ১ মার্চ হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ পূর্ব পাকিস্তানের পুরো প্রশাসন অচল করে দেয়ার লক্ষ্যে, শেখ মুজিবুর রহমানের গণ অনাস্থা ও অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করার পেছনে আশ্চর্যের কিছু নেই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এ যে, ইয়াহিয়া খান অবিবেচকের মত অরাজনৈতিকভাবে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় আন্দোলনে ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছয় দফা কর্মসূচি একদফা দাবী তথা পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবীতে রূপ নেয় (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শুধু এ প্রেক্ষাপটে বাঙালি সেনা অফিসার এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে, যেখানে কিছু জুনিয়র অফিসার একত্রে কাজ করেন।

ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামে ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই আরও কয়েকজন বাঙালি ও পাঞ্জাবি অফিসার নতুন ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। এদের মধ্যে কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল এ. আর. জানজুয়া, মেজর কেলভি, ক্যাপ্টেন আব্বাস, ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী, ক্যাপ্টেন আক্তার, ক্যাপ্টেন মজিদ, লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন খান, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আযম, ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার), ক্যাপ্টেন সাদেক হোসাইন (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) লেফটেন্যান্ট মাহফুজুর রহমান (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল) লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন (বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব), মেজর মীর শওকত আলী (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এবং বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী) এবং মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি)। লে. কর্নেল জানজুয়া মূলত ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন, যেখানে লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরী ছিলেন কমান্ডিং অফিসার। লে. কর্নেল চৌধুরীও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বদলি হন এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের চিফ ইন্সট্রাক্টর পদে যোগ দেন।

লাহোর সেনানিবাসে গবেষক অলি আহমদের সাথে লে. কর্নেল এম. আর চৌধুরীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে তাঁরা আরও ঘনিষ্ট হয়ে উঠেন। গবেষক কর্নেল চৌধুরীর সাথে দেখা করতেন এবং দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনীর কৌশল কেমন হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। বলাবাহুল্য গোপনে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ফেব্রুয়ারির ১ম ও ২য় সপ্তাহে এ আলোচনা চলতে থাকে এবং তারা দুজনেই উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকেন। কারণ তাদেরকেও নিরস্ত্র ও বন্দী করা হতে পারে। লে. কর্নেল চৌধুরীর অফিস ছিল

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অভ্যন্তরে। কিছু পাঞ্জাবী নিয়ে গঠিত ২০-বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল তার অফিসের সন্নিকটে। পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দারা ওই সময়ে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে এবং বাঙালি সেনা অফিসারদের গতিবিধি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

পাকিস্তানিরা মনে করত বাঙালি এমন একটা জাতি যারা পাকিস্তানিদের ন্যায় লড়াকু নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে গবেষক পাকিস্তানি অফিসারদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে এ ধারণা সুদৃঢ় করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। পাকিস্তানিদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে গবেষকের এমন ধারণা হয় যে, সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্বেও, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনও গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এসব ঘটনা তাঁকে দারুণভাবে পীড়া দিতে থাকে এবং তাঁর মনে বিদ্রোহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে।

অধিকাংশ বাঙালি সেনা অফিসারগেণের ন্যায় গবেষক নিজেও উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সামনে সংকটময় সময় অপেক্ষা করছে। আলোচ্য গবেষণার সাক্ষাৎদাতা মেজর জেনারেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী উলেণ্ডখ করেন, "মার্চের প্রারম্ভে পাকিস্তানিরা সেনা সমাবেশ শুরু করতে থাকে। তাদের সেনা সমাবেশ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা নিষ্ক্রিয় ও দমন করার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।" আর একজন সাক্ষাৎদাতা মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল হালিম এই প্রসঙ্গে বলেন, "অসহযোগ আন্দোলনের সময় (মার্চ মাসে) আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি এবং যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হই। আমি চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলাম।" এ বিষয়ে অপর একজন সাক্ষাতদাতা মেজর জেনারেল সফিউলণ্ডাহ বলেন, ''পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্বয়ে যে পাকিস্তান, আমি বলব ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চের পর পূর্ব-পাকিস্তান আর সে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। যখন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং শেখ মুজিবর রহমানকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালি নেতৃত্বের হাতে শাসনভার তুলে না দেয়ার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করছিল। তাই ভারতের সাথে দ্বন্দ্বের অজুহাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে সেনা সমাবেশ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেনাসদস্য হওয়ার সুবাদে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তারা কি করতে চেয়েছিলেন।"

লে. কর্নেল চৌধুরীর ডাকে সাড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো

ও অন্যান্যদের মধ্যে চলমান রাজনীতিক সংলাপের অনিশ্চয়তার কারণে তাকে উদ্বিগ্ন ও ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। কর্নেল চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ছিল অভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানিরা কখনও আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এরপর তাঁরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। যদি প্রয়োজন হয় এবং বাঙালিরা যদি তাঁদের সহযোগিতা কামনা করেন, তখন তাদের করণীয় কি হবে? তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রয়োজনবোধে রক্তের বিনিময়ে হলেও তারা পূর্ণ সমর্থন দেবেন। একত্রে বসে তাঁরা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা দুজন আরও একটি বিষয়ে একমত হন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বীকৃত নেতা হিসেবে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক নির্দেশনায় যা করা প্রয়োজন, তাঁরা তা করবেন। জনগণ শেখ মুজিবকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন এবং তিনি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের বিশ্বাস ছিল যে তিনি নিজের করণীয় বিষয়ে সম্যক অবগত। কারণ তিনি দীর্ঘ দিন মাওলানা আবুদল হামিদ খান ভাসানী, শের বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর[২] মত প্রবীন রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। কর্নেল চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন অলি আরও সিদ্ধান্ত নেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থানরত সকল সেনা অফিসাদের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপনে সংগ্রহ করা প্রয়োজন (পরিশিষ্ট -১ দেখুন)।

সুতরাং তাঁরা নিয়মিত সাক্ষাত করতে থাকেন। পাঞ্জাবি অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অস্ত্রভা ার হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের সম্ভাব্য পন্থা ও উপায় উদ্ভাবন করেন। সমকালীন গণ আন্দোলনের দাবি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তানি অফিসার এবং সেনাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেন। (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন, সালেক ১৯৯৭; ২৩১-২৩৪)। এভাবে ঐ সময় গুরুত্বপূর্ণ সেনা অফিসারদের মনে বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয়।

এ অধ্যায়ে গবেষক বাংলাদেশের বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যদিও শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বায়ত্ত্ব শাসনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সংকটময় মুহূর্তে জাতিকে দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর দল আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয় বরং পাকিস্তানে

[২] মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রবীন নেতা। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫০-এর দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণের সম্পৃক্তকরণে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০-এর দশকের শেষে এবং ১৯৪০-এর দশকের প্রারম্ভে এ. কে. ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অবশেষে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। তিনিই ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান এসব প্রবীন রাজনীতিকদের তরুণ সহযোগী হিসেবে কাজ করেন এবং মাওলানা ভাষানী ও সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করেন।

নিরঙ্কুষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণির লোক তথা ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবি, বঙালি সিভিল সার্ভেন্ট এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবৃন্দ রাস্তায় নেমে ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। শেখ মুজিবর রহমান এটা জানতেন। তিনি প্রচার করেন যে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ প্রত্যেকে মনে করেছিলেন যে, শেখ মুজিব ঐদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। তদপরিবর্তে তিনি ৭ মার্চ হতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। ওই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনীর মাত্র ১টি ডিভিশন পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল (খান ১৯৯৩ ঃ ৪১)। গবেষক মনে করেন, যদি ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হত, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হত।

বাঙ্গালী সেনা সদস্যরা অনেকাংশে রাজনীতিক নেতাদের সৃষ্ট শুন্যস্থান পূরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রামে বাঙালি সেনা অফিসারদের বিদ্রোহই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের সূচনা ঘটায়। বিভিন্ন স্তরের সাধারণ সৈনিক ও সাধারণ জনগণের মনে কার্যকরভাবে বিদ্রোহের মনোভাব ছড়িয়ে দিতে অত্যন্ত কর্মঠ, দক্ষ ও উৎসাহী এমন একদল বাঙালি অফিসারদের দ্বারা এ বিপণ্ডব পরিচালিত হয়। পরিশেষে আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, শেখ মুজিবর রহমান জাতিকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছেন। কিন্তু বাঙালি অফিসার, সৈনিক ও জনসাধারণের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুহূর্তে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। ক্যাপ্টেন অলি ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের প্রস্তুত এবং সমন্বিত করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫/২৬শে মার্চের রাতে সংকটময় মুহূর্তে বিদ্রোহের প্রধান ভূমিকা পালন করেন। মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পুঞ্জীভূত ঝড়

৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গবেষক কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার অব্যবহিত পর মেজর জিয়াউর রহমান বদলি হয়ে এসে সহ-অধিনায়ক পদে নিযুক্তি পান। ক্যাপ্টেন অলি দেখলেন মেজর জিয়া একজন

সুদর্শন, রণপারদর্শী দক্ষ অফিসার। তিনি বলতেন কম শুনতেন বেশি এবং দ্রুত কাজ করতেন। ইংরেজি ও উর্দূ ভাষায় তাঁর চমৎকার দখল ছিল। তাঁদের অফিস ছিল পাশাপাশি, পরস্পর সংলগ্ন। শুধু ৫ ইঞ্চি একটি পাতলা দেয়াল দিয়ে পৃথক ছিল। তখন ক্যাপ্টেন অলি ও মেজর জিয়া পরস্পর পরিচিত ছিল না। কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে ক্যাপ্টেন অলি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। সকল অফিসার ও কর্মচারীদের নিজ প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতে হত। তাদের খাদ্য, রেশন, পোশাক ও অন্যান্য উপকরণ তাঁর দায়িত্বে ছিল। সংগত কারণে তিনি সবার সাথে প্রায়শ মতবিনিময়ের সুযোগ পান। অফিসার ও সৈনিকদের সাথে গবেষকের সুসম্পর্ক এবং যোগাযোগ, সহ-অধিনায়ক মেজর জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ক্যাপ্টেন অলির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বিশেষভাবে যখন তিনি দেখলেন, তাঁর মত ক্যাপ্টেন অলিও বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেজর জিয়া বেশ কয়েকবার তাঁর অফিসে ক্যাপ্টেন অলিকে ডেকে পাঠান। রাজনৈতিক অঙ্গনে কি ঘটছে সে বিষয়ে তিনি জানতে চাইতেন। তিনি বাঙালি সেনা সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। ক্যাপ্টেন অলি তখনও তাঁর সাথে খোলাখুলি কথা বলার ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। বরং অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতেন। অধিকন্তু পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কাজ করার সময় গবেষকের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ তাকে আরও বেশি সতর্ক থাকার প্রেরণা যোগায়। তবে মেজর জিয়া খোলাখুলিভাবে অলির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদিও, ক্যাপ্টেন অলি খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি দেশের চলমান রাজনীতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের এবং প্রয়োজনবোধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকবে একটি নিবেদিতপ্রাণ দল গঠন করার বিষয়েও সজাগ ছিলেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ এক সন্ধ্যায় মেজর জিয়া গবেষককে (ক্যাপ্টেন অলি) জরুরিভিত্তিতে তার বাসায় ডেকে পাঠান। সেদিন ক্যাপ্টেন অলি কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে মেজর জিয়ার নিকট বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্কে অবগত করান। বাঙালি জাতির স্বার্থ রক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার জন্য মেজর জিয়াকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হল। ক্যাপ্টেন অলি এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন। তাঁরা এরূপ প্রত্যক্ষ অভিযানের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরীর সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি কেবল তিনি প্রকাশ করলেন না। কিছু সময়ের জন্য তিনি এ বিষয়টি গোপন রাখেন এবং মেজর জিয়াকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও বুঝার চেষ্টা করেন। তিনি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। যাতে একটি সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করা যায় এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা যায়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অলি আহমদ মেজর জিয়ার সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁরা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলি নিয়মিত মত বিনিময় ও পরিকল্পনা করতে থাকেন। ২০-তম বেলুচ রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ ও দমন ছিল বেলুচ রেজিমেন্টের অতিরিক্ত দায়িত্ব। ক্যাপ্টেন ইকবাল হোসাইন ছিলেন বেলুচ রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার। একই ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্যাপ্টেন অলি ও ক্যাপ্টেন ইকবাল হোসাইনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তাছাড়া তাঁরা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে একত্রে অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন অলির কোর্সমেট, মার্চের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন ইকবাল হোসাইন আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে অলিকে বলেন যে অধিক সংখ্যক পাঞ্জাবি অফিসার, সৈনিক, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে আসবে।

অনতিবিলম্বে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ লে. কর্নেল চৌধুরী এবং মেজর জিয়ার নিকট পৃথকভাবে এ খবর পৌঁছে দেন। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর সশস্ত্র হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে। ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়ান সেনানিবাসে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

যেহেতু ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়ান সেনানিবাসে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তাই তাঁদের জন্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয় নি। এই রেজিমেন্টে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে মাত্র ১২টি এল.এম.জি (হালকা মেশিনগান) এবং ৩০০ থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছিল। অস্ত্রগুলোও ভাল ছিল না। তাছাড়া পুরো রেজিমেন্টের জন্য মাত্র ৫টি গাড়ি ছিল।

মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে একাধিক বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কিছু পাঞ্জাবি সৈন্য এবং ২০-বেলুচ রেজিমেন্ট, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় কয়েকজন বাঙালিকে হত্যা করে। জিয়া ও অলি উভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সমস্ত সেনানিবাস ও আশপাশের এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিকেলে ক্যাপ্টেন অলি বান্দরবান জেলা হতে ফেরার পর হাবিলদার আবদুল আজিজ অফিসার্স মেসে অলি আহমদের কক্ষে প্রবেশ করেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি ক্যাপ্টেন অলি আহমদের নিকট বাঙালি হত্যার খবর দিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। ক্যাপ্টেন অলি তাকে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার সঠিক সময় তাঁকে জানানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ১৯৭১ সালের ১ এবং ২ মার্চ অলি আহমদ তড়িগড়ি তাঁর ডায়রিতে নিচের কথাগুলো লিখেছিলেন-

"জিয়াউর রহমানের সাথে বাঙালির ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের আচরণ নিয়ে আলোচনা হল (১/৩/১৯৭১)।"

" বিকাল ৩ ঘটিকায় পশ্চিম পাকিস্তানি সকল অফিসার চট্টগ্রাম সেনানিবাস পাবলিক স্কুলে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা উপযুক্ত সময়ে বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেন। যে কোনভাবে হোক আমরা এই সংবাদ পাই। তারা পাকিস্তান থেকে নতুন নতুন সৈন্যদল আনছে। আমি এবং মেজর জিয়াউর রহমান এ বিষয়ে দীর্ঘ বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেই যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহ করব (২/৩/১৯৭১)।"

লে. কর্নেল চৌধুরীর সাথে গোপনে যোগাযোগ করা ক্যাপ্টেন অলির প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। তাঁর অনুপ্রেরণাই অলিকে এমন দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। অলি অন্যান্য বাঙালি সহকর্মী অফিসারদের সমর্থন আদায় ও কর্মকা সমন্বয় করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের ৪ তারিখ অলি তাঁর ডায়রিতে লেখেন– *"মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরীকে অবগত করনোর এবং এ বিষয়ে তাদের অনুভূতি জানার জন্য নির্দেশ দেন। আমি দেখলাম তাঁরাও অভিন্ন মত পোষণ করছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে আপাতত মুখ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় জ্ঞাত করা হবে মর্মে জানাই।"* ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ ক্যাপ্টেন অলি লে. কর্নেল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করেন। ইতোমধ্যে মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন অলিকে রেজিমেন্টের বাঙালি জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও), নন-কমিশন্ড অফিসার (এনসিও) এবং সৈনিকদের সাথে মত বিনিময়ের পরামর্শ দেন। ক্যাপ্টেন অলি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত জুনিয়র কমিশন অফিসার নায়েব সুবেদার আবদুল হামিদকে (পরবর্তীতে সুবেদার মেজর) এ দায়িত্ব প্রদান করেন। হামিদ তাঁকে জানান যে, বাঙালি সৈনিকরা পাকিস্তানিদের আচরণে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তারা শেখ মুজিবের ডাকে অথবা গবেষকের নির্দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে সদা প্রস্তুত।

অফিসার্স মেস পরিদর্শন ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল জানজুয়ার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে তাঁর এই পরিদর্শন ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। জানজুয়া সম্পর্কে বাঙালি অফিসারগণ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। বাঙালি অফিসারদের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্যাহ্যত তিনি প্রায়শ মেসে এসে অফিসারদের সঙ্গে খোশগল্প করতেন। একদিন তিনি ক্যাপ্টেন অলির নিকট তার মনোভাব ব্যক্ত করে বললেন, "তোমরা সবাই হিন্দু

হয়ে গেছ এবং আমরা তোমাদের আবার সঠিক পথে নিয়ে আসব।" ক্যাপ্টেন অলি ভালভাবেই জানতেন ''সঠিক পথ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন।"

গবেষক পাঞ্জাবি অফিসারদের গতিবিধি ও কর্মকান্ডের উপর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চের পর বিগ্রেডিয়ার মজুমদার, লে. কর্নেল চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীকে (বর্তমান মেজর জেনারেল) চট্টগ্রাম শহরের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তাঁরা চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ ও চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে অবস্থান নেন। ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী শহের নিয়োজিত ২০-তম বেলুচ রেজিমেন্টের পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা স্থানীয় বাঙালিদের প্রতি লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বাঙালিদের সাহায্য করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবাঙালি এলাকায় যান। তিনি তাদেরকে আরও খারাপ অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।

এ ফাঁকে মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলি পাকিস্তানিদের এ ষড়যন্ত্রের কথা চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বরীয়ান নেতা মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে তাঁরা আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সাথে যোগাযোগ করেন। তারা জানতে পারেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। হয়ত তার অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল কিন্তু তিনি বিদ্রোহ বা বিপণ্ঢবের কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্যে দেশের মানুষকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারে নি। জনগণ আশা করেছিলেন শেখ মুজিব দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। ফখরুদ্দিন আহমেদ তাঁর "ক্রিটিকল টাইমস" গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করেন-

"১৯৭১ সালের মার্চের শুরুর দিকে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক স্থগিত করেন। ঢাকা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অনেক বিদেশি পর্যবেক্ষক শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, শেখ মুজিব ঐদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। আমার মনে আছে, বিবিসি-র এক ভাষ্যকার এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ঘোষণা দেওয়া হত তবে দুর্ভোগ অনেক কম হত। এখন যে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখনও আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা শুধু ধাপ্পাবাজি করছিল। তখনও জনবল ও শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছিল। অধিকন্তু, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলে তা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সেনা অফিসারদের সদা সজাগ থাকার বিষয়ে আরও সতর্ক করে তুলত। তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সহজে সেনানিবাস থেকে

বের হতে পারত না। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ২৫ এবং ২৬ শে মার্চ রাতে জীবন বির্সজন না দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিতে পারতেন। (আহমদ, ১৯৯৪ ঃ ৫৭)।"

রাজনীতিক নেতৃত্বের এমন দোদুল্যমান ভূমিকা বাঙালি সেনা সদস্যদের অধৈর্য ও বিক্ষুব্ধ করে তুলে। কারণ শেখ মুজিবের বক্তব্যে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে নি। "স্প্রিং ১৯৭১" গ্রন্থে ফারুখ আজিজ খান অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন–"অধিকাংশ বাঙালির মতে এতে একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়। সিংহভাগ জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য শেখ মুজিব যদি ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করতেন, তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্নরকম হতে পারত। সংগতকারণে ইয়াহিয়া খান তাঁর দোসর, ষড়যন্ত্রকারী জুলফিকার আলী ভুট্টোর অতিথি হিসাবে লারকানায় হাঁস শিকার করার প্রাক্কালে সেনাবাহিনী প্রস্তুত, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার অধিক সময় পান(খান , ১৯৯৩ ঃ ৪০)।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য গবেষণার অপর একজন সাক্ষাতদাতা কর্নেল শাফাত জামিলের মন্তব্যও সমভাবে কৌতূহলপূর্ণ। তিনি বলেন "৭ মার্চের আগে তৎকালীন পূর্ব-পকিস্তানে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। মাত্র ১টি পদাতিক ডিভিশন ছিল। এতে আমাদের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৫টি ব্যাটালিয়ন ছিল। আমরা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলাম। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশ বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা অধিক ছিল। যদি ৭ই মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হত, তবে আমরা অনেক কম রক্তপাতে সাফল্য অর্জন করতে সামর্থ হতাম। আলোচনার অজুহাতে পাকিস্তন শাসকগোষ্ঠী ৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত ১৭ দিন প্রস্তুতির সুযোগ পায়। এই ১৭ দিনে তারা নতুন ১০-১২ ব্যাটালিয়ন পদাতিক সেনা নিয়ে আসে। এভাবে তারা বাঙালিদের সামরিক শক্তি ৩ ঃ ১ অনুপাতে ছাড়িয়ে যায়।"

৮ মার্চ ক্যাপ্টেন অলি আনুমানিক ৫.৩০ ঘটিকায় লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরীর নিকট সম্ভাব্য কর্মপন্থা বর্ণনা করার সময় লে. কর্নেল এম.আর. চৌধুরীর টেলিফোন পান। লে. কর্নেল চৌধুরী লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরীর মাধ্যমে ক্যাপ্টেন অলিকে কিছু নির্দেশনা দিতে চেয়েছিলেন। লেফটেন্যান্ট মুবিন এবং লে. কর্নেল চৌধুরী সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় আলাপ করেন যাতে অন্যরা বুঝতে না পারেন। পরে মুবিন ক্যাপ্টেন অলিকে অনুবাদ করে জানান, "তিনি (এম.আর. চৌধুরী) চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশের রুমে অলিকে রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী তার জন্য সন্ধ্যায় অপেক্ষা করবেন। আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।" ক্যাপ্টেন অলি পুনরায় লে. কর্নেল চৌধুরীকে ফোন করেন এবং মেজর জিয়াকে তার সাথে নেয়ার অনুমতি চান। লে.

কর্নেল চৌধুরী মুহূর্তের জন্য বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু ক্যাপ্টেন অলি ব্যাখ্যা দেওয়ার পর তার সাথে একমত হন।

সে অনুসারে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি সন্ধ্যা সাতটায় চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামের পশ্চিম গেটে উপস্থিত হন। গেইটে হাবিলদার জান-ই-আলম তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদের কক্ষে নিয়ে যান। তাদের দেখে হাবিলদার জান-ই-আলমকে উৎফুলণ্ড মনে হল। ক্যাপ্টেন আমিন উদ্বিগ্নভাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি জানালেন যে লে. কর্নেল চৌধুরী চিটাগাং সার্কিট হাউজে বিগ্রেডিয়ার মজুমদারের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন। ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেন অলি দ্রুত তাঁর ব্যাটালিয়নের হালনাগাদ পরিস্থিতি জানার জন্য ফিরে যান। কারণ লে. কর্নেল জানজুয়া তাদের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাছাড়া শহরে তাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং দীর্ঘ সময় উভয়ের একসাথে বাহিরে থাকা তাদের (অলি এবং জিয়া) জন্য নিরাপদ ছিল না। অলি ব্যাটালিয়নে ফিরে যান, জিয়া ক্যাপ্টেন আমিনের কক্ষে অপেক্ষায় থাকেন। অলি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে আলোচনায় অংশ নেন। ১৯৭১ সালের ৮ মার্চের মিটিং সম্বন্ধে অলি তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, "লে. কর্নেল এম.আর চৌধুরী, মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরীর সাথে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম ভবনে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানি অফিসারদের আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ আলোচনার আয়োজন করেন লে. কর্নেল এম. আর চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই যে, রাষ্ট্রপতি যদি বাঙালিদের দাবি মেনে না নেন, তবে আমরা বিদ্রোহ করব।"

উক্ত সভায় এম.আর. সিদ্দিকী এবং কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে প্রস্তাবিত বিদ্রোহ সম্পর্কে অবহিত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। তারা উভয়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ট। লে. কর্নেল এম.আর. চৌধুরী, মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি নিয়মিত বৈঠক করতেন। তাঁরা প্রতিদিনের পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে আলাপ করতেন।

১৯৭১ সালের ১১ মার্চ অপরাহ্নে ২০-বেলুচ রেজিমেন্টের ৩ জন অফিসার ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসে আসেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়া তাঁদের সাথে যোগ দেন। তাদেরকে খুব ব্যস্ত মনে হল, চালচলনও ছিল সন্দেহজনক। চারজনই মেস থেকে বের হয়ে মেজর জিয়া ও লেফটেন্যান্ট মাহফুজের বাসার দিকে অগ্রসর হন। তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গবেষক দ্রুত মেসের ছাদে চলে যান। তিনি সেখান থেকে মেজর জিয়ার বাসা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁরা মেজর জিয়ার বাসার সম্মূখে

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে মেসের দিকে ফিরে আসলেন। একটু পরে তাঁরা মেস ত্যাগ করেন। গবেষক ভাবলেন, জিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এবং লে. কর্নেল জানজুয়া ঐ তিন অফিসারকে মেজর জিয়ার বাসার অবস্থান জানানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে অলি মেজর জিয়াকে এ ঘটনা অবহিত করে অস্ত্র সজ্জিত থাকার পরামর্শ দেন। এরপর হতে জিয়া তাঁর বাসায় অস্ত্র রাখতে শুরু করেন। জিয়া এবং অলি সুনির্দষ্ট খবর পান যে, পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা গোপনে নিয়মিত মিটিং করেন। তারা বাঙালি অফিসারদের উপর তাঁদের সতর্কতা আরও নিবিড় করে তুলে।

১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ক্যাপ্টেন অলির রুমে আসেন। তিনি তাঁকে হালিশহরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, চট্টগ্রাম সেক্টরের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের (পরে অবঃ মেজর) বাসায় যেতে বলেন। ক্যাপ্টেন অলি লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরীকে সাথে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। সে অনুসারে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি এবং লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরী সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের বাসায় উপস্থিত হন।

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম উৎকণ্ঠার সহিত বাসার সম্মূখে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তাকে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর সহকর্মীদের জানালেন, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের সাথে যোগ দেবেন। ক্যাপ্টেন অলি শহরের বাহিরে যে কোন স্থানে মিটিং করার প্রস্তাব দিলে ক্যাপ্টেন রফিক তাৎক্ষণিকভাবে তা সমর্থন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শামসুল আলমের বাসায় বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ এর ক্যাপ্টেন হারুন (মেজর জেনারেল হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত), চট্টগ্রামের জনৈক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ জাফর এবং আতাউর রহমান খান কায়সার এম. এন. এ তাঁদের সাথে মিলিত হন। তাঁরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হন।

বৈঠকে বেশ নিবিড় আলোচনা হয়। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও ডাঃ জাফর পাকিস্তারিরা যদি তাঁদের আক্রমন করে, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের করণীয় কি হবে তা জানতে চান। এ প্রশ্নে তাঁদের আলোচনায় ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্যমান সুযোগ/সুবিধা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের পরিমাণ নির্ণয় প্রাধান্য পায়। ক্যাপ্টেন অলি অপারেশন কৌশল নিয়ে এত খোলামেলা আলোচনার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে পরে বৈঠক করার প্রস্তাব দেন।

১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ ক্যাপ্টেন অলি তার ডায়েরিতে লিখেছেন, "বাঙালি অফিসারদের নিরস্ত্র করা এবং প্রতিরোধ করলে তাদের হত্যা করার বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের পরিকল্পনা নিয়ে ই.পি.আর-এর ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলোচনা হল। ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামন, ই.পি.আর ১৭-উইং এর ক্যাপ্টেন হারুন, লে. শমশের মুবিন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান কায়সার, এম.এন. এ এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ জাফর প্রমূখের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।"

ক্যাপ্টেন অলি একটি নির্দিষ্ট স্থানে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে দেখা করার জন্য মেজর জিয়াকে অনুরোধ করেন। এ সময় ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়ার সাথে যান নি। এ সময় অফিসার মেস্ থেকে যাওয়াটা একপ্রকার বোকামী হত। কারণ যে কোন সময় কোয়ার্টার মাস্টারের প্রয়োজন হতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ফিরে এসে ক্যাপ্টেন অলিকে আলোচনার বিষয়বস্তু অবহিত করেন। গৃহীত পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কৌশল চূড়ান্ত করার জন্য ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়াকে লে. কর্নেল এম.আর চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে পুনরায় বৈঠক করার পরামর্শ দেন। তাঁরা চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হালনাগাদ কর্মকা সম্পর্কে এম.আর সিদ্দিকীর মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমানকে জানানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ২০ শে মার্চ লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী, মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন রফিক রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (পরিকল্পনা) সফি আহমেদের বাসভবনে মিলিত হন। সেখানে তারা নিম্ন বর্ণিত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করেন- "লে. কর্নেল এমআর. চৌধুরী ই, বি, আর, সি, দল নিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাস পুরোটাই দখল করে নেবেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের সন্নিকটে অবস্থানরত ২০- বেলুচ রেজিমেন্ট আক্রমণ করবেন।" ২০- বেলুচ রেজিমেন্টের অবস্থানের উপর ৩-ইঞ্চি মর্টার ফায়ারিং এর বিষয়ে কাজ করার জন্য সুবেদার হেলালকে (ই.বি.আর.সি) দায়িত্ব দেয়া হয়। (এ অস্ত্রটি লক্ষ্যবস্তু না দেখে অনেক দূর থেকে গুলি চালাতে সক্ষম এবং এটি একটি উচ্চ গোলাগুলি ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র)। ক্যাপ্টেন রফিক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ই, পি, আর, দল নিয়ে নৌবাহিনী ঘাটি এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দখল করবেন। মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে কোন জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এখানে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এম আর সিদ্দিকীকে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হবে। পরবর্তীকালে যদি কোন পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়, তাও নিয়মিত জানানো হবে। ক্যাপ্টেন অলি এ পরিকল্পনার কথা লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে অবহিত করেন, যাতে তাঁরা পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারেন। ক্যাপ্টেন অলি তাঁর অনুগত সেনাদলকে পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রাখার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত নায়েব সুবেদার আবদুল হামিদকে নির্দেশ দেন।

১৯৭১ সালের ২১ শে মার্চ সকাল আটটায় সকল অফিসারদেরকে সামরিক পোশাকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। সকাল নয়টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং মেজর জেনারেল খোদাদাদ খান, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এবং শীর্ষ স্থানীয় অন্যান্য অফিসারগণ ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করবেন। তাঁরা যথাসময়ে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন। তাঁদের সাথে চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার এম. আর. মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন। মেজর জিয়া ব্যাতীত ব্যাটালিয়ানের অন্য সকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেনাকাটার জন্য চট্টগ্রাম শহরে যান, ঐদিন ছিল ছুটির দিন।

জেনারেল হামিদের আচরণ দেখে মনে হল যেন সব কিছু স্বাভাবিক। তিনি বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই উলেণ্ঢখ করলেন না। ক্যাপ্টেন অলি জেনারেল হামিদের পরিদর্শন নিয়ে সংশয়াভিষ্ট হন। তাঁর মনে হল, জেনারেল হামিদ বাঙালি অফিসারদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি অফিসারদের গৃহীত চূড়ান্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন। ইতোপূর্বে কখনও রবিবার ছুটির দিন এতজন শীর্ষস্থানীয় অফিসারকে জরুরি অবস্থা ছাড়া কোন ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতা অলি স্মরণ করতে পারছিলেন না। জেনারেল হামিদ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম সেনানিবাসের উদ্দ্যেশ্যে ব্যাটালিয়ন ত্যাগ করেন। মেজর জিয়া সকাল ১১.৩০ মিনিটে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হন। ক্যাপ্টেন অলি যে কোন সময় পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য আক্রমণ বা বাঙালীদের নিরস্ত্র করার ব্যাপারে তাঁর সন্দেহের কথাসহ সবকিছু মেজর জিয়ার কাছে ব্যক্ত করেন। মেজর জিয়া, জেনারেল হামিদের অসময় পরিদর্শনের নিহিতার্থ আলোচনার জন্য লে. কর্নেল এম.আর. চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নেন। বিগ্রেডিয়ার মজুমদার চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার -এর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছাড়াও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের (EBRC) কমান্ডেন্ট ছিলেন এবং লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরী ছিলেন তাঁর অধীনস্থ চিফ ইন্সট্রাক্টর। উভয়ে একই এলাকার এবং একে অপরের সাথে ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ হইতে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন। বিগ্রেডিয়ার মজুমদার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। সকল বাঙালি অফিসার তাদের সাথে যোগ দেবে এমন নিশ্চয়তাও তিনি প্রদান করেন। কিন্তু পাঞ্জাবি অফিসারেরা তার উপর কড়া নজর রাখায় তিনি সরাসরি নেতৃত্ব প্রদান হতে দূরে থাকা শ্রেয় মনে করেন। মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি উভয়ে কর্নেল চৌধুরীকে বিগ্রেডিয়ার মজুমদারের মাধ্যমে কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। কর্নেল ওসমানী বাঙালিদের মধ্যে

সবচেয়ে সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, যিনি শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। ওসমানীকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করা হয়। তাঁকে কুমিলণ্ঢায় ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যশোরে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, জয়দেবপুরে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সৈয়দপুরে ৩য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কর্নেল ওসমানী দায়িত্ব পালনে সম্মত হন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও শেখ মুজিবের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইতোমধ্যে তাঁরা আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক নেতাদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করেন, যাতে ঢাকার শেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তান শেখ মুজিবের নেপথ্য নিয়ন্ত্রণে ছিল, ইয়াহিয়া সরকার ফলপ্রসু নিয়ন্ত্রণ হারায়ে ফেলে। কর্নেল ওসমানী জানান যে শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় পর্যালোচনার জন্য ইয়াহিয়া খানের সাথে ঢাকায় একাধিক বৈঠক করতে চান।

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রারম্ভ হতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২০-বেলুচ রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন ইয়াকুব ক্যাপ্টেন অলি আহমদের সাথে তাদের কার্যক্রম এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী স্থানান্তর সম্পর্কে টেলিফোনে আলাপ করে আসছিলেন। অধিকন্তু, ক্যাপ্টেন অলি তার ব্যাটালিয়নের প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ইয়াকুবের সাথে একাধিকবার নৈমিত্তিক সাক্ষাত করেন। আলোচনার সময় ক্যাপ্টেন ইয়াকুব জানান যে, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং হিন্দুদের দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নতুন ব্যাটলিয়ন এফএফ, পাঞ্জাব, বেলুচ ও অন্যান্য সেনাদল নিয়ে আসা হচ্ছে। এ নতুন সেনাদল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ দেয়ার কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এবং জেনারেলরা মনে করতেন, হিন্দুরা পাকিস্তান বিভক্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত। নিয়মিতভাবে ক্যাপ্টেন অলি এসব বিষয় কর্নেল চৌধুরী এবং মেজর জিয়াকে অবহিত করেন।

১৯৭১ সালের ২২ মার্চ ক্যাপ্টেন অলি তাঁদের প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার জন্য চট্টগ্রাম সেনা নিবাসে কর্নেল চৌধুরীর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। চৌধুরী জ্বরে ভুগছিলেন। ক্যাপ্টেন অলি ভাবতেই পারেন নি যে এটাই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ২০-বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা চৌধুরীকে বন্দি করে এবং কর্নেল ফাতেমির নির্দেশে তাকে নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ সকালে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে জনগণ শতশত ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। প্রত্যেক দালানে দালানে বাংলাদেশের নতুন পতাকাও উড়তে

দেখা যায়। পায়ে হেঁটে অথবা টেলিফোন ছাড়া একে অন্যের সাথে যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না। চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে শহরে অবস্থানরত ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসের দূরত্ব ছিল প্রায় ৪ মাইল। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলির অনুরোধে চট্টগ্রামের প্রবীন রাজনীতিবিদ জহুর আহমেদ চৌধুরী ও এমআর সিদ্দিকী চট্টগ্রামে অবস্থানরত ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রস্তুতির বিষয়ে শেখ মুজিবকে অবহিত করার জন্য গাড়ি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলি বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় সর্ম্পকে শেখ মুজিবের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রত্যাশা করছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন তিনি যেন বিলম্ব না করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরা যে কোন সময় পাকিস্তানী বাহিনীর চূড়ান্ত আঘাতের শঙ্কায় ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং এমআর সিদ্দিকী ফেরার পথে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩১ মাইল দূরে নিজামপুর কলেজের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। পরদিন সকালে এমআর. সিদ্দিকী জানান, এই পর্যায়ে শেখ মুজিব কোন নির্দেশনা দেন নি।

তিনি শুধু নির্দেশ দেন যাতে "সোয়াত" জাহাজ থেকে গোলাবারুদ খালাস করতে না দেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর অস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ নিয়ে "সোয়াত" নামক জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা হয়েছিল। রাজনীতিক নির্দেশের বিলম্বের কারণে অলি ও জিয়া হতাশ হয়ে পড়েন। শেখ মুজিব আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁরা জানতেন, পাকিস্তানিরা সুযোগ বুঝে যে কোন মুহূর্তে আঘাত হানতে পারে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী ক্যাপ্টেন অলিকে টেলিফোনে জানান যে, তাকে এবং বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ বুঝতে পারেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপর সন্দিহান এবং উভয়কে ঢাকায় গৃহবন্দী করা হতে পারে অথবা বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের আদর্শিক-মনোভাব জানার জন্য তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে। যা হোক, আমিন আহমেদ ক্যাপ্টেন অলিকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, কর্নেল এমআর চৌধুরী চট্টগ্রামে থাকবেন এবং তাঁর অধীনে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকরা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন অলি ক্যাপ্টেন আমিনকে ঢাকায় পৌঁছে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখার এবং সেখানকার অবস্থা জানানোর অনুরোধ করেন। ক্যাপ্টেন আমিন যদি রাত ১০.০০ টার মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে তিনি ধরে নেবেন যে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একই দিন সন্ধ্যা ৮.০০ ঘটিকায় আমিন আহমেদ ডিউটি ক্লার্কের মাধ্যমে অলি আহমদকে জানান যে, তাঁরা ভাল আছেন এবং ধানমন্ডিতে বিগ্রেডিয়ার মজুমদারের এক বন্ধুর বাসায় রয়েছেন। তখন পর্যন্ত তাঁরা কোন বিপদ আঁচ করতে পারেন নি কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করার আদেশ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন অলি সব

ঘটনা জিয়াকে অবহিত করেন। তারা সারাক্ষণ দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। জিয়া ও অলি নিশ্চিত যে, সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সংগঠিত করার দায়ে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ অনুমান সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লে. কর্নেল জানজুয়া ক্যাপ্টেন অলিকে সংবাদ দেন যে, ২০-তম বেলুচ রেজিমেন্ট থেকে ধার হিসাবে আনা ১০৬-রিকয়েললেস রাইফেলটি অলিকে তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগতভাবে ফেরত দিতে হবে। এ নির্দেশ তাঁকে সন্দিহান করে তোলে। ঐ সময় তাঁর অবস্থান থেকে ক্যান্টনমেন্ট যাওয়া মোটেও নিরাপদ নয়। তাঁর শঙ্কা পাঞ্জাবি সেনারা অন্ধকারে অতর্কিতে তাকে হত্যা করতে পারে। তিনি বিছানা থেকে উঠে ইউনিফরম পরলেন তবে সাথে গুলি ভর্তি পিস্তল নিতে ভুললেন না। অতঃপর শান্তভাবে মেসের নিচ তলায় আসলেন। লে. কর্নেল এ আর জানজুয়া ও মেজর মীর শওকত আলীকে ড্রইং রুমে বসে গল্প করতে দেখলেন। লে কর্নেল জানজুয়া তাৎক্ষণিকভাবে রাইফেলটি ফেরত দিতে যাবার জন্য অলিকে নির্দেশ দেন। অলি এ সামান্য কাজের জন্য অফিসার অনাবশ্যক উলেণ্টখ করে একজন এনসিও-কে এই কাজে নিয়োগ করার কিংবা যদি জানজুয়া একজন অফিসারের যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেই থাকেন, তবে ওই দিনের ডিউটি অফিসার পাঞ্জাবি অফিসার লে. আজমকে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। লে. কর্নেল জানজুয়া জোর দিয়ে বললেন যে. অলিকেই সশরীরে যেতে হবে। ক্যাপ্টেন অলির সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। রাজনীতিক অস্থিরতার মধ্যে রাত্রিবেলা তিনি সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কর্নেল বিরক্ত হয়ে তাঁকে রুমে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এ সংবাদ সৈনিকদের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। অলি অবগত হন যে, কর্নেল যদি অলিকে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে রাইফেল জমা দেয়ার জন্য চাপ দেন, তাহলে কয়েকজন সৈনিক কর্নেলকে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। অলি দ্রুত সৈনিক লাইনের দিকে রওয়ানা দেন। তিনি ভাবলেন অসময়ে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে পুরো পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে এবং তাদের জীবনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের প্রবেশ পথে পৌঁছে তিনি হাবিলদার আবদুল কাদেরকে দেখতে পান। তিনি ৪র্থ-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁর সাথে ছিলেন। হাবিলদার তাঁকে সর্বস্তরের সৈনিকদের মধ্যে টানটান উত্তেজনার কথা জানান। অতঃপর অলি গুলি ভর্তি রাইফেল নিয়ে কয়েকজন সৈনিক প্রস্তুত হয়ে আছেন মর্মে দেখতে পান। অলি কোন রকমে তাদেরকে শান্ত করলেন। তিনি তাদের যথাসময়ে বিদ্রোহের নির্দেশ দেয়া হবে মর্মে আশ্বস্ত করেন। এ সংকটময় মুহূর্তে সৈনিকদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অবাঙালি জেসিও জনৈক সুবেদার মেজর টিএম আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি অধিনায়ক ও সৈনিকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ক্যাপ্টেন অলি ব্যাটালিয়ন লাইনে তাকে দেখে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন অলি

আহমদকেএ বিশেষ ঘটনার ব্যাপারে অধিনায়ককে কি বলবেন তদ্বিষয়ে পরামর্শ কামনা করেন। অলি তাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন কর্নেল সাহেবকে বলেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোলাহল শুনে সৈনিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন অলি কৌশলে অবস্থা সামাল নিয়েছেন। সুবেদার মেজর আলী এভাবে অধিনায়ককে অবহিত করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তিনি এ গোপনীয়তা কারও কাছে কখনও প্রকাশ করেন নি।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি অফিসার ও সৈনিকদের চলাফেরা বন্ধ করার লক্ষ্যে বেসামরিক জনগণ তাদের অবস্থান (৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) হতে চট্টগ্রাম সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তায় যে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল, সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়োগ করা হয়। কর্নেল নিজেই এই কাজ তদারক করেন। মেজর কামাল (পাঞ্জাবি) এবং ক্যাপ্টেন আজিজ (বাঙালি) ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের সাহায্যে অপর প্রান্ত হতে রাস্তার উপর দেয়া ব্যারিকেড সরানোর কাজ শুরু করেন। ক্যাপ্টেন অলিই একমাত্র অফিসার যিনি এ ধরনের কোন কাজে সরাসরি নিয়োজিত হন নি। তিনি অফিসে বসে এসব নিয়ে ভাবছিলেন। বিগত ২৪ ঘন্টার ঘটনাপ্রবাহে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ রাতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। সকাল অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় তিনি দেখলেন যে, লে. কর্নেল জানজুয়া, মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী, ক্যাপ্টেন সাদেক, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও লেফটেন্যান্ট আজমের সাথে সৈনিকদের নিয়ে ব্যাটালিয়নে ফিরছেন। কর্নেল জানজুয়া অলি আহমদকে পরিকল্পনা পরিবর্তনের কথা জানান। তিনি জানান যে, কিছু অফিসার ও সৈনিকদের সাহায্যে মেজর জিয়াকে রাস্তার ব্যারিকেড সরানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিপরীত দিক হতে মেজর কামাল ও অন্যরা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সকলে দুপুর এবং রাতের খাবার কর্মস্থলে গ্রহণ করবেন। যথারীতি দুপুর দুইটার পর তারা সকলে অফিসার্স মেসের উদ্দ্যেশে রওয়ানা হন এবং কর্নেল তার বাসভবনের দিকে চলে যান। ইতোমধ্যে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন সাদেককে নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন অলি আনুমানিক ৪টায় সংবাদ পান যে, কর্নেল তাকে ওই দিনের ডিউটি অফিসার হবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং লেফটেনেন্ট আজম (পাঞ্জাবি) তার সহকারী ডিউটি অফিসার হবেন। বস্তুত সেনাবাহিনীতে কোন সহকারী ডিউটি অফিসারের প্রচলন নেই। অলি বুঝতে পারলেন যে লে. আযমকে তার উপর নজরদারী করার জন্য রাখা হয়েছে।

সে অনুসারে ক্যাপ্টেন অলি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হন। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দেখেন ডিউটি অফিসারের রুমে লেফটেনেন্ট আযম বসে আছেন। তাকে অতিসতর্ক মনে হল। তিনি অলির

উপস্থিতিতে সব টেলিফোন কল শোনার চেষ্টা করেন যা সেনাবাহিনীর সাধারণ রীতি বহির্ভূত। তাঁর আচরণ অলির সন্দেহকে আরও নিশ্চিত করে তোলে এবং তিনি দ্রুত বিপদ্জনক ঘটানোর তাগিদ অনুভব করেন। অলি তাঁর বিশ্বস্ত নায়েব সুবেদার আবদুল হামিদকে সতর্ক করে এক পল্টুন সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে বিল্ডিং এর ছাদে অবস্থান নেয়ার এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। লেফটেনেন্ট আযমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য কক্ষের অদূরে অলি চারজন সশস্ত্র গার্ড রাখলেন। ব্যাটালিয়নে মাত্র দশ-বারোজন অবাঙালি অফিসার ও সৈনিক ছিল। ২০-তম বেলুচ রেজিমেন্ট ও বিমান আক্রমণ ছিল, তাদের উদ্বেগের মূল কারণ। বিকেল চারটা ত্রিশ মিনিটের দিকে কর্নেল জানজুয়া তার এডজুটেন্ট মেজর মীর শওকত আলীকে নিয়ে অফিসে আসেন। কোম্পানী অধিনায়কের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর শওকত আলীর চার্লি (charlie) কোম্পানীকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়া হয়। কর্নেল জানজুয়া ও মেজর শওকত অস্ত্রবিহীন অবস্থায় চার্লি কোম্পানীসহ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা "সোয়াত" নামক জাহাজ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ খালাস করার জন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ধীরে ধীরে সৈনিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতিটি দলের সাথে বাঙালি অফিসারের পাশাপাশি দুই-একজন জন পাঞ্জাবি অফিসার দেয়া হয়।

রাত আট ঘটিকায় ক্যাপ্টেন অলি একাধিকবার ই, পি, আর এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। রাত বাড়ার সাথে সাথে অলি আসন্ন বিপদ অনুভব করেন। রাত ৮.১৫ মিনিটে অলি তার অনুভূতি প্রকাশের জন্য বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দিকে রাস্তার ব্যারিকেড সরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ব্যাটালিয়ন থেকে একটি ছোট ট্রাক নেন এবং সহকারী ডিউটি অফিসারকে বলেন যে তিনি নিজেই ব্যারিকেড সরানোর কাজে নিয়োজিত সৈন্যদের জন্য খাবার নিয়ে যাবেন। কয়েকজন সৈন্য সাথে নিয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যদের খাবার সরবরাহের জন্য তিনি গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হন। অলি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, ব্যারিকেডগুলো পুনরায় রাস্তার উপর রাখা হয়েছে এবং জনগণ সেগুলো পাহারা দিচ্ছে। তিনি কে রহমান কোকা-কোলা ফ্যাক্টরির বহির্ভবনে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাত করেন। পাকিস্তান আর্মির সম্ভাব্য হামলা এবং তিনি সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা মেজর জিয়ার নিকট ব্যক্ত করেন। জিয়াও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। লে কর্নেল এম আর চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মেজর জিয়া খাওয়ার অজুহাতে অলির সাথে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের অদূরে তাঁর বাসায় ফিরে আসেন। লে. মাহফুজ,

লে. শমশের এবং লে. হুমায়ুন একই রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাত ৯.০০ ঘটিকায় মেজর জিয়া তার বাসভবনে এবং ক্যাপ্টেন অলি ডিউটি অফিসারের কক্ষে ফিরে আসেন। অলি ভাবলেন যদি কিছু ঘটে তবে তা রাত ১ টার মধ্যেই ঘটে যাবে। সে সময় পর্যন্ত অলি টেলিফোনের নিকট সজাগ থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি চাইছিলেন, এ সময় লে. আযম যেন ঘুমাতে যান এবং টেলিফোনের নিকট না থাকে, যাতে আযম বাঙালী অফিসারদের কথাবার্তা শুনতে না পারেন। তাই অলি আযমকে রাত ২টা পর্যন্ত নিজেই দায়িত্ব পালনের এবং ২টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত আযমকে দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাব দেন। লে. আযম অলির প্রস্তাবে রাজী হয়ে পাশের রুমে ঘুমাতে যান। মেজর জিয়া রাতের খাবার সেরে অফিসে এসে অলিকে কর্নেলের কোন সংবাদ আছে কিনা জানতে চাইলে অলি না সুচক জবাব দেন। মেজর জিয়া জানান যে, কর্নেল তাঁর (কর্নেলের) স্ত্রীকে ফোন করেন। এরপর কর্নেলের স্ত্রী জিয়ার স্ত্রীকে ফোন করে জিয়াকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চট্টগ্রাম বন্দরে ডিউটিতে যেতে হবে মর্মে সংবাদ দেন। এ সংবাদ তাদেরকে ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলে দেয়। তারা বুঝতে পারলেন না, প্রথমত কর্নেল ডিউটি অফিসারকে বাদ দিয়ে কেন তার স্ত্রীকে ফোন করলেন। দ্বিতীয়ত কীভাবে তিনি জানতে পারলেন যে ঐ সময়ের মধ্যে জিয়া বাসায় ফিরবেন। জিয়ার ঐ সময় তার সেনাদল নিয়ে বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় ডিউটিতে থাকার কথা। উভয়ে এ ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জিয়ার চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়া উচিত। কারণ তাঁরা শেখ মুজিবর রহমান অথবা চট্টগ্রামে তাঁর রাজনীতিক মিত্রদের পক্ষ থেকে কোন তথ্য বা নির্দেশনা পান নি। তাছাড়া "চার্লি কোম্পানি" সেখানে দায়িত্বে নিয়োজিত।

রাত অনুমান ১০.৩০ মিনিটে উভয়ে কর্নেল জানজুয়া এবং মেজর শওকতকে রুমে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কর্নেলের এসময় এখানে আসার কথা নয়, ক্যাপ্টেন অলি উদ্বিগ্ন হলেন। কর্নেল জানজুয়া বিগ্রেডিয়ার আনসারি চট্টগ্রাম বন্দরে জিয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন জানিয়ে অবিলম্বে জিয়াকে সেখানে যাবার নির্দেশ দেন। লে. আযমকেও জিয়ার সাথে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি অলিকে সারারাত ডিউটি এবং মেজর শওকতকে আরাম করার জন্য মেসে যাবার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে অন্য কোন কথা বলার সুযোগ দিলেন না।

তাছাড়া কর্নেল জানজুয়া ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে তার (ডেল্টা কোম্পানি) কোম্পানিসহ চট্টগ্রাম বন্দরের বিপরীত পাশে অবস্থিত ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য ক্যাপ্টেন অলিকে নির্দেশ দেন। অলি ডেল্টা কোম্পানিকে আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হবার নির্দেশ দেন এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে অনতিবিলম্বে ডিউটির জন্য রিপোর্ট করার সংবাদ

পাঠান। কর্নেল বললেন যে, তিনি কয়েকজন নৌসেনা সহ একটি ট্রাক নিয়ে এসেছেন। তিনি জিয়াকে ঐ ট্রাকে চড়ে চট্টগ্রাম বন্দর যাবার নির্দেশ দেন।

রাত অনুমান ১০.৩৫ মিনিটে কর্নেল জানজুয়া, মেজর জিয়া, মেজর শওকত এবং ক্যাপ্টেন অলি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। লে. আযম তাদের অনুসরণ করছিলেন। অর্ধেক নামার পর অলি টেলিফোন বাজার শব্দ পেয়ে টেলিফোন ধরার জন্য দ্রুত উপরে উঠে যান। টেলিফোনে তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, চিটাগাং এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাদেরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তিনি অলিকে জানালেন যে, ঢাকায় পাকিস্তান আর্মি গোলাগুলি ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষকে হত্যা করছে। অলি তাঁকে ঢাকা থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করার কথা বললে তিনি ঢাকা শহরের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সংবাদ দেন। আবদুল কাদের বলেন তিনি সন্ধ্যা ৬.০০টা হতে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম হয়ত পাকিস্তান আর্মি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের নিকট থেকে এই হামলার সংবাদ পেয়েছেন। তার আত্মীয় আরও জানিয়েছেন যে, ট্যাংক নিয়ে সেনাবাহিনী দুপুর ১.০০ ঘটিকা হতে ঢাকা শহরে টহল দিচ্ছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে। লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি তার "বিট্রেয়াল অফ ইষ্ট পাকিস্তান" গ্রন্থে ৭১ এর ২৫/২৬ মার্চের পাশবিক অত্যাচারের কথা এভাবে বর্ণনা করেন–

"১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে জেনারেল টিক্কা আঘাত হানেন। শান্তিপূর্ণ রাতটি আর্তনাদ, চিৎকার আর অগ্নিময় বিভিষীকায় পরিণত হয়। জেনারেল টিক্কা তার সমস্ত ক্রোধ এমনভাবে উগরে দেন যেন তিনি শত্রু নিধন করছেন। অথচ নিজের বিপথগামী লোকদের নিয়ন্ত্রণ করেন নি। সামরিক বাহিনীর এ পদক্ষেপ ছিল মারাত্মক নির্মম প্রদর্শনী। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর এ আক্রমন ও পাশবিক নিষ্ঠুরতা হালাকু খান ও চেঙ্গিস খানের বুখারা ও বাগদাদ এবং বৃটিশ জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাযজ্ঞর চেয়েও অধিক নির্মম ছিল।"

জেনারেল টিক্কা তার উপর অর্পিত বাঙালি সশস্ত্র ইউনিট ও ব্যক্তিদের নিরস্ত্র করা এবং বাঙালি নেতাদের বন্দি করার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে বেসামরিক লোকজন হত্যা এবং পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করেন। সৈনিকদের প্রতি তার নির্দেশ ছিল এ রকম- 'আমি দেশ চাই, মানুষ চাই না।' এই আদেশ মেজর জেনারেল ফরমান আলী ও বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব (পরে লেঃ জেঃ) আন্তরিকতার সাথে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তার টেবিল ডায়েরিতে লিখেছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ ভূমি লাল আলপনায় রঞ্জিত হবে।' ইহা

সত্যি বাঙালিদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। বাঙালিরা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট হাউজ দখল করার পর এই ডায়েরি পান।"

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বে ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে তিনি টিক্কা খানকে বলে যান "তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও"। টিক্কা কী করেন তা দেখার জন্য ভুট্টো আড়ালে অবস্থান করেন। ভুট্টো দেখলেন ঢাকা জ্বলছে। মানুষের আর্ত চিৎকার ও জ্বলন্ত জিনিসের ফটফট শব্দ তার কানে ভেসে আসে। তিনি শুনতে পান ট্যাংকের গর্জন, বন্দুক আর রকেটের গুমগুম শব্দ এবং মেশিনগানের ঝমঝম আওয়াজ। (নিয়াজি ১৯৯৮ ঃ ৪৫-৪৬)।

ফারুক আজিজ খানও তাঁর স্প্রিং ১৯৭১' গ্রন্থে লিখেছেন "রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসসমূহ এবং পিলখানা ই, পি, আর, সেন্টার সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা ট্যাংক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমন করে। পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর সদস্যরা পাল্টা গুলি চালায়। তাদের যা ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে, অনেকে হতাহত হয় এবং এক পর্যায়ে তারা ঐ এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আসল হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সেখানে শত শত নিরস্ত্র ছাত্রদের হত্যা করা হয় এবং গণকবর দেওয়া হয়। জোরপূর্বক ছাত্রদের দিয়ে কবর খুঁড়ানো হত। কবর খোঁড়ার পর গুলি করে হত্যা করে সে কবরে তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয়। আমি আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইন যখন আক্রান্ত হয় পুলিশ প্রধান তখন তার ঢাকার বাসভবনে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন। এ ছিল আমাদের প্রস্তুতির অবস্থা।" (খান ১৯৯৩ ঃ ৫৫)

জনাব কাদেরের দেওয়া সংবাদ অলির স্বাভাবিকতাকে অস্থির করে তুলে। কিন্তু অলি তাকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ করবেন। মেজর জিয়াকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য তিনি দ্রুত নিচতলায় নেমে আসেন। কিন্তু মেজর জিয়া তখন কর্নেল জানজুয়া ও মেজর শওকত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় সংবাদ প্রদান অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠে। জিয়াকে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত মনে হচ্ছিল। ক্যপ্টেন অলি কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। জিয়াকে এটা জানানো ও সতর্ক করা প্রয়োজন যে, তাকে অনতিবিলম্বে বন্দি অথবা হত্যা করা হবে। যাই হোক তিনি অন্যান্য অফিসারদের উপস্থিতিতে জিয়ার সাথে কথা বলতে ব্যর্থ হন। তবে ইশারায় তাকে আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত প্রদান করেন। কর্নেল তাঁর উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দরে জিয়ার যাত্রা নিশ্চিত করেন। মেজর জিয়া লে. আযমকে সাথে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার আনাসারীকে রিপোর্ট করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে যাত্রা করেন। কর্নেল জানজুয়া মেজর শওকতকে সাথে

নিয়ে জিপে উঠে তার বাসার দিকে চলে যান। ক্যাপ্টেন অলি বর্ণনাতীত উত্তেজনা অনুভব করলেন। তিনি জিয়ার জীবন বাচাঁতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ক্যাপ্টেন জিয়াকে অনুসরণ করাসহ তাকে ঢাকার অবস্থা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের আসন্ন বিপদের কথা অবগত করানোর জন্য মরিয়া হয়ে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন।

রাত্রি তখন আনুমানিক ১০টা .৪৫ মিনিট। অলি জানতেন, ক্যাপ্টেন খালেক তখনও ট্র্যানজিট ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন নি। এ সময় ক্যাপ্টেন খালেক তার রুমে আসেন। অলি তাকে ঢাকার হত্যাযজ্ঞের সমস্ত ঘটনা বর্ণণা করে ট্র্যানজিট ক্যাম্পে যাবার পরিবর্তে জিয়াকে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দেন। পাকিস্তান আর্মির সাথে তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে অন্যথায় পাকিস্তাননিরা তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করবে। ক্যাপ্টেন খালেক তার কোম্পানির কয়েকজন সৈন্য নিয়ে জিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত রওয়ানা দেন। তাঁর কোন ঝুঁকি ছিল না। কারণ ট্র্যানজিট ক্যাম্প এবং চট্টগ্রাম বন্দরের রাস্তা অভিন্ন। সুতরাং তাঁর গতিবিধিতে পাকিস্তানিদের সন্দেহ উদ্রেক করার কোন অবকাশ ছিল না। ক্যাপ্টেন অলি নায়েব সুবেদার আবদুল হামিদকে অস্ত্রাগার খোলার নির্দেশ দিলেন এবং সবাইকে অস্ত্র দিতে বললেন। ইতোমধ্যে অলি মেস হাবিলদার আবদুল আজিজের সাহায্যে অফিসার্স মেসে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। কারণ মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন সাদেক এবং ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী (পাঞ্জাবি অফিসার) সেখানে ঘুমাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন অলি টেলিফোনে লে. শমশের মবিন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অবস্থা জানাতে বললেন। তিনি তখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কাছাকাছি বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় ডিউটিতে। শমশের মবিন রাত ১১.০০ টায় অলিকে ফোন করে জানালেন যে, রাস্তায় বেসামরিক লোকদের অপ্রতিরোধ্য ব্যারিকেডের কারণে তিনি সেনানিবাসের খুব কাছাকাছি যেতে পারেন নি। তবে ট্যাংক এবং গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছেন। লে. শমশের মবিন চৌধুরীর নিকট চট্টগ্রাম সেনানিবাস আক্রমণ করার মত প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও পর্যাপ্ত সৈন্য ছিল না। অলি তাঁকে তাঁর (শমশের মবিন) সেনাদল নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। অলি তাঁকে আরও নির্দেশ দেন যে, আসার পথে লে. মাহফুজের সাথে দেখা করে তাঁকে হেড কোয়ার্টারে যেন রিপোর্ট করতে বলেন। উভয়ে অলিকে রিপোর্ট করলেন; কিন্তু সব সৈন্য ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। কারণ সৈন্যরা বিভিন্ন অবস্থানে কর্মরত ছিল এবং সময় সল্পতার জন্য সবাইকে জানাতে পারেন নি। গোটা পরিস্থিতি অলির নিয়ন্ত্রণে ছিল। সংগতকারণে স্বস্তি বোধ করলেন। তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্নেল এম আর চৌধুরী এবং অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কয়েকজন পাঞ্জাবি অপারেটরকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বসানো হয়। অলি তাদেরকে এম আর চৌধুরী এবং অন্যান্য অফিসারদের সাথে সংযোগ দিতে অনুরোধ করেন। অপারেটর উত্তরে কাওকে

পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে জানান। ক্যাপ্টেন অলি অফিসার্স মেস হতে ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী এবং ষোলশহর রেলক্রসিংএ কর্তব্যরত লে. হুমায়ন খানকে বন্দি করার জন্য দুটি ছোট সেনা দল প্রেরণ করেন। রাত ১১.৩০ মিনিটে দুজনকে বন্দি করে তাঁর সামনে হাজির করা হয়। অলি উভয়কে তাঁর অফিসের সম্মুখে দুটি পৃথক কক্ষে সশস্ত্র গার্ডের তত্ত্বাবধানে বসিয়ে রাখলেন। তিনি মেজর শওকতকে সকল বিষয়ে অবহিত করেন। শওকত তখনও অফিসার্স মেসে তাঁর রুমে অবস্থান করছিলেন।

রাস্তায় ব্যারিকেডের কারণে মেজর জিয়া দ্রুত বেশি দুর যেতে পারেন নি। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে দেওয়ানহাট রেলক্রসিংয়ের নিকট ক্যাপ্টেন খালেকের সাথে জিয়ার দেখা হয়। তিনি জিয়াকে সতর্কবার্তা প্রদান করেন। আনুমানিক ১১.৪৫ মিনিটে জিয়া হেড কোয়ার্টারে এসে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে কর্তব্যরত এক বাঙালি সৈনিকের নিকট থেকে দ্রুত একটি স্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে লে. আযম ও ঐ ট্রাকের অন্য নাবিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, "তোমরা অস্ত্র সমর্পণ কর, তোমাদের সবাইকে বন্দি করা হল।" তাদের বন্দি করে দোতলায় অলির রুমের পাশে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রাখা হল। লে. শমশের এবং লে. মাহফুজকে বন্দিদের উপর নজর রাখার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়।

জিয়া এবং অলি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন অলির কর্নেল জানজুয়াকে বন্দি করার জন্য তার বাসভবনে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি হেডকোর্য়াটার ছেড়ে যেতে পারলেন না। কারণ সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সুতরাং তিনি জানজুয়াকে বন্দি করার জন্য মেজর জিয়াকে সশরীরে অগ্রসর হবার অনুরোধ করেন। ফেরার পথে অফিসার্স মেস হতে মেজর শওকতকেও সাথে নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। জানজুয়াকে বন্দী করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। সাথে নিয়ে আসা হয় মেজর শওকতকে। জানজুয়াকে তার অফিস রুমে ক্যাপ্টেন আহমেদ আলীর সাথে রাখা হয়। লে. হুমায়ুন খান এবং লে. আযমকে অন্য একটি পৃথক রুমে রাখা হয়। তাদের সবাইকে সশস্ত্র গার্ডের অধীনে রেখে পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়। নায়েব সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে হেডকোয়ার্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে তোলা হয়।

এ চূড়ান্ত মুহূর্ত সম্বন্ধে আলোচ্য গবেষণার একজন উত্তরদাতা লে. জেনারেল মীর শওকত আলী বলেন, "প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার জানজুয়াকে বন্দি করার পর মেজর জিয়ার সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেন, 'এই জঘন্য লোকটি (কর্নেল জানজুয়া) আমাদের হত্যা করতে যাচ্ছিল। আমি বিদ্রোহ

করেছি। আপনি কি বলেন?' আমি বললাম, 'আপনিই কমান্ডিং অফিসার। আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিবাদন জানাই।' আমরা করমর্দন করলাম এবং জিয়া আমাকে ব্যাটালিয়নে আসতে বললেন।"

বাঙালি সেনা অফিসারগণ সময়ক্ষেপণ করতে চান নি। জিয়া, শওকত এবং অলি দ্রুত মিটিঙে বসেন। তারা তাৎক্ষণিকভাবে শহরের বাইরে গিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের নিজেদের শক্তি তথা সৈনিক সংখ্যা, অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ এবং দুর্বলতা নিরূপণ করা প্রয়োজন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা সকালে ২০-বেলুচ রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ট্যাংকসহ আক্রমনের পাশাপাশি বিমান থেকেও হামলা চালাতে পারে। বন্দি অফিসার এবং সৈন্যদের কী করবেন সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। শেষে তাদেরকে হত্যা করা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। তাদের গুলি করে হত্যা করা হয় এবং মৃত দেহগুলি মেঝের উপর পড়ে থাকে। দুটি কারণে তাঁরা পাকিস্তানি অফিসার এবং সৈন্যদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত, তাঁরা জানতেন না বিদ্রোহ করার পর হেডকোয়ার্টার ছেড়ে কোথায় যাবেন। দ্বিতীয়ত প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বন্দি সৈনিকদের আটক রাখার কোন ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত তারা করেন নি। অধিকন্তু, পরদিন সকালে কি হবে তাঁরা তা জানতেন না।

আনুমানিক রাত ১২.৩০ মিনিটের সময় ক্যাপ্টেন অলি অফিসার মেস পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত মেস হাবিলদার আবদুল আজিজকে মেজর আবদুল হামিদ এবং ক্যাপ্টেন নজরকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। এই দুজন পাকিস্তানি অফিসার ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসার মেসের বিপরীত দিকে ই, পি, আর, অফিসার্স মেসে ছিল। বন্দি অফিসারদের অলির সামনে হাজির করা হল। তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জানতে পারলেন যে, অফিসার্স মেসে ঘুমন্ত বাঙালী অফিসারদের হত্যা করার দায়িত্ব তাদের উপর দেয়া হয়েছিল । এদের দুজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সময় ব্রিগেডিয়ার আনসারী অলিকে ফোন করে মেজর জিয়ার বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় সম্বন্ধে জানতে চান। তিনি তাকে জানালেন যে জিয়া রাস্তায় আছেন। যদিও জিয়া তখন তার সামনে বসা ছিলেন। রাত প্রায় ১.০০ টার সময় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের একজন হাবিলদার এবং দুজন সিপাহী ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল হেডকোয়ার্টারে আসেন। তাঁরা কাঁদছিলেন। তাঁরা জানালেন যে, ২০ বেলুচ রেজিমেন্ট ট্যাংক এবং ভারী অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার এবং ব্যারাকে আক্রমণ করেছে, ৫০ জন সৈন্য এবং অফিসার হত্যা করেছে। লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। তাদের সৈনিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁরা তাদের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ওই মুহূর্তে

পাল্টা আক্রমণ করার মত পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং গোলাবারুদ তাদের নেই। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল ''প্রাথমিক পর্যায়ের।"

রাত ১.১৫ মিনিটে ক্যাপ্টেন অলি সকল জেসিও এবং অন্যান্য পদমর্যাদার সৈনিকদের হেডকোয়ার্টারের অভ্যন্তরে খোলা জায়গায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের সকলকে সামরিক কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। অলি তাদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে জিয়াকে অবহিত করে প্যারেড হস্তান্তর করেন। সৈন্যদেরকে এক ঘণ্টার মধ্যে সামরিক পোশাক পরিধান করে মজুত অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁরা ওই জায়গা চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছিল। জিয়া সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন এবং বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। খাদ্য, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছাড়া কাউকে কিছুই নেয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাস্তার ব্যারিকেড সরানো এবং চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করার কাজে নিয়োজিত বাঙালি সৈনিকরা তখনও ফিরে আসে নি। তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও হেডকোয়ার্টারে একটি ছোট সেনা দল রাখার ব্যবস্থা হল। ঐ দলের দায়িত্ব নায়েব সুবেদার আবদুল মালিকের উপর ন্যস্ত করা হয়। এবং পরবর্তীকালে যারা ফিরে আসবেন তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে বললেন। বিদ্রোহের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর জন্য একটি জিপ দিয়ে মেজর শওকতকে আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘরে ঘরে পাঠানো হল। রাত অনুমান ২.৪৫ মিনিটে শওকত ফিরে আসেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাদের নিকট থেকে কোন প্রকার নির্দেশনা বা বার্তা ছিল না। মনে হয় সবাই অসর্তক বা অসাবধান অবস্থায় ছিল। তবে তাদের প্রায় সকলে যুদ্ধে যোগদান করেন।

কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ও তার পাকিস্তানি দোসরদের হত্যার পর ক্যাপ্টেন অলির আয়োজিত সমাবেশে সকল অফিসার এবং সৈনিকদের উদ্দেশ্যে মেজর জিয়ার বক্তব্যকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লে. জেনারেল মীর শওকত আলী বলেন, "ঐ জায়গায় জিয়ার কিছু বলার প্রয়োজন ছিল। সেখানে কোন উচ্চ জায়গা ছিলনা। কয়েকজন সৃজনশীল সৈনিক একটি ৪৫ গ্যালনের ড্রাম নিয়ে আসে। ড্রামটি খাড়া ভাবে রাখা হয়। জিয়া ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা বিদ্রোহ করেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করব এবং আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করব। তিনি ষোলশহর মার্কেট থেকে সৈনিকদেরকে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্বাহী নির্দেশ প্রদান করেন।"

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ভোর তিনটায় জিয়া, অলি এবং অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকগণ ব্যাটিলিয়ান হেড কোয়ার্টার ত্যাগ করে শহর এলাকার বাইরে বোয়ালখালী থানার অদূরে করলডেংগা পাহাড় নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। এটি ছিল নিকট গ্রামের অদূরে অংশিক পাহাড়ী এলাকা। করলডেংগা পাহাড়ে যাবার পথে ই, পি, আর-

এর ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী ও তাঁর কোম্পানির সাথে কালুরঘাটে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তিনি ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে শহরে যোগ দিতে আসছিলেন। তাঁরা তাঁকে তাদের সাথে যোগ দিতে বললেন এবং তিনি তাই করলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সেনাবাহিনীর প্রথা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শপথ গ্রহণ করা হয়- ''আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আমরা আমরণ যুদ্ধ করব এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।" মেজর জিয়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

রেডিওর সংবাদ শোনার এবং আওয়ামীলীগ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সারাদিন তাঁরা ঐ জঙ্গলে কাটান। শেখ মুজিবের নিকট থেকে তাঁদের জন্য কোন নির্দেশ আসে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক নেতারা তাঁদের সাথে দেখা করতে আসেন এবং খাবার ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যে তারা কর্নেল এম, আর, চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চও কোন নতুন তথ্য পাওয়া গেল না। ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছাড়া আর কেউ বিদ্রোহ করলেন না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানের কোন পূর্বানুমান ছিল না। সম্ভবত তিনি তাঁদের বিশ্বাস করেন নি কিংবা তাদের সমর্থনের কথা চিন্তা করেননি। স্প্রিং ১৯৭১ গ্রন্থে ফারুক আজিজ খান মন্তব্য করেন-

"শেখ মুজিব ছিলেন ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতিকে একতাবদ্ধ করতে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি ১৬ বছরের অধিককাল পাকিস্তানি জেলখানায় বন্দি ছিলেন। আইয়ুব খানের আমলে তাঁকে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়ানো হয়েছিল। তবে তিনি মাও সেতুং, হোচি মিন বা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর মত বিপ্লবী নেতা ছিলেন না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তার দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে তিনি কখনও গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করেন নি। তাই যখন প্রত্যক্ষ বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিল তখন তিনি দ্বিধান্বিত ও হতাশ হলেন এবং যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সম্ভবত ভেবেছিলেন যে তার হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাওয়া পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

আওয়ামীলীগের প্রভাবশালী নেতা তোফায়েল আহমেদ আমাকে বলছেন, পাকিস্তানি কমান্ডোরা তার বাসা ঘিরে রেখেছিল। তিনি (শেখ মুজিব) বাইরে যাবার চেষ্টা করলে তাকে বন্দি অথবা হত্যা করা হত। বঙ্গবন্ধু তা জানতেন। তাছাড়া তিনি কোথায় যেতে পারতেন? পাকিস্তানিরা তাঁকে খুজে বের করত। ভারতীয় সীমান্ত ছিল কমপক্ষে ৬০ কিলোমিটার দূরে।সম্ভবত তিনি সেখানে যেতে চাইতেন না। কারণ আমরা শুনেছিলাম ১৯৬২ সালে তিনি যখন আগরতলা যান তখন তাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা দেয়া হয় নি।" (খান ১৯৯৩ ঃ ৫২)

সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থেও অভিন্ন প্রতিধ্বনি শোনা যায়-

''প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগ করার বিষয়টি দশ দিন পূর্বে তার ঢাকা আগমনের চেয়েও বেশী গোপন রাখা হয়েছিল। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটা প্রহসন করা হয়। বিকেলে চা পানের জন্য প্রেসিডেন্ট সরাসরি সেনানিবাসে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে যান। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বে যথারীতি পাইলট, জিপ, আউটরাইডার এবং চার-তারকা পেণ্টট ও পতাকা শোভিত রাষ্ট্রপতির গাড়ি প্রেসিডেন্ট ভবনে ফিরে যায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গাড়িতে ছিলেন না। তার জায়গায় ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রফিক। এই ধোঁকাকে একটি সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। যদিও মুজিবের গোয়েন্দারা এই খেলা ধরে ফেলেন। ইয়াহিয়ার স্টাফ অফিসার লে. কর্নেল এ আর. চৌধুরী প্রেসিডেন্টের মালপত্র বিমান বন্দরের দিকে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি মুজিবকে একথা জানান। ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যা ৭.০০ টায় যখন বিমানবন্দরে পৌঁছেন, উইং কমান্ডার খন্দকার তা দেখেন এবং মুজিবকে অবহিত করেন। পনের মিনিট পর একজন বিদেশি সাংবাদিক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে আমাকে ফোন করে জানতে চান, মেজর আপনি কি নিশ্চিত করতে পারেন যে, প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন?"

ততক্ষণে রাত্রি ঘনিয়ে আসে। তখন কেউ জানত না যে, এ রাতটি হবে এমন এক রাত যে রাত কোন শান্তিময় ভোর আনবে না। (সালিক ১৯৭৭ ঃ ৬৯-৭০; পরিশিষ্ট ৩ এবং ৪ ঃ ৭১ - ৮০)

ফজলুল কাদের কাদেরি যথার্থভাবে গুরুত্বসহকারে বিষয়গুলো উলেণ্টখ করেন- এ খামখেয়ালী স্থগিতাদেশের ফলে ১ মার্চ ঢাকা এবং অন্যান্য শহর উত্তেজনাময় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেনাবাহিনী বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিক্ষোভ দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ গোলযোগে সেনাবাহিনী ১৭২ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে। যদিও দি অবজারভার (লন্ডন) পত্রিকা ঢাকার প্রতিনিধি মৃতের সংখ্যা ২০০০ এর কাছাকাছি উলেণ্টখ করেন। এরূপ নিষ্ঠুর উস্কানির পরও আওয়ামীলীগ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। তদপরিবর্তে তাঁরা সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার এবং সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের তদন্ত দাবিতে গণঅনাস্থা কর্মসূচি পালন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে কার্যকর সমর্থন প্রদান করেন। কিন্তু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক বিশাল জনসভাতেও শেখ মুজিব উভয় প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসনে দাবি সংবলিত একটি সমন্বিত পাকিস্তানের কথা বলেন। প্রকাশ্যে দলে দলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানে আসা সত্ত্বেও দুই সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক সংলাপ-প্রস্তুতি পাকিস্তানকে অবিভক্ত রাখার উপর শেখ মুজিবের অঙ্গীকার প্রমাণ করে। বস্তুত ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, পাকিস্তানিরা কখনও বিশ্বাসযোগ্য আলোচনা করে নি। ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পর্যাপ্ত সৈনিক পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসার জন্য যেটুক সময় প্রয়োজন ছিল সে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ছিল আলোচনার উদ্দেশ্য। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শান্তিপূর্ণ

রাজনীতিক সমাধানের প্রতি আওয়ামীলীগের অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতিহীন বেসামরিক জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লেলিয়ে পড়া আকস্মিক প্রচন্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রতিপাদিত হয়। (কাদেরি ১৯৭২ ঃ ৪১)

বিদ্রোহীরা জানতেন যে, চট্টগ্রাম এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিজেদের পরিকল্পনা নিজেদেরই করতে হবে। তাঁরা চট্টগ্রাম সিটির জন্য একটি সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করেন। মেজর জিয়াউর রহমান ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাদের মাত্র ৩০০ জন সৈন্যের .৩০৩ রাইফেল, ১২টি এল, এম, জি, এবং ২০ দিন যুদ্ধ চালানোর মত যুদ্ধোপকরণ ছিল। সামরিক পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ:

এ) মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি সেনা দল চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করবেন।

বি) ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি সেনা দল কালুরঘাট এবং চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র এলাকায় নিয়োজিত থাকবেন।

সি) ক্যাপ্টেন হারুনের নেতৃত্বে ই, পি, আর-এর একটি দল চট্টগ্রাম কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকায় অবস্থান নেবেন।

ডি) ক্যাপ্টেন সাদেক হোসাইনের নেতৃত্বে একটি সেনা দল সীতাকুন্ড এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সরবরাহ লাইন প্রতিহত করবেন।

ই) লে. মাহফুজের নেতৃত্বে একটি সেনা দল কালুরঘাট এলাকায় জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য সংরক্ষিত থাকবেন।

এফ) লে. শমশের মবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও চকবাজার এলাকায় নিয়োজিত থাকবেন।

জি) চট্টগ্রাম এলাকায় অপারেশন সমন্বয় করার জন্য ক্যাপ্টেন অলির অধীনে বোয়ালখালীর ফুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হবে।

মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি সকল দলের কমান্ডারদেরকে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁদেরকে শুরুতে আক্রমণ এড়িয়ে যাবার এবং গেরিলা পদ্ধতি ও আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সূর্যাস্তের পর নিজ নিজ অবস্থান দখল করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হল। খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের জন্য এবং টেলিফোন বা কুরিয়ারে প্রতিদিনের পরিস্থিতি হেড কোয়ার্টারে প্রেরণের জন্য মেজর জিয়া তাঁদের নির্দেশ প্রদান করেন। মওজুদ অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রত্যেক দলকে সমভাবে বরাদ্দ করে দেয়া হয়। সেনা দলের ব্যবহারের জন্য কোন পরিবহন এবং ওয়ারলেস ছিলনা। তাদের নিকটবর্তী অন্যান্য সেনা দলের কমান্ডারের

সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশও দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কমান্ডারকে স্বাধীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পুলিশ ও প্যারামিলিটারি সদস্যদের সাথে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। পাকিস্তানি আর্মিকে হতভম্ব করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাদল রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিতে সিদ্ধান্ত নেন। সকল দল নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। জিয়া ও অলি দুই জন দেহরক্ষী সিপাহী নিয়ে তাদের অনুসরণ করেন। প্রায় দুই মাইল হাটার পর তাঁরা একটি গ্রামে থামেন এবং একটি স্কুল ভবনে রাত কাটান। অন্যান্যদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পরদিন তারা পটিয়া পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

তারা শহরের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন রফিকের প্রকৃত অবস্থান জানতে ব্যর্থ হন। বিভিন্ন তথ্য হতে জানতে পারেন যে, ক্যাপ্টেন রফিক নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে হালিশহর ও রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। ইতোমধ্যে ই, পি, আর-এর সুবেদার মফিজ দুই ট্রাক সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে দেখা করতে শহরের দিকে যেতে দেখেন। পটিয়া থানার ২০ জন পুলিশ সদস্যও তাদের সাথে যোগ দেন। এভাবে দুই ট্রাক বোঝাই সৈনিক এবং এক ট্রাক বোঝাই পুলিশসহ সুবেদার মফিজ এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় প্রতিরোধমূলক অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সুবিধা হরে। প্রতিদিন অসংখ্য পুলিশ এবং আনসার সদস্য তাদের সাথে যোগ দিতে থাকে। ধীরে ধীরে ছাত্র এবং বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকও তাদের সাথে যোগ দিতে শুরু করে। এভাবে তাদের জনবল মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। তবে অস্ত্র এবং গোলাবরুদের দিক থেকে তাদের সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

জিয়া এবং অলি রেডিওর মাধ্যমে শেখ মুজিব অথবা তার সহকর্মীরা কোন ঘোষণা দিয়েছেন কিনা অথবা শেখ মুজিবের পক্ষ হতে কোন নির্দেশ আছে কিনা তা জানার জন্য বারংবার চেষ্টা করেন। ইতেমধ্যে তারা চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. জাফর, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রনেতাসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তবে তাদের কেউ শেখ মুজিব এবং তার সিনিয়র সহকর্মীরা কোথায় আছেন জানতেন না। রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের কোন নির্দেশনা বা অভিভাকত্ত ছিল না। প্রত্যেককে শহরের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আওয়ামী লীগের নেতারা কীভাবে ঢাকা শহর থেকে পালিয়ে যান তা বর্ণনা করতে গিয়ে ফারুক আজিজ খান বলেছেন–

"তাজউদ্দিন রাত ১০.৩০ ঘটিকায় শেখ মুজিবের বাসা হতে নিজের বাসায় পৌঁছে পোশাক পরিবর্তন করে লুঙ্গি ও কোর্তা পড়েন। কাঁধে একটি রাইফেল ঝুলিয়ে ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামসহ তিনজন লালমাটিয়ায় এক বন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন। পূর্ব হতে সেখানে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। আমিরুল ইসলামের কথা অনুসারে ডঃ কামাল হোসেন তার দুই বন্ধুর সাথে আর যেতে চাইলেন না। তৎপরিবর্তে তাকে ১৫ নম্বর রোডের নিকট নামিয়ে দেয়া হয়, যেখানে তার এক আত্মীয় বাস করেন (লিবারেশন ওয়ার ডকুমেন্টস, ভলিউম-১৫)। যাহাহউক তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাদের সাথে দেখা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। তাজউদ্দিন এবং আমিরুল ইসলাম তাদের বন্ধুর বাসায় গেলেন। সেখান হতে তাঁরা যাত্রার জন্য নিরাপদ সময় দেখে যত শীঘ্রি সম্ভব ভারত গমনের পরিকল্পনা করেন। ড. কামাল হোসেন তাদের সাথে আসলেন না। ২৫ মার্চ রাতে জারি করা কারফিয়ু ২৭ মার্চ দুই ঘণ্টার জন্য শীথিল করা হলে তারা দুজন মুসার লালমাটিয়ার বাড়ি ত্যাগ করেন। পরবর্তী ৯ মাস তাজউদ্দিন এবং আমিরুল ইসলাম স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে তাজউদ্দিন আহমেদ শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরাট অবদান রাখেন। তারা দুজন সোজা পদ্মা নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে ফরিদপুরের উপর দিয়ে চলে যান।" (খাঁন, ১৯৯৩ঃ ৫৩-৫৪)

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির নিবিড় বিশেণ্ডষণ করে মনিরুজ্জামান তালুকদার তার গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে বলেছেন ঃ "ই বি আর (ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) এবং ই পি আর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) এবং অফিসারগণ ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার ফলাফল তাদের জানানোর জন্য আওয়ামীলীগ নেতাদের অনুরোধ করেন। যাই হউক, আওয়ামী লীগ নেতারা এভাবে আত্মপ্রতারিত হয়েছেন যে, দেরিতে হলেও ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তি করতে রাজি হবেন অথবা তাদের মধ্যে এমন একটি অমূলক ভীতি কাজ করছিল যে, বাঙালি অফিসারেরা বিদ্রোহ করলে বেসামরিক আওয়ামীলীগ নেতারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হয়ে যেতে পারে। যে কারণে হোক, আওয়ামীলীগ নেতাদের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ ই বি আর অথবা ই পি আর- এর নিকট পৌঁছায়নি।" (তালুকদার, ১৯৮৮ ঃ ৮৬)

প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি দেখে পাকিস্তানি নেতারা নিশ্চিত ছিলেন যে, তাদের বেপরোয়া ও নির্বিচার গণ হত্যার পাশবিক অভিযান বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা অজ্ঞাতসারে পাকিস্তান ভাঙ্গনের প্রথম কাজটি করে ফেলেন। সংগতকারণে বাঙালিরা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন (হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট, "১৯৭১ দি আনটোল্ড স্টোরি)"[১]। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানে নিরস্ত্র সাধারণ জনগণের উপর পাকিস্তান সমিাহীন বর্বরতা সম্বন্ধে দেখুন ১৯৭১ হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ২০০০, টুডে গ্রুপ দ্বারা প্রকাশিত, ভারত। ইতোমধ্যে তাদের সাথে পটিয়ায় মাহমুদ নামক এক ব্যক্তির দেখা হয়। মাহমুদ ক্যাপ্টেন অলিকে খুঁজছিলেন।

তিনি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে দাবি করে বঙ্গোপসাগরে নোঙ্গরকৃত ৭ম নৌবহর থেকে এয়ারক্রাফ্ট এবং ভারী অস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়াকে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিশন কেন্দ্রে গিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের খসড়া প্রস্তুত করার প্রস্তাব দেন। কালুরঘাট এলাকা তাদের দখলে ছিল। মাহমুদ জানান যে, রেডিও স্টেশনে কর্মরত অনেক কর্মকর্তা ও প্রকৌশলী তার পরিচিত। স্বাধীনতার ঘোষনা সম্প্রচারে সহায়তা করার জন্য কর্নেল অলি ঐ সকল কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিশন কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য মাহমুদকে অনুরোধ করেন। তিনি সাথে সাথে একটি মাইক্রোবাসে নিয়ে চলে যান এবং দুপুর ১টায় বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল কাশেম চৌধুরী, আবদুলণ্ঢাহ আল ফারুক, কাজী হাবিব উদ্দিন আহমেদ, জাহিদুর হোসাইন, আমিনুর রহমান, সৈয়দ আবদুল সরকার, শাকুজ্জামান, মোস্তাফা আনোয়ার এবং রেজাউল করিম চৌধুরীকে নিয়ে ফুলতরায় ফিরে আসেন।

অন্যান্য অনেক সহকর্মীর তুলনায় ক্যাপ্টেন অলির কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। কারণ তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক এবং ঐ অঞ্চলের সকল সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদেরকে সমর্থন করেন এবং বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেন। তখনও তারা কালুরঘাট হতে ১০ কিলোমিটার দূরে পটিয়া পুলিশ স্টেশনে অবস্থান করছিলেন। দুপুর ২.০০ ঘটিকায় জিয়া এবং অলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাইভেট ব্যবস্থা করা জিপে চড়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যান। অলি অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য পথিমধ্যে ফুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেন। মেজর জিয়া অলিকে স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া পত্রটি চূড়ান্ত করার জন্য বিকেল ৫ টার মধ্যে বেতার প্রেরণ কেন্দ্রে আসার কথা বলে, মাহমুদ ও রেডিও স্টেশনের স্টাফদের নিয়ে বেতার প্রেরণ কেন্দ্রে চলে যান। অলি ২.৩০ মিনিটে তার হেড কোয়ার্টারে পৌছে বোয়ালখালি থানার কিছু বেসামরিক অফিসারকে ডেকে আনেন। তাঁর নতুন হেড কোয়ার্টার গুছিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেন। তাদের সহযোগিতায় বিকেল ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ গার্ড ও টেলিফোন সংযোগসহ তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়। আনুমানিক বিকেল ৪.৩৫ মিনিটে তিনি প্রাইভেট জিপে চড়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে কালুরঘাট রেলওয়ে ব্রিজের নিকট মেজর শওকত ও ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে দেখে তিনি বিস্মিত হন। কারণ তাদের শহরের অভ্যন্তরে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার কথা। তারা অলিকে জানান যে, গত রাতে তারা রেলওয়ে ব্রিজ পার হতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আজ রাতে তারা তা করবেন। তিনি ফিরে এসে শেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে ঐ স্থানে অবস্থান করতে বললেন। তাদের হয়ত বা কক্সবাজার যাবার প্রয়োজন হতে পারে। বেতার কেন্দ্রে যাবার প্রাক্কালে জিয়ার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ায়, তারাও

স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনার কথা জানতেন। ৫.১৫ মিনিটে অলি রেডিও স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে জিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছেন। জিয়া উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন। আসল খসড়ার বিষয়বস্তু ছিল ঃ "আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং নিজকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করছি।" এই ঘোষণায় জিয়া সকল বাঙালি সেনা অফিসার, সৈনিক, প্যারামিলিটারি, পুলিশ, আনসার এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৫/২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তিনি এ ব্যাটালিয়নের অফিসারদের নামও ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণসমর্থন ও বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন পিআরও, সিদ্দিক সালিক ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে বদলি হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তিনি নিয়াজির আত্মসমর্পণ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন এবং তার নিজের লেখা গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করেন–

"বিদ্রোহী সেনারা প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত সাফল্য লাভ করে। তারা ফেনীর নিকটবর্তী শুভপুর ব্রিজ ধ্বংস করে কার্যকরভাবে কুমিলণ্ঢাগামী রাস্তায় প্রতিরোধবুহ্য গড়ে তুলে। চট্টগ্রাম শহর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সিংহভাগ এলাকাও তারা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। সরকারি কর্তৃপক্ষের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল ২০-বেলুচ রেজিমেন্টের এলাকা এবং নৌবাহিনীর জাহাজ। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সুকৌশলে কয়েকদিন পূর্বে ঢাকা নিয়ে যাওয়ায় তার অনুপুস্থিতিতে ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহী সেনাদের নেতৃত্ব দেন। সরকারি বাহিনী রেডিও স্টেশন ভবন কড়া পাহারায় নেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। মেজর জিয়া ভিন্ন স্থানে অবস্থিত কাপ্তাই রোডে রেডিও ট্রান্সমিটারের নিয়ন্ত্রণ নেন এবং **'স্বাধীনতার ঘোষণা'** সম্প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করেন। চট্টগ্রামে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। (সালিক, ১৯৭৭ ঃ ৭৯-৮০)।"

রেহমান সোবহানের মন্তব্য, ***"২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগন এবং পরে সারা বিশ্বের মানুষ একজন অপরিচিত মেজরের কণ্ঠ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পায়।"*** (সোবহান, ১৯৯৩ ঃ ৩৩)

অলি সতর্কতার সাথে খসড়া ঘোষণা পড়েন। তিনি অনুভব করেন যে, ঘোষণার প্রথম লাইনে যদি রেডিওতে জিয়াকে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রস্তুতিরত অনুসারীরা অসহযোগিতা করতে পারেন। তাছাড়া, বাঙালি সেনা অফিসারদের কোন রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। তারা শুধু

সমগ্র জাতিকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের সীমাহীন হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচাতে এবং রাজনীতিক নেতাদের ব্যর্থতা ও শূণ্যতা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলির নয় বরং স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ -এর পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে বাঙ্গালী অফিসারেরা এবং সেনারা যুদ্ধ করেন, তখন এ কথা দৃঢ়ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়।

সে সময় গৃহীত পদক্ষেপের উদ্দীপনা বর্ণনা করতে গিয়ে সুখান্ত সিং তাঁর বইয়ে লিখেন যে, ***"ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে একজন বাঙালী অফিসার, মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনি অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। বস্তুত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থকরা এ ঘোষণাকে স্বাগত জানান। কিন্তু শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতাদের ভাগ্য তখনও অজ্ঞাত থেকে যায়"*** (সিং, ১৯৮০ ঃ ৯)। তাদের এ ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালি সেনা অফিসারগণ রাজনীতিক নেতাদের অসন্তুষ্ট করতে চান নি। অন্যদিকে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ারও আবশ্যকতা ছিল।

সুখান্ত সিং আরও বলেন '' সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত ব্যাটালিয়ান ৮ম ই বি আর তাদের কমান্ডিং অফিসারকে হত্যা করেন এবং সহ-অধিনায়ক মেজর জিয়ার নেতৃত্বে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন। তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করেন এবং সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। জিয়ার সাথে ছিল ই পি আর এবং ই বি আর সি এর সৈনিকগণ। তারা সম্মিলিতভাবে ই বি আর সি লাইনে শক্তভাবে অবস্থানরত ২০ বেলুচ রেজিমেন্টে সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরে তাঁরা অবাঙালি এলাকাগুলো ধ্বংস করে পুরো চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেন। বাংলাদেশের সংরক্ষিত বাজারের সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর ২২টি পরিবারের কেউ কেউ টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা বাঙালিরা ধ্বংস করে দেন। (সিং, ১৯৮০ ঃ ১০)

স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে একতাবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করাই ছিল বাঙালি সেনা অফিসারদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। এ চিন্তা মাথায় রেখে পরবর্তীতে তারা খসড়ার প্রথম বাক্যটি সংশোধন করেন। বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকে। সংশোধিত বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আশীর্বাদে নিজকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করছি।"

বাংলাদেশের এক সময়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ সামসুল হক তার গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করেন- ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বন্ধুময় মানসিকতার প্রতিফলন ঘটান। নিচে অংশটুকু উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল ঃ

"ইতোমধ্যে আপনার দেশের ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার সমুজ্জ্বল অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গেছে। যেদিন থেকে আপনি আপনার দেশের সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, সেদিন হতে জনগণের কল্যাণ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য আপনি একজন নিবেদিত প্রাণ এবং নেতা হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রভূত সুনাম ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।"(হক, ১৯৯৩ঃ ৯৬)

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্র হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ সময় ক্যাপ্টেন অলি তাঁর পাশে ছিলেন। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা প্রতি ১ ঘণ্টা পর পর লে. শমশের মুবিন চৌধুরী বাংলা ও ইংরেজিতে এ ঘোষণা বার বার প্রচার করেন। লে. শমশের মুবিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। লে. শমশের মুবিনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার পর জিয়া ও অলি বেতার কেন্দ্র ত্যাগ করেন আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটে তাঁরা কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে পৌঁছেন এবং শওকত ও খালেকুজ্জামানের সাথে সাক্ষাত হয়। অলি উপলব্ধি করতে পারেন যে, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ উপকরণ ছাড়া একাকি তাদের যুদ্ধ করাটা পাগলামি হবে। তিনি মেজর জিয়া, মেজর শওকত ও ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। তাঁরা সবাই একমত যে, বহির্বিশ্বের সাহায্য ছাড়া ৩০/৪০ দিনের বেশি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। মাহমুদকে ২৭ এবং ২৮ মার্চ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে ৭ম নৌবহরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কক্সবাজার যেতে বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ কক্সবাজার সড়কে ডুলাহাজারা নামক স্থানে ঐ এলাকার লোকজন সন্দেহবশতঃ তাকে হত্যা করায়, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আশ্বস্ত, জাতিকে দিক নির্দেশনা ও জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তোলে এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ঝিমিয়ে পড়া রাজনীতিক আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলে। জনগণ বুঝতে পারেন কি করতে হবে বা কোথায় যেতে হবে? **জিয়ার**

ঘোষণা "অনেকেই শুনতে পান এবং লোকমুখে এই ঘোষণার কথা সবার কাছে পৌছে যায়।" (জ্যাকোব, ১৯৯৮ ঃ ৩৪)।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে। যুদ্ধারম্ভের প্রক্কালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর প্রত্যয় ও নিবিড় আনুগত্য ছাড়া মূলতঃ বাঙ্গালী অফিসারদের নিকট অন্যকোন যুদ্ধ উপকরণ ছিল না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নৃশংসতা তাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাহসী করে তোলে। জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে অনেক বাঙালি সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক লোকজন দেশব্যাপী শতশত ছোট দলে সংঘটিত হয়ে, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। অধিকাংশ সিনিয়র রাজনীতিক নেতা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারত পাড়ি জমান। অন্তত বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব পূর্ব পাকিস্তানের ঐসব মানুষ পালনের সুযোগ পান, যারা দীর্ঘ ৯ মাস বিভীষিকাময় অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেদনাদায়ক সময় অতিক্রম করেছেন। বাংলদেশের ইতিহাসের এ অধ্যায়ের অসাধারণ অনন্যতা এই যে, অধিকাংশ ক্যাপ্টেন ও মেজর পদমর্যাদার সেনা অফিসারগণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা রাজনীতিক নেতাদের পালন করা উচিত ছিল। তারুণ্যপূর্ণ, কিন্তু সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এসব অফিসারগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা পালন করতে ব্যর্থ হন নি। অন্যদিকে রাজনীতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হল তখনই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। জাতির সামনে তখন একটাই পথ- স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এ অধ্যায়ে পূর্বে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীর পক্ষের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অসম্ভাবনীয়ভাবে সর্বাত্মক বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। যদি রাজনীতিক দলসমূহের সম্মিলিত, সংগঠিত জাতীয় প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে রাজনীতিক সহযোগিতা আসতে থাকে কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের পূর্বে নয়। তখনও পর্যন্ত সামরিক অফিসাররাই ছিলেন আন্দোলন পরিচালনা ও সমন্বয়কারীর ভূমিকায়। এমনকি জাতীয় স্বাধীনতার তিন দশক পরেও এসব অন্তর্নিহিত কথাগুলো অপ্রকাশিত রয়েছে। যার মাধ্যমেই শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভিক বিবরণ জানা সম্ভব।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়

উপকূলীয় এলাকা রক্ষা, নতুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ এবং সংগঠনের জন্য মেজর শওকত এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে কক্সবাজারের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন অলি নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ

ক) যেহেতু যুদ্ধ উপকরণ অত্যন্ত সীমিত তাই তারা গেরিলা কৌশল, ওঁতপাতিয়া অতর্কিত আক্রমন এবং রক্ষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

খ) চট্টগ্রাম শহরের অভ্যন্তরে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ এবং বিভিন্ন স্থানের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ৫/৬ টি অবস্থানে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

গ) সাধারণ জনগণ এবং বিশেষভাবে আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

ঘ) তাঁরা রেডিওতে আরও একটি ঘোষণা সম্প্রচার করবেন, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং মেজর জিয়াকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ ঘোষণার কথা থাকবে।

বাংলাদেশি বাহিনী সুসজ্জিত ছিল না, তবে তারা সাহসী, অতর্কিত এবং গেরিলা আক্রমণে দক্ষ ছিলেন। ফলে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর মনে ভীতির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। যাহাহউক পরিষ্কার রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা, অস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণের অব্যাহত সরবরাহ ছাড়া তারা তাদের কর্মকান্ড ধরে রাখতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁরা ই পি আর-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন রফিকের কোন খোঁজ খবর পান নি। তিনি কোথায় আছেন তাও জানতে পারেন নি। ক্যাপ্টেন অলি চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠান। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁরা তাঁর কোন খুঁজ পান নি। পরবর্তীকালে তিনি জানতে পারেন যে, ক্যাপ্টেন রফিক একা চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ভারতের সীমান্তবর্তী রামগড় নামক একটি ছোট শহরে চলে গেছেন। তিনি সম্ভবত প্রতিবেশী দেশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। যাই হোক, তার প্রস্থানের কারণে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না এবং ক্যাপ্টেন রফিক খবর দিয়েও যান নি। ফলে তার ই পি আর সৈনিকদের অনেকে ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। ঐ পর্যায়ে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু তাদের পরিচালনার জন্য আরও অফিসার প্রয়োজন ছিল।

পরিপূর্ণ যুদ্ধোদ্যোগ পর্ব

শহরের বিভিন্ন অংশে অপারেশনে সৈনিকদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য, বাঙালি সেনা অফিসাররা চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাতে থাকেন। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৫ থেকে ৭ জন বাঙালি অফিসার ছিল। কিন্তু তাদের পাওয়া যাচ্ছিল না। আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা, ক্যাপ্টেন মুসলিম বহুকষ্টে এমবারকেশন হেড কোয়ার্টার থেকে পালিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের উত্তরে হাটহাজারি নামক স্থানে একটি ছোট দলগঠন করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুইয়া তার ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮/২৯ মার্চ স্বপরিবারে একটি গাড়িতে চড়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারত চলে যান। চট্টগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার চলে যাবার এ ঘটনা সবাইকে বিস্মিত ও মর্মাহত করে।

ক্রমান্বয়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কিছু কিছু সেনা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। অনেকে দ্রুত চট্টগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নিজ নিজ জেলায় চলে যান। তাঁদের চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত: তাঁরা এ যুদ্ধের শেষ পরিণতির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। দ্বিতীয়ত: গেরিলা যুদ্ধের আলোকে তারা নিজ নিজ এলাকায় যুদ্ধ করাই শ্রেয় বলে মনে করেন। কারণ সেখানকার ভূ-প্রকৃতি ও লোকজন তাদের নিকট পরিচিত। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ খুবই কঠিন ছিল। বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত সেনাদের কোন টেলিফোন বা ওয়ারলেস ছিল না। কারা কোথায় যুদ্ধ করছে তা জানা খুব কঠিন ছিল। ৮ম ইষ্ট বেঙ্গলের শুধু ৭ জন অফিসার এবং ই পি আর-এর ক্যাপ্টেন হারুন চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ চট্টগ্রাম শহরের কিছু এলাকায় প্রচন্ড যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বাঙালি সৈনিক এবং কয়েকজন বাঙালি অফিসার যুদ্ধে অনবদ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অনেক পাকিস্তানি সৈনিক নিহত হয়। কিন্তু সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১ম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কিছু সৈনিক C- ১৩০[৩]-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন জায়গায় অবতরণ করে। এই অভিযানে ১ম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ও এডজুট্যান্ট নিহত হয়। বেলা ২টায় ক্যাপ্টেন অলি শহরের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে মেজর জিয়াকে অবহিত করেন এবং পরিকল্পনা পরিবর্তনের অনুরোধ করেন। অলি জিয়াকে একটি নতুন ঘোষণা দেয়ার জন্য রাজি করান। উভয়ে কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বের হন এবং একটি ঘোষণার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করেন। বিকেল ৫টায় জিয়া ঘোষণাটি পাঠ করেন ***"আমি মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ইন-চিফ ঘোষণা করছি এবং***

[৩] সেনা সদস্যদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের উড়োজাহাজ।

শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছি।" গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য দ্বিতীয় ঘোষণাটি দেয়া হয়।

ঘোষণাটি সম্প্রচার করার পর জিয়া এবং অলি একটি জিপে হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসেন। পথিমধ্যে প্রায় ১ পণ্টাটুন পাকিস্তান সেনা বাহিনীর কমান্ডো তাঁদের আক্রমণ করে। কমান্ডোরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তাঁরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেন। ক্যাপ্টেন অলি তাঁর জীবনে বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হন এবং তিনি মনে করেন চূড়ান্ত সময় একমাত্র আলণ্টাহই জানেন। তিনি এবং তার সঙ্গীরা বাঙালিদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত এবং বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধ করছেন, এটি এমন একটি উদ্দেশ্য যা ইতিহাস থেকে সৃষ্ট এবং ইতিহাসের দ্বারা লালিত।

৩০শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় মেজর জিয়া অলিকে অবহিত করেন যে অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করার লক্ষ্যে সত্তর তিনি রামগড় যাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন। সময়োচিত রাজনীতিক সিদ্ধান্তের অভাবে তাঁরা চট্টগ্রাম সেনানিবাস ও নৌবাহিনীর এলাকা দখল করতে পারেন নি। তাছাড়া বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী প্রধান ব্যক্তিত্বের একজন, লে. কর্নেল এম. আর চৌধুরীকে[৩] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে হত্যা করা হয়েছে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা উন্নত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত এবং প্রচুর অস্ত্রে সজ্জিত। অন্যদিকে তাদের প্রতিহত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন অব্যাহত অস্ত্র সরবরাহ। মেজর জিয়া সংকটের তীব্রতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তবুও তিনি খুব স্বাভাবিক থাকতেন। যদিও তখন জিয়া তার স্ত্রী-পুত্ররা কোথায় আছেন জানতেন না। ক্যাপ্টেন অলি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে জিয়া তার পরিবার সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। তার সমস্ত চিন্তা যুদ্ধকে ঘিরে। অলি তাকে দেখতেন শান্ত ও ধীরস্থির কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সদা তৎপর।

মেজর জিয়া প্রস্তাব রাখেন যে, যতদিন মেজর শওকত কক্সবাজার থাকেন ততদিন অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব অলির হাতে থাকা উচিত। মাত্র ২০ জন সৈন্য নিয়ে মেজর জিয়া রামগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট। তিনি অলিকে চট্টগ্রাম জেলার যুদ্ধের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পন করেন।

---

[৩] ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকার উপর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে উলেণ্টখ করা হয়, ''লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামে উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারদের একজন যিনি সশস্ত্র বিপণ্টবের কথা চিন্ড়া করেন ঃ যদি শেখ মুজিবের নিকট থেকে ঐ ধরনের কোন ডাক আসে।"

পরবর্তীতে অলি জানতে পারেন যে, ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ যে সকল শত্রু সেনা তাদের উপর যারা আক্রমণ করেছিল তারা বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী একটি ভবনে অবস্থান নিয়েছে। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ শত্রুদের এই কমান্ডো পণ্টাটুনের অবস্থানে আক্রমণের জন্য লে. মাহফুজ এবং সুবেদার আবদুল আজিজকে নির্দেশ দেন। সম্ভবত এটাই ছিল তাদের প্রথম প্রকৃত যুদ্ধ এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা। লে. মাহফুজ এবং তার দল পাকিস্তানি কমান্ডোদের নিদারুণভাবে পরাজিত করে এবং শত্রুদের অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ, ইউনিফরম, ওয়্যারলেস সেট দখল করে নেন। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ সকাল ৮.০০ ঘটিকায় এসব উপকরণ ফুলতলা হেড কোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন অলির নিকট হস্তান্তর করা হয়। এটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি বিশাল বিজয়। লে. মাহফুজ এবং তার দল সত্যিই বীরোচিত সাহসিকতা দেখান। একই দিন সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম কলেজ ও হালিশহর এলাকায় অবস্থানরত বাঙ্গালী সৈন্যদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও বাঙ্গালী সেনারা আক্রমণ প্রতিহত করেন। শত্রুদল যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ভারতীয় বিএসএফ সর্তক ছিল। এবং ভারত সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিল। বাংলাদেশের শরনার্থীরা আশ্রয়ের জন্য ভারত সীমান্তে ভিড় জমাতে থাকে। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা নিষ্ঠুরভাবে নির্দোষ বেসামরিক লোকদের হত্যা করতে শুরু করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ছাত্রবাসে আক্রমণ করে শত শত ছাত্র হত্যা করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবনেও প্রবেশ করে এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান, দার্শনিক গোবিন্দ সি দেব, প্রফেসর আবুল খায়ের ও প্রফেসর মুনির চৌধুরীসহ কমপক্ষে ১৫ জনকে হত্যা করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে বসবাসরত প্রায় ৫০,০০০ নির্দোষ মানুষ প্রাণ হারায়। যাদের অধিকাংশই বস্তি এলাকায় বসবাস করত (আলী ১৯৭৩ ঃ ৯৪)। অলি ই পি আর এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে মাঝে মাঝে জিয়ার সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তাঁকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করতেন। মেজর জিয়া নিশ্চুপ বসে থাকার লোক ছিলেন না। তিনি উত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, এবং কুমিলণ্ডা জেলার বিভিন্ন অংশে মুক্তিযোদ্ধ সংগঠিত এবং মুক্তিবাহিনী সংগঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মেজর জিয়া তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। তিনি ই পি আর জোয়ানদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম শহবের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। অকুতোভয় কমান্ডার এবং সৈনিকরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। অলি ছাড়া আর কেউ মেজর জিয়ার অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত অলি জিয়ার অন্যত্র চলে যাওয়ার বিষয় প্রকাশ

করলেন না। কারণ জিয়ার অনুপস্থিতির সংবাদ সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারত। সৈনিকদের খাদ্য, অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ এবং সর্বোপরি তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা অলির একার জন্য একটি বিশাল দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। অলি সকল কমান্ডারদের বুঝিয়ে বললেন যে ধীরে ধীরে পাকিস্তানি হানাদারদের শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং বেশি যুদ্ধোপকরণ ব্যবহার না করে যতসম্ভব প্রাণহানি ঘটাতে হবে। ৩১ মার্চ হতে অলি জিয়ার পক্ষ থেকে কার্য পরিচালনা শুরু করেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী রামগড়ে জিয়ার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়া। যাতে করে পুনর্গঠন, পুনঃএকত্রিকরণ এবং ভারত থেকে আরও কিছু সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা করা যায়।

এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হারুন, লে. মাহফুজ এবং লে. শমশের মুবিন চৌধুরী তাঁদের দলবল নিয়ে কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীরে কালুরঘাটে রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেন। মেজর জিয়া ৪-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মতিনকে তার কোম্পানিসহ চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে সীতাকুন্ডে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেন। ক্যাপ্টেন মুসলিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে শহর থেকে বিতাড়িত করে শহরের বাইরে তিন দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করেন। মুক্তিযোদ্ধারা সাফল্যজনকভাবে শত্রুসেনার শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করতে সক্ষম হন। পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় লোকদের কোন সহায়তা না পাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

এটা পরিস্কার যে , ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র এলাকা ৮ম-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অলি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে তাঁদের অতর্কিত হামলা এবং আক্রমণ সফল হচ্ছিল। তবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাইরের সাহায্য ছাড়া কতদিন যুদ্ধের চাপ সামলাতে পারবেন, এ বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অধিকন্তু মেজর জিয়া ফিরে আসতে পারছিলেন না। তিনি ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী একটি মধ্যবর্তী কেন্দ্রে অবস্থান করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি এ তিনটি বৃহত্তর জেলার যুদ্ধ সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। অলি তাঁর সাথে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করতেন। নিয়মিতভাবে না হলেও ৬ এপ্রিল থেকে তারা বিএসএফ-এর নিকট থেকে কিছু কিছু অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ পেতে থাকে। মেজর জিয়া রামগড় যাওয়ার পর হতে এবং বিশেষ করে ফুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালী সেনারা না যাওয়া পর্যন্ত ক্যাপ্টেন অলি সামগ্রিক বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল হানাদার বাহিনী কোর্ট বিল্ডিং এবং স্টেট ব্যাংক এলাকার প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে হামলা চালালে উভয় পক্ষের বিপুল প্রাণহানি ঘটে। এই যুদ্ধে সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর ১০জন সৈন্য প্রাণ হারায়। ৩ থেকে ৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের রাস্তায় অবিরাম ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল দখলদার বাহিনী ট্যাংকসহ চকবাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং লে. শমশের মুবিন অসম সাহসিকতার সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে শত্রুদের প্রচুর প্রাণহানি ঘটে এবং এতে ৫ জন মুক্তিযোদ্ধ প্রাণ হারায়। ৭ এপ্রিল পাক-বাহিনী কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রে আক্রমণ করে। বাঙালি সেনারা সেখান থেকে পশ্চাদ দিকে চলে যায়। ৭ মার্চ মেজর শওকত এবং ক্যাপ্টেন খালেক কক্সবাজার থেকে ফিরে আসেন। ৮ এপ্রিল থেকে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থান পরিদর্শন করেন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীরবর্তী স্থানে অবস্থানরত অন্য দলের সমর্থনে নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান নেন।

মেজর শওকত ক্যাপ্টেন অলির নিকট থেকে চট্টগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল মেজর শওকতের নেতৃত্বে এক পণ্ঢাটুন সৈন্য কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের পশ্চিমদিকে কৃষি ভবনে অবস্থানরত শত্রুদের অবস্থানে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের পরাজিত করে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এটা ছিল তাঁর এবং তাঁর সৈনিকদের একটি বীরোচিত অভিযান। এই যুদ্ধে ৩০ জন পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণ হারায়। ফুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হেড কোয়ার্টার এবং তাই এটি ছিল শত্রুদের লক্ষ্যবস্তু। ১১ এপ্রিল সকাল ৬.০০ ঘটিকায় পাকবাহিনী আর্টিলালির সহযোগিতায় কালুরঘাট ব্রিজ এলাকা আক্রমণ করে। সারাদিন ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। সন্ধ্যার মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি সেনাদের ঘিরে ফেলে। বোয়ালখালী এবং পটিয়ার সাধারণ মানুষও নিরাপদ ছিল না। বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। অলি ভাবলেন এখানে অবস্থান করা আত্মঘাতী ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ ছিল না। আরও একটি বিপদ ছিল যে; তাদের জোর করে যদি বার্মা সীমান্তের দিকে নিয়ে যায় তা হলে তারা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানি সেনাদের ঐ এলাকার বাড়িঘরে আগুন দেয়ার পরিকল্পনাও ছিল। যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় সেখান থেকে তাঁদের সরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বেসামরিক লোকজন যেন মারা না যায় সেজন্য মেজর শওকত এবং ক্যাপ্টেন অলি সকল সৈনিকদের ঐ জায়গা থেকে পিছনের দিকে সরে পড়ার নির্দেশ দেন

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল ক্যাপ্টেন অলি তার ডায়েরিতে লিখেন ''কালুরঘাট ব্রিজ ত্যাগ করা হল, গণহত্যা এড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ বাহিনীকে বান্দরবান, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এবং মহালছড়ি হয়ে রামগড় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বোয়ালখালী ও পটিয়া অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা। পাকিস্তানিদের হাতে শত শত বেসামরিক লোক মারা পড়তে পারে। যদি এই সন্ধ্যার মধ্যে সরে পড়তে না পারি এবং আর যদি পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে বসে, তবে পাহাড়ি এলাকায় আমার বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে।" সুতরাং অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের নতুন সরবরাহের জন্য তাঁরা রামগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১১ এপ্রিল রাতে অলি, শওকত, মাহফুজ এবং খালেকুজ্জামান তাদের দলবলসহ বান্দরবান, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, মহালছড়ি এবং মাটিরাঙ্গার দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পার্বত্য রাস্তা দিয়ে রামগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁরা মনোবল হারান নি। পাক-বাহিনীর পাশবিক বর্বরতার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। হানাদার বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম লুটপাট করছে। নির্বিচারে ঘরবাড়ি ও শস্যক্ষেতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা অগণিত নারীকে ধর্ষণ, হত্যা এবং হাজার হাজার নির্দোষ বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করে (চৌধুরী এবং কবির; ১৯৯১)। পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা এত বর্বর ছিল যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত লে. জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজি নিজেও তার সৈনিকদের পাশবিক নির্যাতনের কথা স্বীকার করেন। (পরিশিষ্ট ঃ ৬ দেখুন, নিয়াজি, ১৯৯৮ ঃ ২৮২-২৮৩, এছাড়াও দেখুন হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭১।)

ফারুক আজিজ খান এই বিভীষিকাময় দিনগুলোকে নিম্নবর্ণিতভাবে বর্ণনা করেন–

"যে সকল পাঠক ২৫ মার্চ রাতে এবং পরবর্তী মাসগুলোতে বাংলাদেশে ছিলেন না তারা ৭৫ মিলিয়ন বাঙালি কি নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, ঐ দিনগুলো কাটিয়েছেন তা অনুধাবন করতে পারবেন না। ইয়াহিয়ার লেলানো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং তাদের ধর্মন্মোক্ত বাঙালি দোসরদের অত্যাচার নির্যাতনের বর্ণনা ইতিহাসে পড়া কিংবা সিনেমায় দেখা ঘটনাকেও হার মানায়। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তা আমার নিজের বর্ণনায়ও সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে আমি ব্যর্থ। কলম তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকালীন ৯ মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যা করেছে তার চিত্র কলমের সাহায্যে সঠিকভাবে তুলে ধরা যাবে না।" (খান, ১৯৯৩ ঃ ৬১)।

মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এবং লে. মাহফুজ রামগড় অভিমুখে পাকিস্তানি সৈন্যদের অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য মহালছড়ি থেকে যান। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল ক্যাপ্টেন অলি রামগড় পৌঁছেন এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য জিয়ার সাথে সাক্ষাত করেন।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিজয়ের অনুভূতি

মেজর জিয়া যখন অলিকে মীরসরাইয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন তখন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ধাপ শুরু হয়। পাকিস্তান বাহিনী সীতাকুন্ডে একটি বড় আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। এ খবর জিয়াকে সাংঘাতিকভাবে পীড়িত করে। তিনি বুঝতে পারেন যে, আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত তাদের বাহিনীর সাংগঠনিক দক্ষতা হয়তো ছিল না। মীরসরাইয়ের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। কৌশলগতভাবে এ জায়গাটি চট্টগ্রাম এবং কুমিলণ্ঢা সেনানিবাসের মধ্যে অবস্থিত। ১৩ এপ্রিল গভীর রাতে জিয়া অলিকে ডেকে পাঠান এবং শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রা বন্ধ করার লক্ষ্যে মীরসরাইয়ের দিকে তাকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। অভিযানের নেতৃত্ব দিতে অলি রামগড় থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে মীরসরাই পৌছেন।

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল ক্যাপ্টেন অলি এবং তাঁর সেনাদল মীরসরাইতে অবস্থান নেয়। তাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ এমন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন শত্রু সেনারা যেন তার পাতা ফাঁদের মধ্যে এসে ঢুকে কারণ পাকিস্তানের মত একটি সুসজ্জিত এবং উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শত্রু-বাহিনীর সাথে স্বল্প অস্ত্র ও যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। অলির একমাত্র সুবিধা ছিল যে, এলাকার রাস্তাঘাট তাঁর পরিচিত। এ অভিযানের জন্য তার কাছে ২ পণ্ঢাটুন প্রাক্তন ই পি আর এবং ১ পণ্ঢাটুন নতুন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল। হাবিলদার সিদ্দিকের নেতৃত্বে তার কোম্পানির সাহায্যার্থে একটি ৩´´ মর্টার ছিল; এছাড়াও ল্যান্স নায়েক আবুল হোসাইনের অধীনে একটি মেশিনগান এবং ২-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে প্রাপ্ত একটি ৭৫ মি.মি. রিকয়েলেস রাইফেল ছিল। অন্যদিকে সীতাকুন্ডে অবস্থানরত পাকিস্তানি ব্রিগেড সব ধরনের ভারী ও হালকা মেশিনগানে সজ্জিত ছিল।

কিন্তু এ প্রবল প্রতিপক্ষও অলির নির্বিশঙ্ক উদ্দীপনা এবং তেজস্বীতার নিকট পরাজিত হল। তাদের সাথে অলি যোগ দেওয়ার পর সৈনিকরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠে এবং পুনরুজ্জীবিত শক্তি ও প্রবল উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি গ্রহন করে। তিনি সতর্কতার সাথে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং যুদ্ধের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

তিনি লাহোর সেনানিবাসে লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় শেখা প্রতিরক্ষামূলক গোপন কৌশল অবলম্বন করলেন। শত্রুরা বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত অলি শত্রুদের গতিবিধি ও আচরণ লক্ষ্য করলেন। নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে অলি ২০ এপ্রিল সকালে তার কোম্পানির বিভিন্ন অবস্থানে যেতে শুরু করেন। তাঁর দেহরক্ষী ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক ফয়েজ আহমেদ তাঁর সাথে ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন যে পণ্টাটুন কমান্ডার সুবেদার সিরাজুল ইসলাম এবং পণ্টাটুন হাবিলদার তাঁদের সৈনিকদের সাথে স্ব-স্ব ট্রেঞ্চে নেই। সৈন্যরা সঠিকভাবে বিভিন্ন ট্রেঞ্চে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে কিনা দেখার জন্য তিনি সব ট্রেঞ্চে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অলি সকল সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ নিজ ট্রেঞ্চে গিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এবং কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে তার সরাসরি নির্দেশ ব্যাতিরেখে নিজ অবস্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দেন।

তিনি প্রধান সড়কে উঠার সাথে সাথে দ্রুত গতিতে একটি মাইক্রোবাস তাদের অবস্থানের দিকে আসতে দেখেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। মাইক্রোবাসটির পিছনে পিছনে একটি ৩ টন ট্রাক ছুটে আসতে দেখেন। পরবর্তী ঘটনাগুলো খুব দ্রুত সংগঠিত হয়। ৩ টন ট্রাকটির পিছনে আরও ২০টি পাকিস্তানি সেনা-বোঝাই ট্রাক মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষণাত্মক অবস্থানের মধ্যেই ঢুকে পড়ে। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানিদের সামরিক শক্তি ছিল অনেক বেশি। অলি অতর্কিতে অপ্রস্তুত এবং হতভম্ব অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুর উপর আক্রমণ করলেন। তিনি তার বাহিনীকে শত্রুদের গাড়ীর উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ২-ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ল্যান্স নায়েক আবুল হোসাইন মেশিনগানের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে সবচেয়ে পিছনের গাড়িটি ধ্বংস করে দেন। শত্রু সেনারা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হাবিলদার সিদ্দিকও শত্রুদের গাড়ীর উপর ৩´´ মর্টারের কয়েকটি গুলি ছোড়েন। গুলিগুলো লক্ষ্যভেদী ছিল বিধায় শত্রুরা পালাবার পথ পেল না। হাবিলদার সিদ্দিক ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। অন্যান্য সৈনিকরাও ক্ষিপ্রতার সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয় দিক থেকে সমন্বিতভাবে গুলি চালায়। অধিকাংশ শত্রু সেনারা নিজ নিজ গাড়ির ভিতরেই মারা পরে। পাকিস্তান আর্টিলারী ইউনিট এবং মর্টার পণ্টাটুন পাল্টাগুলি ছুড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক অবস্থান তাদের জানা ছিল না বিধায় তাদের পাল্টাগুলি খুব বেশি ক্ষতি সাধন করতে পারে নাই। শত্রুরা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষণাত্মক অবস্থানের বৃত্তাকার ফাঁদে পড়ে। সামনে বা পিছনে কোন দিকেই গাড়ী চালানো সম্ভব ছিল না। অলি তার যুদ্ধ পরিকল্পনার সাফল্য দেখে খুশি হলেন। এই যুদ্ধে তিনি নিজে ৭৫ মি. মি. আর. আর এর সাহায্যে শত্রুদের ৩টি গাড়ী ধ্বংস করেন।

বিকেল ৩টার দিকে ঐ এলাকায় সুবেদার সাইদুলের নেতৃত্বে অন্য একটি প্রাক্তন ই. পি. আর পণ্টাটুন শত্রুদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৩" মর্টার শেলের একটি স্প্লিণ্টনটার বুকে আঘাত হানলে ই. পি. আর এর ল্যান্স নায়েক আবুল কালাম ঘটনা স্থলেই মারা যায়। এই অকুতোভয় সৈনিক সেই সব দেশপ্রেমিকদের একজন যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বেলা ২ টার দিকে হাবিলদার সিদ্দিক বুকে বুলেট বিদ্ধ হন। তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এবারই হয়তো প্রথম শত্রুবাহিনীর একটি শক্তিশালী রেজিমেন্ট গোলাবারুদসহ মুক্তিবাহিনীর ফাঁদে পড়ে এবং ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। এই যুদ্ধে ১৫০ জনেরও বেশী শত্রু সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরও অনেক এবং কমপক্ষে ৮টি গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। পরে, অলি সৈনিকদের রাতের অন্ধকারে মাস্তাননগরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মাস্তাননগর ছিল তাদের পরবর্তী ডিফেন্সিভ পজিশন।

মীরসরাইয়ের যুদ্ধ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনে আশার সঞ্চার করে। শত্রুদের শক্তি যাই হোক না কেন, মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মোকাবেলা করার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। তাঁরা জানতেন যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শত্রুরা পাল্টা আক্রমণ করবে। এক্ষেত্রে শত্রুরা অবশ্যই পুনর্গঠিত হবে এবং তাদের পক্ষে অপ্রতুল গোলাবারুদ নিয়ে মীরসরাইয়ের এই ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে শত্রুদের প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। তাই অলি মীরসরাই থাকা বোকামী মনে করলেন। উত্তর দিকে আর একটি ডিফেন্সিভ পজিশন তৈরী করতে অলি সৈনিকদের নিয়ে মাস্তাননগরের পার্বত্য এলাকার দিকে সরে আসেন। সিভিলিয়ানদের মধ্যে মোশাররফ হোসেন এম.পি.এ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তার ভূমিকা প্রশংসনীয়। মীরসরাই যুদ্ধে একজন সৈনিক প্রাণ হারায় এবং ৫ জন আহত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়

১৯৭১ সালের ২০এপ্রিল মীরসরাই থেকে উত্তর দিকে সরে গিয়ে ক্যাপ্টেন অলি এবং ক্যাপ্টেন মতিন মাস্তাননগরের অনুচ্চ পাহাড় দখল করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে। ক্যাপ্টেন মতিন তার দলবল নিয়ে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থান নেন। অন্যদিকে অলির কোম্পানি রাস্তার পূর্ব পাশে ছোট ছোট পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। মেজর জিয়া ২১ এপ্রিল সকাল ১০.০০ টায় তাদের অবস্থান পরিদর্শন করার জন্য

আসেন এবং আধ ঘন্টা পর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকার যুদ্ধ সমন্বয় করার জন্য তার রামগড় হেডকোয়ার্টার চলে যান। ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল আনুমানিক সকাল ১১.০০ টায় শত্রুবাহিনী আর্টিলারী এবং ট্যাংক সহকারে তাদের অবস্থানে আক্রমণ চালায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর তারা এই প্রথম ট্যাংক ব্যবহার করে। সারাদিন যুদ্ধ চলে। শত্রুবাহিনী তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক মুক্তিযোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। সাহস ও ত্যাগী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও অলি ও মতিনের পক্ষে শত্রুদের শক্তিশালী বাহিনীকে প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠে। পর দিন সকালে উভয়ে তাঁদের পরবর্তী রক্ষণাত্মক অবস্থান করেরহাটে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অলি অতঃপর একটির পর একটি করেরহাট, তুলাতলা, হেয়াকু, চিকনছড়া, বাগানবাড়ি এবং পরিশেষে রামগড় এলাকায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এবং লে. মাহফুজ মহালছড়ি ও গুইমারায় যুদ্ধ শেষে সীমান্ত পার হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ২রা মে রাতে রামগড়ে আসেন। এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বি এস এফ) নিকট থেকে সীমিত অস্ত্র এবং গোলাবারুদ পান। সীমান্তবর্তী কিছু ব্রিজ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভারত তাদেরকে কিছু বিস্ফোরকও প্রদান করেছিল।

মেজর রফিক বি এস এফ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুরো সময় রামগড়ে অবস্থান করেন। ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল তিনি কিছু বিস্ফোরক নিয়ে ক্যাপ্টেন অলির সাথে করের হাট দেখা করতে যান এবং ঐ রাত্রি করেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। তাঁরা সফলভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিভিন্ন পথে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে আসার জন্য প্রলুব্ধ করেন। মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং জয়দেব পুরে অবস্থানরত ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর কে. এম. সফিউলণ্ঢাহর নেতৃত্বে ২৯শে মার্চ যুদ্ধে যোগদান করেন। যশোরে অবস্থানরত ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ৩০শে মার্চ যুদ্ধে যোগ দেন। সৈয়দপুরে অবস্থানরত ৩য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর নিজামের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে যুদ্ধে যোগ দেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে বাঙালি সেনা অফিসার, জেসিও, এনসিও, ই পি আর, পুলিশ এবং আনসারদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অসংখ্য ছোট এবং বড় দলে বিভক্ত হয়ে সারাদেশে শত্রুদের প্রতিহত করতে শুরু করে।

১৯৭১ সালের ৩রা মে অলি, জিয়া, রফিক, শওকত এবং অন্যান্যরা ভারতের অভ্যন্তরে হরিণা ক্যাম্পে পৌঁছেই পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বি এস এফ) সীমান্তে সতর্কাবস্থায় ছিল। বি এস এফ নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনের স্থানান্তর, চিকিৎসা সুবিধা এবং সীমিত পরিমাণ খাদ্য,

অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করতে শুরু করে। এরই মধ্যে ভারতের সহযোগিতায় গঠিত বেসামরিক (রাজনীতিক) সরকার বিভিন্ন আঙ্গিকে তৎপরতা শুরু করে। ভারত সরকার এবং আর্মি জেনারেলদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং শপথ গ্রহণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধান মন্ত্রী করা হয়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে নিম্নবর্ণিত কমান্ডারদের সেক্টর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সেক্টর এর নাম	এলাকা	কমান্ডারের নাম
সেক্টর ১	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসহ ফেনী নদী পর্যন্ত	* মেজর জিয়াউর রহমান (১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন) * মেজর মীর শওকত আলী (জুন ১৯৭১) * মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুলাই হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১)
সেক্টর নং ২	নোয়াখালী, কুমিলণ্ঢা জেলা আখাউড়া পর্যন্ত, ভৈরব রেল লাইন, ঢাকা এবং ফরিদপুরের আংশিক এলাকা	* মেজর খালেদ মোশারফ (এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৭১) * মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১)
সেক্টর নং ৩	আখাউড়া–ভৈরব রেললাইন কুমিলণ্ঢা জেলার পূর্বাঞ্চল	* মেজর কে. এম সফিউলণ্ঢাহ (এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৭১)
	হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	* মেজর নুরুজ্জামান

	সাবডিভিশন এবং ঢাকা জেলার আংশিক এলাকা	(সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১)
সেক্টর নং ৪	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চল ডাওকি রোড পর্যন্ত	* মেজর সি.আর দত্ত
সেক্টর নং ৫	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সুনামগঞ্জ সাবডিভিশন এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত	* মেজর মীর শওকত আলী (জুলাই হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১)
সেক্টর ৬	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা	* উইং কমান্ডার এম বশর
সেক্টর ৭	রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা	* মেজর কাজী নুরুজ্জামান
সেক্টর ৮	কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার আংশিক এলাকা	* মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল হইতে আগষ্ট ১৯৭১) * মেজর এম. এ মান্নান (আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১)
সেক্টর ৯	বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা জেলার আংশিক এলাকা	* মেজর আবদুল জলিল
সেক্টর ১০	নদী বন্দরসমুহ চট্টগ্রাম ও চালনাসহ	* নৌবাহিনীর কমান্ডোদের অধীনে
সেক্টর ১১	ময়মনসিংহ জেলার আংশিক এলাকা এবং টাঙ্গাইল জেলা	* মেজর আবু তাহের (আগস্ট হইতে নভেম্বর ১৯৭১) *ফ্লাইট ল্যাফটেন্যান্ট এম. হামিদুলণ্ঢাহ (নভেম্বর হইতে

ডিসেম্বর ১৯৭১)

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের পর সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে ৩টি নতুন বিগ্রেড গঠন করা হয়–

বিগ্রেড এর নাম	বিগ্রেড কমান্ডারের নাম	কমান্ডিং এর সময়কাল
"জেড"-ফোর্স	লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান	জুলাই হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১
"কে"-ফোর্স	লে. কনেল খালেদ মোশারফ	সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর ১৯৭১
	মেজর আবু সালেক	নভেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১
"এস"-ফোর্স	লে. কর্নেল কে. এম সফিউলণ্ডাহ	সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৯৭১

যুদ্ধের ময়দানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে মন্ত্রীদের (রাজনৈতিক) কোন ধারণাই ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনন্দিন যুদ্ধকালীন ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষভাবে এবং কোন কোন জায়গায় বি এস এফ-এর মাধ্যমে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। বাংলাদেশি রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধরত সকল বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানীকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাঁকে কর্নেল থেকে জেনারেল পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং সামরিক বাহিনীর সরবরাহ কোরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবদুর রউফকে তাঁর ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন অলি এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারবৃন্দ সব সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন। কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং সামরিক বাহিনীর কাজে তার কিছুই করার ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ দ্বারা মনোনীত একজন সংসদ সদস্য। আওয়ামী লীগ সরকার চাকুরিরত কোন সামরিক অফিসারকে কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারে নি। অধিকন্তু কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তারা মেজর জিয়ার কর্মকা" নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী মেজর জিয়াই নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার-ইন-চীফ

ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত পার হবার অব্যাহতি পরে তাকে ১নং সেক্টরের (বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আংশিক এলাকা) সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং এলাকা সম্বন্ধে পরিচিতি প্রদানের জন্য ভারতের সহায়তায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর শত শত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, এমনকি একজন অবসর প্রাপ্ত কর্নেলকে (এবং একজন দলীয় সদস্য) সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার পরও রাজনীতিবিদেরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর পূর্ন আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। আওয়ামী লীগ নেতারা মুলত শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠন ও পৃষ্ঠপোশকতা করতে শুরু করেন। এই বাহিনী মুজিব বাহিনী হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত ছিল। প্রবাসী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর এই বিশেষ বাহিনীর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এই বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল [৪]।

এখানে দু'টি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ও সংসদ সদস্য এম. এ. জি ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং মেজর জিয়াকে ১নং সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আশা করেছিল যে, মেজর জিয়া যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তাকেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করা হবে। গবেষক মনে করেন এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ প্রবাসী সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করার দায়িত্ব নেয় এবং এমন একজনকে সর্বাধিনায়ক মনোনীত করেন যিনি একজন আওয়ামী লীগ নেতা। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ নেতারা মনে রাখেন যে যথাসময়ে তারা স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়। আর এ কাজটি করেন একজন যুবক এবং প্রাণবন্ত সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান। তাই সরকার ধারণা করেছিল জিয়াকে সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলে তিনি সকলের চেয়ে অধিক ক্ষমতশীল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবেন এবং হয়তো সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে পারেন।

[৪] একইভাবে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য একজন ভারতীয় সেনা অফিসারের নিয়ন্ত্রনে রক্ষী বাহিনী নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠন করা হয়। পরে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট একদল অফিসার ও সৈনিকদের হাতে শেখ মুজিব ঢাকায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে নির্মর্মভাবে নিহত হন।

এ ঘটনা বাঙালি সেনা অফিসারদের মনে কিছুটা দুঃশ্চিন্তার রেখাপাত করে। তবুও বাঙালি সামরিক অফিসারগণ সব কিছু উপেক্ষা করে কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীর নেতৃত্বে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তাকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়ার পিছনে ভারত সরকারের নিজস্ব যুক্তি ছিল। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ এ্যান্ড এনালাইসিস এর ডিরেক্টর কে সুব্রহ্মনিয়ামের (Subrahmanyam) উক্তির মাধ্যমে এই যুক্তির যথার্থতা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ দিলিণ্ডতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্স শীর্ষক সভায় তিনি বলেন ''পাকিস্তানকে বিভক্ত করা ভারতের স্বার্থের সাথে জড়িত" এবং পূর্ব পাকিস্তানে সংকটের ফলে সৃষ্ট সুযোগটি হাতছাড়া করা ভারতের জন্য বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। "এই ধরণের সুযোগ আর কখনও আসবে না।" (সুব্রহ্মনিয়াম, ১৯৭১)

ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার সমর্থক ছিল এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের প্রকৃতি নিরুপণেও তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রো-চাইনিজ জঙ্গী প্রভাবে ভারত যে সমস্যায় পড়েছিল (ব্রাউন, ১৯৭২ঃ ২৮৭), ভারত পূর্ব পাকিস্তানে ঐ ধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ উৎসাহিত করতে চায় নি যা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ অবস্থার সৃষ্ঠি করতে পারে এবং বামপন্থীরা শক্তিশালী হয়। কিন্তু এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর তাদের এ মনোভাব আর ছিল না। কারণ ভারত সরকার জানতে পারেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং তারা আরও জানতে পারেন যে আওয়ামী লীগ কোন বাম ঘেষা দল নয়। তখন ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের অনুমতি প্রদান করে।

এখানেই শেষ ছিল না। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার জন্য ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করতে গিয়ে ভারতের নেতৃত্ব যুক্তি দেখান যে, "এমন নিবৃত্তিমূলক সামরিক পদক্ষেপের দ্বারা ভারত তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে কট্টর বামপন্থী নেতৃত্বের উত্থানকে প্রতিহত করতে পারবে" (পিটার হ্যাজেলহার্টস রিপোর্ট ১৯৭১; সুব্রহ্মনিয়াম, ১৯৭১)। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারত সরকার শেখ মুজিবের অনুসারীদের সমন্বয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করে।

কিন্তু মূল যুদ্ধ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধারাই মোকাবেলা করে। সুদূর বিদেশে জনগণের সমর্থন না পেয়ে এবং চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অধিকন্তু তাদের সম্মুখে উৎসাহব্যঞ্জক কোন আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল না। মূলতঃ এটা ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দমন করা এবং জোরপূর্বক দখলে

রাখা। তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানে চতুরদিকে ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বহু নিরঅপরাধ মানুষ হত্যার কারণেও পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। শুরুর দিকে তারা বাঙালি সেনা অফিসার, সৈনিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের যুদ্ধ করার শক্তিকে খাটো করে দেখে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভেবেছিল প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে বাঙালিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানিরা অসহায়ভাবে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করবে। স্বাধীনতা অর্জনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রণোদিত করতে থাকে এবং ক্রমে তাহারা একটি অদম্য শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে। অধিকন্তু দীর্ঘ নয় মাস বিপণ্ডবের চেতনা লালন করে এবং সমগ্র জাতির সমর্থন পেয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সত্যিকার অর্থে অপরাজেয় শক্তি হয়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারেন যে, তারা কখনও বাঙ্গালী জাতির ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করতে পারবে না। অবশেষে, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে (পরিশিষ্ট - ৭)।

জিয়া এবং অলি সম্ভাব্য পরিণাম না জেনে যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁরা চরম অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক কোন উপদেশ ও দিক নির্দেশনা ছাড়াই বিদ্রোহ করেন। তবে তাঁরা জানতেন যে, কোনও মহৎ কাজে সাহস, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা থাকলে বিজয় নিশ্চিত যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে (আলী, ভলিউম.-২, ১৩৯০)।

মানসিক শান্তি, বিশ্বাস, আনুগত্য, উদ্দীপনা এবং সততাই বিজয় ও সাহায্য আনে; লোভ, অনাগ্রহ বা ভীরুতা মধ্য দিয়ে নয়। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং আনুগত্য প্রয়োজন। তাৎক্ষণিক ফলাফল থেকে কাজের প্রতিদান পরিমাপ করা যায় না বরং ধৈর্য ধারণ ও আত্মসংযম থাকলে অগণিত অদৃশ্য পথে সাহায্য আসে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া কিন্তু নিজে নম্র ও ভদ্র থাকা ঃ এই বীজ বড় এবং শক্তিশালী হয়ে আপনার অজ্ঞাতে একদিন আপনার জন্য পরম আনন্দ নিয়ে আসবে। গবেষক এই রাষ্ট্র বিপণ্ডবে তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে বিখ্যাত দুই জন মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়া এবং মেজর শওকতের পরবর্তীতে দেওয়া মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করতে চান (পরিশিষ্ট - ৮)।

''এই অফিসার চট্টগ্রামে ২৫/২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে রাতের সংকটময় মুহূর্তে ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।" (১৯৭৩ সালের ৮ই আগস্ট জিয়াউর রহমানের মন্তব্য)। লক্ষণীয় যে জিয়ার এ মন্তব্য সেনাবাহিনীর প্রথম সেনা প্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউলণ্ডাহও সত্যায়িত করেন।

বিগ্রেডিয়ার মীর শওকত আলীও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন- "বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই অফিসারের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়;

প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম অফিসার যিনি ঝুঁকি নেন এবং নিজের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ২৫/২৬শে মার্চ রাতে জিয়াকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য বলেন" (১৯৭৪ সালের ৮ মার্চ মীর শওকত আলীর মন্তব্য)। আর একজন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী যিনি "বাঘা সিদ্দিকী" নামে খ্যাত, বলেন "জিয়ার নেতৃত্বে অনেক সেনা অফিসার উলেণ্ঢখযোগ্য বীরোচিত কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে মেজর আবু তাহের, মেজর শাফায়েত জামিল, মেজর খালেক, মেজর জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন-এর নাম বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। ***মেজর জিয়ার সাফল্য, কৃতিত্ব ও খ্যাতির পিছনে ক্যাপ্টেন অলির অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি অথবা শতভাগ।*** যুদ্ধের শুরু থেকে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত জিয়ার পাশে অলি সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততা, স্নেহ এবং আনুগত্যের সাথে ছিলেন।" (সিদ্দিকী, ১৯৯২ ঃ ৪২০)

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, মিলিটারি রুল এন্ড মিথ অফ ডেমোক্র্যাসি, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৮।

২। আহমেদ, ফখরুদ্দিন, ক্রিটিক্যাল টাইমস্ ঃ মেমোয়ারস অফ এ সাউথ এশিয়ান ডিপেণ্ঢাম্যাট, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৪।

৩। আহমেদ, মওদুদ, বাংলাদেশঃ ইরা অফ শেখ মুজিবর রহমান, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৪।

৪। আলী, এ. জে, দি মিনিং অফ গেণ্ঢারিয়াস কোরান, কায়রোঃ দার আল কিতাব আল-মাসভি, (তারিখবিহীন)।

৫। আলী, এস এম, আফটার দি ডার্ক নাইট, নয়া দিলণ্ঢী ঃ টমসন প্রেস, ১৯৭৩।

৬। ব্রাউন, ডাবলিউ. নরম্যান, দি ইউনাইটেট স্টেটস এন্ড ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

৭। ডেনজিন, এন. কে, ইন্টারপ্রিটিভ বায়োগ্রাফি, নিউবারি পার্ক, সিএঃ সেজ ১৯৮৯।

৮। এলিস, সি. "সোসোলোজিক্যাল ইন্ট্রোসপেকশন এন্ড ইমোশনাল এক্সপেরিয়েন্স; সিম্বলিক ইন্টারেকশন ১৪ (১৯৯১)।

৯। হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ২০০০, "১৯৭১ ঃ দি আনটোল্ড ষ্টোরি" ২০০০ সালের আগষ্টে ইন্ডিয়া টুডে-তে প্রকাশিত।

১০। হক, মোহাম্মদ সামসুল, বাংলাদেশ ইন্টারনাল পলিটিক্সঃ দি ডিলেমাস অফ দি উইক ষ্টেটস, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৩।

১১। জ্যাকব, জেএফআর, সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৮।

১২। কারনো, স্টেনলি, ভিয়েতনাম ঃ এ হিষ্টোরি, নিউ ইয়র্ক ঃ ভাইকিং, ১৯৮৩।

১৩। খান, ফারুক আজিজ, স্প্রিং ১৯৭১ ঃ এ সেন্টার স্টেজ একাউন্ট অফ বাংলাদেশ ওয়ার অফ লিবারেশন, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৩।

১৪। নী, ভিক্টর এন্ড জেমস পীক, সম্পাদিত, চায়না'স আনইন্টারাপ্টেড রেভ্যুলিউশন, নিউইয়র্ক ঃ প্যানথিওন বুকস, ১৯৭৫।

১৫। নিয়াজি, এ.এ.কে. লে. জেনারেল, দি বিট্রেয়াল অফ ইষ্ট পাকিস্তান, লাহোর ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

১৬। পিটার হ্যাজেলহার্ট'স রিপোর্ট, "শ্যাডো অফ ওয়ার অন দি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট", দি টাইমস (লন্ডন), ১৩ জুলাই ১৯৭১। ফর ডিটেইলস অফ সুব্রহ্মনিয়াম'স যুক্তি দেখানো হয়েছে তাঁর লেখা বই বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়া'স সিকিউরিটি, দেরাদুনঃ পালিত এন্ড দত্ত, ১৯৭২।

১৭। কাদেরী, ফজলুল কাদের, বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, ঢাকাঃ আমাতুল কাদের, ১৯৭২।

১৮। রিড-ডানাহে, ডি., অটোএথনোগ্রাফী ঃ রিরাইটিং, সেলফ্ এন্ড দি সোসাল, অক্সফোর্ড ঃ অক্সফোর্ড বার্গ. ১৯৯৭।

১৯। সাদিক, এম., মুক্তি যুদ্ধ হৃদয়ে মম, ঢাকা ঃ এইচ. এ. মাহমুদ ১৯৯৫।

২০। সফিউলণ্ঢাহ, কে.এম. মেজর জেনারেল (অবঃ), ওয়ার অফ লিবারেশন ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

২১। সালিক, সিদ্দিক, উইটনেস টু সারেন্ডার, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৭।

২২। সিদ্দিকী, কাদের, স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী ১৯৯২।

২৩। সিং, সুকান্ত, মেজর জেনারেল, দি লিবারেশন অফ বাংলাদেশ, ভলিয়ম-১, দিলণ্ঢী ঃ লেন্সার পাবলিশার্স, ১৯৮০।

২৪। সিসন, রিচার্ড এন্ড রোজ, লিও ই., ওয়ার এন্ড সিসেশান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এন্ড দি ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ, ক্যার্লিফোর্ণিয়া ঃ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যার্লিফোর্নিয়া প্রেস, ইউ.এস.এ. ১৯৯০।

২৫। সোবহান, রেহমান, বাংলাদেশ, প্রবেণ্ঢম অফ গভারনেন্স, নয়াদিলণ্ঢী ঃ কনার্ক পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৩।

২৬। সুব্রহ্মনিয়াম, কে. কর্তৃক লিখিত ইন দি হিন্দুস্তান টাইমস (দিলণ্ঢী). ১ এপ্রিল ১৯৭১।

২৭। সুব্রহ্মনিয়াম, কে. কর্তৃক লিখিত ইন দি ন্যাশনাল হেরাল্ড (দিলণ্ঢী), ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

২৮। তালুকদার, মনিরুজ্জামান, দি বাংলাদেশ রেভোলিউশন এন্ড ইটস আফটারম্যাথ, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৮।

২৯। টেডলক, বি. ''ফ্রম পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন টু দি অবজারবেশন অফ পার্টিসিপশন ঃ দি এমারজেন্স অফ ন্যারেটিভ এথনোগ্রাফী", দি জার্নাল অফ অ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল রিসার্স, ৪১ (১৯৯১)।

৩০। জাইরিং, লরেন্স, দি আইয়ুব খান ইরাঃ পলিটিকস্ ইন পাকিস্তান ১৯৫৮-১৯৬৯, সাইরাকাস ঃ সাইরাকাস ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৭১।

অধ্যায়-৮

গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সামরিক কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রেষণা

ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এমন আটজন গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রেষণার স্তর ব্যাখ্যা করবে। যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল- কেন তাঁরা দীর্ঘ সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত পেশাগত নীতি লংঘন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে, পঞ্চাশজন সামরিক অফিসার পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে চার হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (আহমেদ, ১৯৯৫. ৩০, ১৭৮)। তাঁদের মধ্যে ৬ জন বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে দায়িত্বরত। তাই তাঁদের মতামত নেয়া যায় নি। বারোজন বিদেশে বসবাস করেছেন এবং **১৬** জন মারা গেছেন। অবশিষ্ট অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সময় দিতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দুজন মতামত দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছিলেন কিন্তু গবেষক যখন নির্ধারিত গন্তব্যে গিয়ে তাঁদের পান নি। এদের চারজন কয়েকমাস দেশের বাইরে থাকার কথা উলেণ্ডখ করে নেতিবাচক উত্তর দেন। গবেষক তাঁদের আটজনের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগাড় করতে সক্ষম হন। এসব কর্মকর্তাদের সকলে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তম্মধ্যে তিনজন দলীয় নেতা হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত; দুইজন ব্যবসায় এবং বাকিরা শান্তিপূর্ণভাবে অবসর জীবন যাপন করছেন।

এ আটজন কর্মকর্তাদের সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের দু'জনকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য ২য় সর্বোচ্চ পদক বীরউত্তম, দু'জনকে ৩য় সর্বোচ্চ পদক বীর বিক্রম এবং দু'জনকে বীরপ্রতীক পদক প্রদান করা হয়। অন্য একজনকে কমান্ডার ইন চিফ এর সনদ প্রদান করা হয়। তাঁরা ছিলেন তরুণ ও নীতিবান। সকলেই পাকিস্তান অফিসার্স কোরের সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীতে কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। পাকিস্তানের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য তাদেরকে শপথ নিতে হয়েছিল। আক্রমণের সময় আসল তাঁরা শপথের কথা ভেবে এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন নি বরং পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানিদের কবল থেকে মুক্ত করার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রত্যয়দীপ্ত ছিলেন। তাই মূল প্রশ্ন হল এর কারণ কী?

ব্যাপক ইস্যুর উপর গঠিত প্রশ্নমালার (পরিশিষ্ট ঃ ৯ দেখুন) মাধ্যমে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রণোদনার পর্যায়, প্রেরণার উৎস এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বতস্ফুর্ত আকুতি সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে একটি সাক্ষাৎকার সময়সূচি আগেভাগে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিটি ছিল কষ্টসাধ্য। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারদানকারীর সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎসূচি তৈরি করা হয়েছিল। সময় ও স্থান এমন ছিল যে প্রত্যেকে যেন বেশ কিছু সময় নিয়ে খোশ মেজাজে কথা বলতে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা নোট দেখে কথা বলতে পারেন। গবেষক দুজন ব্যক্তিগত সহকারী নিয়ে টেপ রেকর্ডারসহ উপস্থিত হন। যাতে তাদের কথা, মতামত প্রতিলিপিকরণ এবং কোনও সম্পাদনা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে রেকর্ড করা যায়। প্রত্যেক অফিসারের সাক্ষাৎকার তিন ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয় এবং পূর্বেই সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাপারে তাঁদের সতর্ক করে দেয়া হয়। (ছক ৮.১ দেখুন)।

সাক্ষাৎকার শুরুর প্রাক্কালে গবেষকের মনে অনেক শংকা ছিল। যেহেতু গবেষণাটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, তাই জাতীয় ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ের উপর আলোকপাত করার জন্য প্রকৃত নায়কদের প্রেষণার মুক্ত বিশেণ্ঢষণ দাবি করে। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নায়ক যুদ্ধে তাঁদের অবদানের ব্যাপারে আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। তারা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন হিসেবে দেখেন। সেই দিনগুলোতে তাঁরা যা ভেবেছিলেন এবং করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে তাঁরা কি বাস্তব বিবরণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় কি তারা আবেগমুক্ত হতে পেরেছিলেন? এরকম কিছু প্রশ্ন গবেষকের মনকে আন্দোলিত করেছিল।

সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ করার পর গবেষক দেখলেন যে, এসব শংকা পুরোপুরি অমূলক ছিল না। তিনি দেখতে পান, কমপক্ষে তিনজন সাক্ষাৎকারদানকারী অনুসন্ধানের মূল বিষয়কে কিছুটা উপক্ষো করে শিশুকাল থেকে তাঁরা কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন, সে বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্য ছিল খুব দীর্ঘ; এদের অন্তত দুজন মূলত বিষয়টির প্রাসঙ্গিক দিকে মনোনিবেশ করেন। তা গবেষকের কাজকে কিছুটা কষ্টসাধ্য করে তোলে। সাক্ষাৎকারের অধিকাংশ সময় ধরে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছিল; তাঁকে এদের দীর্ঘ এবং বিষয় বহির্ভূত বক্তব্য বিশেষত ঘটনার পটভূমির উপর ভিত্তি করে ব্যাপক আকারে সম্পাদনা করতে হয়। সময় এবং তারিখের ব্যাপারে তাঁকে অনেকাংশে সম্পাদনা করতে হয়।

টেবিল ৮.১ ঃ আট জন সেনা অফিসার সম্বন্ধে বিবরণ

নাম	১৯৭১ সালে পদবী	অবসরকালীন পদবী	সেক্টর যুদ্ধকালীন সময়	কোন ব্যাটালিয়নের সাথে যুক্ত	সাহসীকতার পদক	কোন সেনা নিবাস অবস্থান ছিল	অন্যান্য মন্তব্য
মীর শওকত আলী	মেজর	লেঃ জেনারেল	১, ৫	৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর উত্তম	চট্টগ্রাম	সেক্টর ১ ও ৫ এর অধিনায়ক
কে. এম. শফিউলণ্ঢাহ	মেজর	মেজর জেনারেল (সেনা প্রধান)	৩	২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর উত্তম	জয়দেবপুর	সেক্টর ৩ ও অধিনায়ক 'এস-ফোর্স'
সাফায়েত জামিল	মেজর	কর্নেল	৭, ১১, ৫	৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর বিক্রম	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (কুমিলণ্চ সেনা নিবাস)	
এজাজ আহমেদ চৌধুরী	ক্যাপ্টেন	মেজর জেনারেল	৩	২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	সেনা প্রধানের সনদ পত্র	জয়দেবপুর (ঢাকা সেনা নিবাস)	
মোহাম্মদ আইন উদ্দিন	ক্যাপ্টেন	মেজর জেনারেল	৩	৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর প্রতীক	কুমিলণ্ঢা	
আবদুল হালিম	ক্যাপ্টেন	মেজর জেনারেল	১১, ৪	অধিনায়ক 'জেড-ফোর্স' সিগন্যাল কোম্পানী		পাকিস্তান থেকে ছুটিতে আসেন	
সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম	সেকেন্ড লেপ্টেন্যান্ট	মেজর জেনারেল	৩	২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর প্রতীক	জয়দেবপুর (ঢাকা সেনা নিবাস)	
হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	সেকেন্ড লেপ্টেন্যান্ট	মেজর	১১, ৪	১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	বীর বিক্রম	যশোর সেনা নিবাস	

যুদ্ধে অংশগ্রহণে তাদের প্রণোদিত কী করেছিল?

যেসব রাজনৈতিক নেতারা স্বায়ত্বশাসনের প্রতি জংগী মনোভাব এবং ছয় দফা আন্দোলনে আপসহীন ছিলেন, তাঁরা ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহের ঐ সংকটপূর্ণ দিনগুলোতেও দ্বিধাগ্রস্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যখন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল তখন বাংলাদেশের স্বীকৃত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এবং শীর্ষস্থানীয় নেতারা গোপনে শত্রুপক্ষের অগোচরে, ছদ্মবেশে ভারতের পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর সীমান্তে চলে যান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। যাহাহউক সামরিক কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কী তাঁদেরকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা জিজ্ঞাসা করা হলে মেজর জেনারেল ইব্রাহীম, তৎকালীন সেকেন্ড লেঃ বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানি উপনিবেশ থেকে মুক্ত করার একটি "সুবর্ণ সুযোগ" হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার মতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। বাঙ্গালীদেরকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর

নাগরিক" হিসাবে এবং অফিসারদেরকেও "দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার" হিসাবে থাকতে হবে না। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সেনা প্রধান হিসেবে অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল শফিউলণ্ঢাহ বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকার কথা উলেণ্ঢখ করে, তিনি সবিস্তারে ২৩ বছরে সংযুক্ত পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তড়নকে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্ভোগের শিকার হওয়ার কথা উলেণ্ঢখ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ও জেনারেলগণ যখন তদানীন্তন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামীলীগকে, শুধু পূর্ব-পাকিস্তানভিত্তিক হওয়ার কারণে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। তখন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং পূর্ব পকিস্তানকে একটি উপনিবেশ হিসেবে রাখা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তৎকালীন মেজর, পরবর্তীতে লেফটেনেন্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেন যে, ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্যোগ নিলে শওকত আলী তাতে যোগ দেন। তাঁর ভাষায় "যুদ্ধ হয়েছিল এবং আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল, ...একজন অফিসার সব কিছুর উর্ধে তার সেনাদলের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। আমি ছিলাম ৮ম বেঙ্গলে। সুতরাং আমি বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম।" মেজর জেনারেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী প্রত্যুত্তরে বলেন যে, ২৫ এবং ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাশবিক হত্যাযজ্ঞ তাঁকে যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। তার ভাষায় "পাকিস্তান আর্মি দেশের এ অংশকে তাঁদের উপনিবেশ হিসেবে শাসন করত" এবং পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা পরিচালিত হয়।

কর্নেল সাফায়েত জামিল আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন, "আমি আমার দেশ এবং দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য নিজকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করেছিলাম। এছাড়াও আমি আমার দেশ এবং জনগণকে ঐসব বহিরাগতদের কাছ থেকেও রক্ষা করতে চেয়েছিলাম যারা এ দেশকে লুণ্ঠন করছিল।" মেজর জেনারেল আইনুদ্দিন তৎকালীন ক্যাপ্টেন, বলেন "পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করা ছিল আমার দায়িত্ব।" তাই পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে প্রণোদিত হন। মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল হালিম বলেন যে, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালিদের প্রতি ভালবাসা" তাকে যুদ্ধে

অংশগ্রহণে তাড়িত করে। মেজর হাফিজউদ্দিনের উত্তরও ছিল স্পষ্ট। তিনি দেশের "জনগণের জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন জনগণ তাদের নিশ্চিতভাবে সমর্থন করবে এবং তা হবে দেশপ্রেমের কাজ।"

সংক্ষেপে বলা যায়, পূব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানিদের থাবা হতে মুক্ত করে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে বাঙালিরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন যাপন করতে পারবে।

কী ছিল তাদের সার্বিক লক্ষ্য ?

পুর্ব-পাকিস্তানকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্খাই শুধু প্রেরণার বিষয় ছিল না বরং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতাও হয়ে গিয়েছিল তাঁদের সার্বিক লক্ষ্য। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি কী ছিল জিজ্ঞাসা করা হলে মেজর জেনারেল ইব্রাহিম স্পষ্ট ভাষায় বলেন "স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র প্রেরণাদানকারী শক্তি, এর চেয়ে অধিক গুরুত্ব কিছুই ছিল না।" জেনারেল শওকত তাঁর স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে উত্তর দেন যে, একজন সৈনিক যুদ্ধ করেন তাঁর দেশের জন্য। তাঁর ভাষায় যে কারণে তিনি যুদ্ধ করেন "আমার দেশ ছিল সমস্যায়; তাই বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।" মেজর জেনারেল এজাজ মনে করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকারী প্রেরণা ছিল "তাঁর দেশ"কে রক্ষা করা এবং "জনগণকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবিশ্বাস্য নৃশংসতা থেকে রক্ষা করা।"

কর্নেল সাফায়েত জামিল এ প্রশ্নের উত্তরে সবিস্তারে বলেন "একটি উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনই ছিল আমাদের প্রেরণা দানকারী শক্তি।" তিনি আরও বলেন, বাঙ্গালীদের সাথে ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া আর কোন মিল ছিল না। জেনারেল আইনুদ্দিনের মতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছিল অত্যাবশ্যক। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালীদেরকে তাঁদের অর্থনীতির নায্য পাওনা দিত না। তাঁর ভাষায় "পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা নির্বাচনের ফলাফলকে স্বীকৃতি দেন নি এবং বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিল না।" জেনারেল আব্দুল হালিম মনে করেন যে, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ তিনি গ্রহন করেছেন। তিনি বলেন, প্রেরণার উৎস ছিল "নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ পাওয়া যেখানে মানুষ সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে।" এই যুদ্ধে মেজর হাফিজ উদ্দিনের প্রেরণা ছিল "দেশবাসীর জন্য তাঁর ভালবাসা" এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। তিনি মনে করতেন যদি বাংলাদেশকে মুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে পারেন, তবে তাঁদের বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকবে। এটি ছিল মূল প্রেরণা।

যাই হোক বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রেরণার ভিন্ন একটি দিকও ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চের পর, যখন ইয়াহিয়া খাঁন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন, এই অবস্থা তখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এমন কি বিদ্যমান বিভেদ ক্যান্টনমেন্টগুলোতেও সংক্রমিত হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানি অনেক সেনা অফিসার যাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব-পাকিস্তানেও অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন। এমন কি তাঁরাও পূর্ব-পাকিস্তানি সহকর্মীদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলেন। একে অপরকে তাঁদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন। ২৫ মার্চের পর ক্যাপটেন অলি আহমদ যখন মেজর জিয়ার সাথে বিদ্রোহ করেন এবং এই বিদ্রোহের সংবাদ বিভিন্ন সেনানিবাসে ছাড়িয়ে পড়ার পর, অবস্থা আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠে । অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মেজর জেনারেল ইব্রাহিমের বক্তব্যেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন "আমাকে হয়ত তাদের (পশ্চিম পাকিস্তানদেরকে) হুকুম মানতে হত অন্যথায় মেরে ফেলত।" এমনকি জেনারেল শওকত বলেন "যদি আমরা ধৃত হই তবে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।" এভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য দেশপ্রেম এবং দেশবাসীর প্রতি ভালবাসার সাথে জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি যুক্ত হয়ে বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোতে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

তাঁরা এখন কী অনুভব করেন?

বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা ঐ সময় যা করেছিলেন সে ব্যাপারে কি তাঁদের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে? তিন দশক আগে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁরা এখন কি ভাবেন তা জানার জন্য গবেষক প্রশ্ন করেছিলেন "আপনারা কি এখন পরিতৃপ্ত বোধ করেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে মেজর জেনারেল আইনুদ্দিন বলেন "আমি মনে করি আমার জীবনের একমাত্র ভাল কাজ হল স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং দেশকে স্বাধীন করা।" একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এ কথা ভেবে মেজর জেনারেল ইব্রাহিম পরিতৃপ্ত বোধ করেন । যাঁরা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি তাঁদের একজন ভেবে গর্ব অনুভব করেন তাঁর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু তাতে কী! তিনি গর্বের সাথে স্মরণ করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান ছিল। একইভাবে মেজর জেনারেল কেএম সফিউলণ্ঢাহ একই সুরে বলেন যে, এক সাগর অশ্রু ও রক্ত দিয়ে তাঁরা এ দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "আমরা তাদের (পাকিস্তানীরদের) এ শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, চিরদিন আমাদেরকে দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা গর্বিত যে আমরা আমাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ করতে পেরেছিলাম এবং তা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলাম।"

লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী বলেছেন যে, তাঁরা সে সময় ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। তবে তিনি আনন্দিত যদি স্বাধীনতার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। মেজর জেনারেল এজাজ খুব আত্মতৃপ্তি বোধ করেন: আমরা এখন স্বাধীন, পাকিস্তানি জান্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নই। আমরা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করি এবং সিদ্ধান্ত নেই।" লে. জেনারেল মীর শওকতের মত শাফায়েত জামিল বলেন "সৎ ও ত্যাগী নেতৃত্ব এবং দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে" বাংলাদেশের অবস্থা আরও ভাল হতে পারত। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন যে, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে গর্বিত। তাঁর নিজের ভাষায়, "আমি নিজকে অন্যতম একজন ভাগ্যবান মনে করি কারণ আমি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছি।" যুদ্ধে ভুমিকার ব্যাপারে হাফিজউদ্দিনও খুবই গর্ব বোধ করেন। তিনি বলেন "স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে" তাঁর জীবন অর্থবহ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন যে "তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।" এটা তার জন্য বিরাট আনন্দ এবং গভীর আত্মতৃপ্তির ব্যাপার যে, তিনি "স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি ছোট অংশ গঠন করতে পেরেছিলেন।"

দেশপ্রেম বলতে তারা কী বোঝেন?

মুক্তি-যোদ্ধাদের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সম্মান এবং শ্রদ্ধায় তাঁরা ভূষিত তা ব্যাপক। একইভাবে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছেন তাদের প্রতি ঘৃণাও তেমন প্রবল। জাতি সর্বদা তার সাহসী সন্তানদের গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখে। তাঁরা নিজেদের নিশ্চিত চাকুরি, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন, এমনকি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি এবং মারাত্মক সমস্যা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁরা মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত। গবেষক পরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়েছিলেন। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, দেশপ্রেমের ব্যাপারে তাঁরা কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তখন তাঁরা এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। শাফায়েত জামিল মনে করেন "ব্যক্তিগতভাবে সকল প্রকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের দেশ এবং দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানো।" আব্দুল হালিমের মতে দেশপ্রেমিক হল ঐ ব্যক্তি "যিনি সব সময় সত্যকে আঁকড়ে থাকে এবং মিথ্যার কাছে কখনও মাথা নত করেন না।" একজন দেশপ্রেমিক "সবসময় নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।" এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ঔদাসীন্যতা, ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি অবহেলা এবং দুই যুগ ধরে বঞ্চনা ও দুর্দশা বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। হাফিজ উদ্দিন একে মনে করেন "দেশের জন্য ভালবাসা এবং দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা" এবং তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন, একজন দেশপ্রেমিকের "নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করা এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করা।" তার মতে "আমার দেশ সঠিক অথবা ভুল যে পথেই থাকুক, আমার দেশ সবকিছুর উর্দ্ধে"-এ দৃষ্টিভঙ্গি দেশপ্রেমের মূলভিত্তি তৈরি করে। এজাজ আহমদ চৌধুরী দেশপ্রেমের দার্শনিক মতবাদ ছাড়াই বলেন "আমি নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসেবে মনে করি এবং তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি।" মীর শওকত আলী, দেশ প্রেমকে নিজের দেশের জন্য ভালবাসা হিসেবে সজ্ঞায়িত করেন। তাঁর ভাষায় "আপনি কোনও এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানে বসবাস করেন, ঐ জায়গায় বড় হন, সেখানকার ভাষায় কথা বলেন এবং তা হল আপনার জন্মস্থান। আপনি আপনার দেশকে মায়ের মত ভালবাসেন।" জেনারেল কে. এম শফিউলণ্ঢাহ অনেকটা মীর শওকত আলীর মতই বলেন, "বাংলাদেশ আমার দেশ; এ দেশেই আমি জন্মেছি; এটাই আমার জন্মভূমি। তাই আমার সর্বোচ্চ প্রেম এবং টান রয়েছে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য।" জেনারেল ইব্রাহিমের মতে, দেশ প্রেম একটি মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ "দেশ ও দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য।" তিনি আরও বলেন, দেশপ্রেম একটি অনুভূতি যার কারণে দেশের জন্য আমরা আমাদের, আমাদের পরিবারের এবং সমষ্টিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে থাকি। মোহাম্মদ আইনুদ্দীন এ সম্বন্ধে বলেছেন সৎগুণ, জন্মস্থান, নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির অহংকার, যা তাকে পরিপুষ্ট করেছে। যখন তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, পাকিস্তানী মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙালীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে, তাঁর অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে, তখন তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। সংক্ষেপে এই সকল সামরিক কর্মকর্তাদের মতে দেশপ্রেম পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা এবং শোষণমূলক পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থায় পাশবিকভাবে লংঘিত তাদের অধিকার রক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজস্ব জীবনধারা, আলাদা সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে সমৃদ্ধ তাঁদের জন্মভুমি পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ, তার অধিবাসীদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবন ধারাকে প্রবাহিত করে তুলবে। মূলত এ কর্মকর্তাবৃন্দ জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তা করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে পৃথক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদেরকে বাংলাদেশের সন্তান মনে করেন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী হিসেবে যুদ্ধ করেন।

তাঁরা সফল না হলে কী হত?

তারা কি কখনও চিন্তা করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল না হলে, তার পরিণতি কী হত? সৈন্য সাথে নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়ার সময় তাঁরা কি কখনও বিবেচনায় নিয়েছেন যে ব্যর্থতার পরিণাম কী হতে পারে? আপনি কি জানতেন "স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যর্থ হলে শুধু আপনার ক্যারিয়ারের শেষ নয় বরং আপনার জীবনেরও পরিসমাপ্তি?" এজাজ আহমেদ

চৌধুরী বলেন যে, তিনি এর ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাকে সামরিক আদালতে হাজির করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। তথাপি তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কারণ ঘটনার যথার্থতার ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে সঠিক মনে করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার অর্থই হচ্ছে সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা এবং যেহেতু এটি তাঁর কাছে "তাদের সম্মানের প্রশ্ন ছিল, পরিচয়ের প্রশ্ন ছিল; সুতরাং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি পাকিস্তানি সেন্যদের পাশবিক কর্মকাণ্ডের নীরব দর্শক হতে পারে নাই।"

একই ধরণের মত পোষণ করেন জেনারেল ইব্রাহিম, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের অর্থ হলো পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং ব্যর্থতার অর্থ হল বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড; তথাপি তিনি তা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। সুতরাং "আমার পেশা, আমার জীবন, আমার ভাগ্য" সবকিছুই "আমার দেশের" ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। শাফায়েত জামিল আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি এর পরিণামের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত ছিলেন এবং ফায়ারিং-স্কোয়াডের কথাও স্মরণ ছিল। তারপরও তিনি "দেশ এবং জনগণের নির্মম ধ্বংসের" নীরব দর্শক হতে পারেন নি। তিনি "তাঁর দেশ ও জনগণের" নীরব আহ্বানে সাড়া দিয়ে "অস্ত্র হাতে নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন"। মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আরও বিস্তারিতভাবে বলেন যে, যদি তা ব্যর্থ হতো তবে "রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ছাত্র এবং যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অন্যান্য লোকেরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারতেন; স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডও শুরু করতে পারতেন"। কিন্তু "সামরিক বাহিনীতে আমাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ছিল অবধারিত" তথাপি তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং "আমাদের বিবেচনায় ছিল দেশের ৭ কোটি লোক ও তাদের ভাগ্য।"

হাফিজউদ্দিন আরও দৃঢ়ভাবে বলেন "যুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় ছিল না" এবং "আমরা জানি ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কী ঘটত।" তিনি বলেন, তাঁর বাবা সে সময় পাকিস্তান পার্লামেন্টের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন "রাজনীতিবিদরা" "গোলটেবিলের চতুর্দিকে বসতে পারতেন এবং অতীতের সবকিছু ভুলে পার্থক্য দূর করতে পারতেন;" কিন্তু একজন সৈনিকের জন্য কোন গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল না। বিদ্রোহী সৈনিকদের জন্য, ফায়ারিং স্কোয়াড প্রস্তুত থাকত। মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বলেন যে, তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন করণ সকল জনগণ তাঁদের সাথে ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মিলিটারি ক্র্যাকডাউনের পর যদি আমরা ব্যর্থ হই "তার পরিণাম কি হতে পারে তা আমরা কখনো ভাবিনি কারণ তখন আমাদের দেশের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।" জেনারেল শওকত আরো

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমী থেকে পাশ করার সময় তিনি কিভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্য পোষণ করার শপথ গ্রহন করেন এবং "পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব" রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কারণ "নিজেকে বাঙালি দাবি করলে আমার যুদ্ধে অংশগ্রহন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।" ''যদি আমরা ব্যর্থ হতাম" তবে হয়তো "আমার এবং সম্ভবত আমার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়া হতো" তবুও তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ঐ সকল বাঙালি সামরিক কর্মকর্তারা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদানকৃত এবং মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তারা ভালভাবেই জানতেন যে সফল না হলে পরবর্তীতে কী পরিণাম হতো। তবুও তাঁরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা প্রথমত ব্যাপক প্রেরণার দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত বিজয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের বিপুল সমর্থন তাঁদের প্রতি রয়েছে। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাদের ভালবাসা, এবং হয়ত এ দেশের মানুষের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নৃশংসতার প্রতি ঘৃণা এবং বিশেষ করে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি জেনারেলদের ঘৃণা তাঁদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করেছিল। যা পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধরে রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাজনৈতিকভাবে খুবই সজাগ ছিল বিধায় তাঁরা মানুষের ভাবাবেগকে বুঝতে পেরেছিলেন, যারা প্রথমদিকে স্বায়ত্বশাসন এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দাবী তোলেন।

তাঁরা কি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন?

সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারক ছিলেন না। তথাপি পূর্ব পাকিস্তানে সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ হওয়ার মত পরিস্থিতি সম্পর্কে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাগণ পুরোপুরি অবগত ছিলেন। আশা করা হচ্ছিল, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের পল্টনের বিশাল জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এ ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতা এবং জেনারেলদের সাথে নিষ্ফল আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তারা খুব ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। দোদুল্যমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারে মোহভঙ্গের বিষয়টি উত্তর দাতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। জেনারেল এজাজ আহমেদ বলেন, যদিও তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না, তবুও তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "১৯৭১ সালের

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দেশের দৈনন্দিন ঘটনার ব্যাপারে আমি অবগত ছিলাম"। যাহা হউক কেএম সফিউলণ্ঢাহও স্বীকার করেন যে, যদিও সামরিক বাহিনীতে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল, তবু বিদ্যমান অবস্থা এবং জনগনের চাপের কারণে এতে সম্পৃক্ত হতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন কারণে পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, বাস্তবিক পক্ষে সামরিক শাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে, পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আবির্ভূত হবেন। একারণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দারুণভাবে অসম্মানবোধ করেন এবং আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের সভা স্থগিত করাকে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। কে এম শফিউলণ্ঢাহ বলেন, "সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা এতই উত্তপ্ত ছিল যে, স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতে কেউ সন্তুষ্ট হত না।" জেনারেল ইব্রাহিম উত্তরে বলেন, তাঁরা "সংবাদপত্র এবং সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।" অধিকন্তু, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধুগণও" বিভিন্ন তথ্যের উৎস ছিলেন। তবে তিনি বলেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধ পরিচালনাকারী দলের সমর্থক ছিলাম। যদিও যুদ্ধের পর আর সমর্থক ছিলাম না।" উলেণ্ঢখ্য, জেনারেল ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল।

তবে শাফায়েত জামিল বিস্তারিতভাবে বলেন, যদিও তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন না; তবুও নিয়মিত পত্রিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, "জনতা এগিয়ে এসেছিল, যদিও নেতারা পিছনে পড়েছিলেন।" নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ এবং তার নেতারাও "কী করতে হবে তা বুঝতে পারেন নি।" সামরিক কর্মকর্তাগণ নিকট থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ পাওয়ার চেষ্টা করতেন। শাফায়েত জামিল মনে করেন, ''শেখ মুজিবুর রহমানও সে সময় সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন"। মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না, তবুও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার তারিখ পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের শেখ মুজিবর রহমানের রমনা রেসকোর্সে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হতে তিনি সকল ঘটনা অনুসরণ করেছিলেন।

তৎপরবর্তী ঘটনা বিশেষ করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁদের ধ্বংসযজ্ঞ তাকে উদ্বিগ্ন করেছিল।

মেজর হাফিজ উদ্দিনও বলেন যে, তিনিও কোনও রাজনৈতিক দলের সর্মথক না হয়েও বিভিন্ন কারণে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। প্রথমত, তাঁর বাবা ছিলেন জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের দিন তিনি একটি পোলিং সেন্টারের দায়িত্বে ছিলেন। পুর্ব-পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামীলীগ নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হতে যাচ্ছে দেখে খুবই আনন্দিত হন। তিনি মনে করেন, অবশেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্তানি রাজনৈতিক দলের কাছে হস্তান্তর করা হবে। যার ফলে বাঙালিদের ব্যাপক বঞ্চনার সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাবলীর সমাধান করা সম্ভব হবে। মোহাম্মদ আইনউদ্দিনও স্বীকার করেন যে, তিনিও কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না, তবুও ১ মার্চের পর পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার কথা জেনে ভীষণভাবে মর্মাহত হন। ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকা-, বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে শাসক গোষ্ঠীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁদের অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাও এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে "ফেরা" সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জেনারেল শওকত যথার্থ বলেছেন: তিনি একজন সৈন্য ছিলেন এবং "কখনও রাজনীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন না"। তবে তিনি সংবাদপত্র এবং রেডিওর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

তাঁরা কখন যুদ্ধে যোগ দেয়ার কথা ভাবেন?

ঐ সংকটময় দিনগুলোতে পূর্ব-পাকিস্তানে সংঘঠিত ঘটনার ব্যাপারে যেসকল অফিসারবৃন্দ সকল বিষয়ে অবহিত হন, তখন তারা মাতৃভূমি ও দেশবাসীর কল্যাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার। এ প্রশ্ন করা হলে এজাজ আহমদ চৌধুরী বলেন, "১৯৭১ সালের ৭ মার্চে শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাঁর ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তখন আমি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। যদিও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর হতে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার কথা চিন্তা করি। তবুও মূলত আমি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর ২৯ মার্চ সন্ধ্যে ৭টায় স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করি। তাঁর ঘোষণা আমাকে দিক নির্দেশনা দেয়।"

জেনারেল কে এম শফিউলণ্ডাহ সবিস্তারে বলেন, "তিনি ধারণা করেছিলেন নির্বাচনের পর সরকার পরিবর্তন ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার রদবদল ঘটবে।" কিন্তু তা হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল।

"সে পরিকল্পনায় পূর্ব পকিস্তানে সৈন্য আনয়ন, ধ্বংসযজ্ঞসহ সবকিছু পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঢাকায়।" নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং রাগান্বিত হয়ে "১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ আমরা বিদ্রোহ করি এবং জানতে পারি, মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।" জেনারেল ইব্রাহিমের মতে, ৭ মার্চ ছিল একটি উলেণ্ঢখযোগ্য দিন। তার নিজের ভাষায় "আমরা ভেবেছিলাম ঐদিন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমরা এর সাথে সম্পৃক্ত এবং আমরা তাতে অংশগ্রহন করব। ১৯ মার্চের পর আমাদের ভাবনা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় যা ঘটেছে তা জানার পর আমাদের আর দ্বিতীয় কিছু চিন্তা করার বিষয় ছিল না।" তিনি আরও বলেন, ঐ সময় আমরা জিয়াউর রহমানের কণ্ঠেও স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেয়েছিলাম। সে সময় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছিলাম "আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি"।

শাফায়েত জামিল বলেন, "বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাঁর শিশুকাল থেকে ছিল"। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে তিনি তা করতে পারেন নি। মেজর জিয়াউর রহমান যখন রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন সমগ্রজাতি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে অনুপ্রাণিত হয়। তারপর তিনিও যুদ্ধে যোগ দেন। মোহাম্মদ আব্দুল হালিম এ মর্মে উত্তর দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, "ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি ২৭ মার্চ জিয়ার কণ্ঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি। অবশ্য ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ২৬ মার্চ বিদ্রোহ করে।" তারপর তিনি যুদ্ধে যোগ দেন এবং যুদ্ধ শুরু করেন।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ সকালে নিরস্ত্র হবার কিছুক্ষণ পর মেজর হাফিজ উদ্দিন যুদ্ধে যোগ দেন। রেজিমেন্টের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। বিদ্রোহ করার পর তিনি জানতে পারেন, জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বলেন যে, মার্চের শুরু থেকেই তিনি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন তবে "চট্টগ্রাম থেকে জিয়াউর রহমানের আহ্বান এবং স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।" জিয়াউর রহমান সকলকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। যেমন- "সকল বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, বি.ডি.আর সকলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং দেশকে শত্রু মুক্ত করার আহ্বান জানান। জেনারেল মীর শওকত আলী পরিষ্কারভাবে বললেন, তিনি অন্য কিছু ভাবেন নি। এ ব্যাপারে তিনি যা বলেন তা হল, আমার সিও (কমান্ডিং অফিসার) ছিলেন জিয়াউর রহমান। তার সাথে আমরাও তখন বিদ্রোহ করলাম।"

যুদ্ধে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাঁরা কি তাঁদের সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন?

অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত বাঙালি অফিসারগণ যুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত পৃথকভাবে নেন নি। বরং তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বলেন, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং মেজর জিয়ার আহ্বানের কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। জনাব মীর শওকত আলী বলেন যে, তিনি ক্যাপটেন অলি এবং মেজর জিয়ার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে ছিলেন এবং কমান্ডিং অফিসার মেজর জিয়ার সাথে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জিয়া যদি বিদ্রোহ না করতেন, স্বাধীনতা ঘোষণা না করতেন, তবে এ সকল সাক্ষাতকারদাতাগণ কি করতেন তা বলা কঠিন। তবে এটা সত্য যে, জিয়ার পদক্ষেপ তাদের পদক্ষেপের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। মোহাম্মদ আবদুল হালিম ভিন্ন সুরে বললেন। তাঁর বাবা তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং যুদ্ধে যোগ দিতে বলেন। শাফায়েত জামিল বলেন, তিনি অন্যতম একজন সেক্টর কমা ার খালেদ মোশাররফসহ কিছু ব্যাটিলিয়ন অফিসারের সাথে পরামর্শ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, তাঁরা একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে ছিলেন এবং ''২৪ ঘন্টা ধরে পরামর্শ করেন।" কে এম শফিউলণ্ঢাহ বলেন, যদিও ''আমরা কি করতে যাচ্ছি তা আলোচনা করতাম না কিন্তু আমরা পরস্পরকে জানতাম; এবং কী করতে হবে তাও জানাতাম।" এজাজ আহমেদও বলেছেন যে, তিনি তাঁর সহর্কমীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং ''ব্যাটিলিয়নের আলফা কোম্পানি কমান্ডার মেজর মইনুল হোসাইন চৌধুরীরসহ অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যসামগ্রী নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।"

কেন তাঁরা মনে করলেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে তারা পরিস্থিতি পরিবর্তন করবেন?

"কীভাবে আপনি মনে করলেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে পরিস্থিতি পরিবর্তন করবেন?" তাঁদের আত্মবিশ্বাসের নিরুপণ, রাজনৈতিকস্তর, চিন্তা চেতনা কি পর্যায়ে ছিল এবং তাহা কিভাবে সমগ্র জাতির মনোভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তাহা জানার জন্য এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল। সমগ্র জাতি বিপণ্ঢবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সর্বস্তরের মানুষ আশা করেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। যখন তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের জনগণ যে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁরা বিদ্রোহ করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি এবং নিজেদেরকে একটি আলাদা জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। এজাজ আহমেদ চৌধুরী বর্ণনা করেন যে, মহিলাসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল। জনগণের

নৈতিক সমর্থন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে সুশিক্ষিত সেনা সদস্যবৃন্দ, পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং পুলিশ বাস্তবিক পক্ষে অপরাজেয় হয়ে উঠে। এসকল কারণে ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমরা পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারব।" স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে। মুক্তিযুদ্ধকে সবাই সমর্থন করেছিল- এজাজ আহমেদ চৌধুরীর এ উক্তিটি ছিল ভুল। তবে তিনি সঠিকই বলেছিলেন যে, বিরোধীতাকারীরা ছিল গুটিকতক লোক নিয়ে গঠিত একটি রাজাকারের দল, অধিকাংশ বাংলাদেশিদের নিকট তারা ছিল ঘৃণিত।

কে এম সফিউলণ্ঢাহ সরাসরি বলেন, ''যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশীদের আধিপত্য থেকে আমাদেরকে এই দেশ মুক্ত করতে হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, ''আমরা জানতাম যে আমরা উত্তীর্ণ হব।" সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন যে, যুদ্ধ একটি নতুন নেতৃত্ব, নতুন ভাবনা, দেশপ্রেমের একটি নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে। তিনি বলেন ''যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্র আনতে পেরেছিলাম।" শাফায়েত জামিলের উত্তর ছিল আরও অধিক আনন্দদায়ক। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধ ছিল ''জনগণের যুদ্ধ- জনগণ বনাম হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ।" তিনি বলেন যে, ''যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারলে তাদের (পাকিস্তানীদের) নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল এবং যুদ্ধ করার সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হব। আমি মনে করি আমরা এটাই করেছিলাম।" তিনি আরো জোরালো ভাবে বলেন যে, আমাদের কৌশল ছিল ''তাদেরকে নৈতিক, দৈহিক মানসিক এবং ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে দুর্বল করে দেওয়া এবং তারপর চূড়ান্ত আঘাত হানা, ঢাকা দখল ও স্বাধীনতা অর্জন করা।"

মোহাম্মদ আবদুল হালিমের বলেন যে, বাংলাদেশের জন্য এটি সৌভাগ্য ছিল যে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। তাঁদের ত্বরিত কর্ম, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার ভাষায়, ''রাজনীতিবিদরা অনেক দিন পরে যুদ্ধে যোগ দেন; প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপদ জায়গার সন্ধানে তাঁরা এদিকসেদিক ছুটাছুটি করছিলেন। ছাত্র, শ্রমিক এবং সর্বস্তরের মানুষ আমাদের নিকট ছুটে আসে এবং আমরা তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করি।" মোহাম্মদ আইনুদ্দিনও বলেন যে, যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। কারণ মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শওকত, শাফায়েত জামিলসহ অনেক যোদ্ধারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। "আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে, এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব।" এখানে পুনরায় দ্বিধান্বিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে বাঙালি সেনা অফিসারদের মোহমুক্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

বীরত্বের জন্য খেতাব নেওয়ার সময় তাদের অনুভূতি কেমন ছিল?

ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে দেশের জনগণ আশা করেছিল শক্তিশালী পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে রুখে দিয়ে বাঙালী সামরিক অফিসারবৃন্দ অবশেষে দেশের জন্য বিজয় অর্জন করতে পারবে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে। বাঙালী সামরিক অফিসারবৃন্দ তাই করেছিল। জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে তার বীর সন্তানদের স্মরণ করে। বীরত্বের জন্য পদক ছিল তাদের প্রতি জাতির স্বীকৃতির একটি নিদর্শন। দুই দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯৪ সালে এ পুরষ্কার গ্রহণের সময় ঐ সকল অফিসারবৃন্দ তাঁদের গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যুদ্ধে যোগ দেয়ার কারণ বর্ণনা করেন। এ অংশে তাঁদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হল।

সাক্ষাতদাতা ৮ জন অফিসারের মধ্যে ৭ জনই স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের অসাধারণ সাহসিকতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এ সম্মানে ভূষিত হন। তাঁদের দুই জন বীর উত্তম উপাধি লাভ করেন, যা জীবিতদের জন্য সর্বোচ্চ উপাধি। তৃতীয় এবং অষ্টম ব্যক্তি বীর বিক্রম, পঞ্চম এবং সপ্তম ব্যক্তি বীর প্রতীক, যা ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ উপাধি, এবং চতুর্থব্যক্তি কমান্ডার ইন-চীফের প্রশংসাপত্র পান। বীরত্বের জন্য উপাধি গ্রহন করার সময় যখন তাঁদের মনের অবস্থার কথা জানতে চাওয়া হয় মীর শওকত আলী যুদ্ধে তাঁদের বীরোচিত ভুমিকার প্রতি জাতীয় স্বীকৃতিতে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যুদ্ধে যোগদানে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল কিনা প্রশ্ন করা হলে, তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন এবং বলেন, ‘‘আমরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলাম, আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল না; অধিকন্তু তারা আমাদের বেসামরিক জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাল, সেনাবাহিনীর উপরও আক্রমণ করল।” সুতরাং তারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হল এবং ‘‘একজন সৈনিক হিসেবে শত্রুদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আমার কর্তব্য।”

কে এম সফিউলণ্যাহ তাঁর বীরত্বের জন্য বীর উত্তম উপাধি পাওয়াতে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত গতানুগতিক যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে, তাঁর নামের আদিঅক্ষর এস-ফোর্স নামানুসারে একটি বিগ্রেড গঠন করা হয়। তিনি আরো মনে করেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছিল একটি সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বিষয়। তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নেন ‘‘দেশ ও জনগণের’’ সম্মান রক্ষার জন্য। একমাত্র সন্তুষ্টি “আমার এই যে, আমি যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিলেন।”

হাফিজ উদ্দিন আহমেদ যাকে বীরত্বের জন্য “বীর বিক্রম” উপাধি প্রদান করা হয়, তিনি বলেন ‘‘জাতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্তির এ দিনটি ছিল তাঁর জন্য একটি মহান দিন।” তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধে যোগদান করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহসিকতাপূর্ণ ভুমিকার জন্য মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত

হন। তিনি বলেন যে, যদি তাঁকে পুরষ্কার দেওয়া না হত তবুও তাঁর কোন দুঃখ বা অভিযোগ থাকত না। তিনি কোন পুরষ্কার কিংবা কৃতিত্বের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেননি বরং দেশ ও দেশের মানুষের সম্মান রক্ষা করার প্রত্যয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম যিনি যুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ এবং সাহসী নেতৃত্বের জন্য বীর প্রতীক সম্মানে ভুষিত হন, তিনিও জাতীয় এই স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে গভীরভাবে মুগ্ধ হন।

তিনি আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত। তিনি তাঁর নিজের ভাষায় বলেন, ''তখন বিকল্প কোন পন্থা ছিল না, চিন্তা করার অবকাশ ছিল না; আমরা এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম।"

সেনা অফিসারবৃন্দ কেন রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন?

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে ক্যাপটেন অলি, মেজর জিয়া এবং অন্যান্য বাঙালী অফিসারবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার জন্য ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনর্গঠন করেন। তাৎক্ষণিকভাবে মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যা পরবর্তীতে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সম্প্রচার করা হয়। দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা স্পষ্টত একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সাধারণত জনগণের নিকট স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, যিনি সর্বস্তরের জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্য। স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক নেতারাই সংঘটিত করেন, যদিও সৈনিকবৃন্দ ও অন্যান্য সশস্ত্র ব্যক্তিরা যুদ্ধ করেন। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামরিক অফিসারবৃন্দগন নিজেরাই এই সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নেন, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমর্থন দেন। কীভাবে তাঁরা এ কাজটি করেছিলেন? কেন তাঁরা করেছিলেন? আটজন সেনা অফিসারের দেওয়া তথ্য থেকে চক্রান্তের সঠিক উত্তর বের হয়ে এসেছে।

শাফায়েত জামিল বলেন, দুর্ভাগ্যজনক যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। যদিও শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকার্স ময়দানের জনসভায় ভাষণে বলেছিলেন যে, ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তথাপি ভবিষ্যতে কি করতে হবে, সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। শাফায়েত জামিলের নিজের ভাষায় ''আমাদের দেশের বিভিন্ন দলের এবং মতের রাজনৈতিক নেতারা এর গভীরতা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ফলে সংগ্রামের জন্য কোনও প্রকার বাস্তব ভিত্তিক প্রস্তুতিও ছিল না।" তিনি আরও বলেন যে, ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তানীরা আক্রমন শুরু করলে, সঠিক সময়ে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন।" নেতৃত্ব দেয়ার পরিবর্তে "তিনি গ্রেফতার বরণ করেন"। তিনি আরও বলেন যে, ''এটি ছিল আমাদের নিকট বিস্ময়কর কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন শীর্ষ নেতা।"

এজাজ আহমেদ চৌধুরীর বর্ণনা দেন যে, সেনানিবাসে অবস্থান করার কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্বেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা কিভাবে বাঙালি সেনাদের প্রতি বৈরী হয়ে উঠেছিল, তা বাঙালি সেনা অফিসারগণ বুঝতে সক্ষম হন। তাঁরা শুধু ২৫ মার্চের গণহত্যার ব্যাপারে জানতেন না বরং এমনও ভয় করছিলেন যে, তাঁদেরকে যেকোন সময় নিরস্ত্র করা হতে পারে। মোহাম্মদ আবদুল হালিম বলেন "২৫ মার্চ প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছিল তা আমি জানতাম না, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল।" তিনি বলেন, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা ১৬ মার্চ হতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনারত ছিলেন, ''আমাদের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, পাকিস্তানিরা আলোচনার অজুহাতে সময় ক্ষেপন করে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অবস্থান মজবুত করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

জেনারেল কে এম সফিউলণ্ঢাহও অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, "ভারতের সাথে দ্বন্দের অজুহাত দেখিয়ে" পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানে "সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে"। কিন্তু তারা সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে ভালভাবে জানতেন, পাকিস্তানিরা কি করতে চান। সুতরাং এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে ''এবং তাদের সন্দেহজনক আচরণ আমাদের আরো ভাবিয়ে তোলে।" সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমও মোটামুটি একই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকেই ''রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে আহ্বানের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে আমরা কোন আহ্বান পাই নাই। মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।" হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''আমরা জানতাম, পাকিস্তানীরা আমাদের ধ্বংস করতে যাচ্ছে। তারা বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে যাচ্ছে।"

তিনি বলেন ''অন্যান্য স্থানেও বাংলাদেশি ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হয়।" এই সকল বিষয় মাথায় রেখে তিনি বলেন, ''পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেওয়ার, আমাদের জন্য এটাই ছিল উপযুক্ত সময়।"

মোহাম্মদ আইনুদ্দিন উলেণ্ঢখ করেন যে, ৩রা মার্চ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ এমন ছিল যে, "সাধারণ জনগনের নিকট স্বাধীনতা ব্যতিরেখে অন্য কিছু গ্রহনযোগ্য ছিল না।" কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে পাকিস্তানি জেনারেলদের সাথে আলোচনারত ছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন যে, ''স্বভাবতঃ এটা আমাদেরকে হতাশ করে।" বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে জেনারেল শওকত আলী বলেন যে, ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। ''এই ধরণের পরিস্থিতিতেও" তিনি বলেন, "ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো এবং শেখ মুজিবের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। তাঁরা ছিল রাজনৈতিক পক্ষ; কিন্তু একজন সৈনিক হিসেবে আমি

চট্টগ্রামের পরিবেশে অশুভ লক্ষণ দেখতে পাই, সবাই সবাইকে সন্দেহ করছিল।" এই ধরনের একটি সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক কোনো নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলি একটি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতঃপর মেজর জিয়া ঘোষণা করেন যে, ''আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করব।" অতঃপর তিনি অধিকতর সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে নিরাপদ স্থানের খোঁজে ষোলশহর মার্কেট থেকে কালুরঘাটের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। "জিয়া সকলকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শপথ দেন।"

সহায়ক বইসমূহ ঃ

১। মওদুদ আহমেদ, *ডেমোক্র্যাসি এন্ড দি চ্যালেঞ্জ অব ডেভেলপমেন্ট*, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।

উপসংহার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাঙ্গালী সেনা অফিসারদের ভূমিকা ও উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ের উপর আলোকপাতপূর্বক আলোচ্য গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি সেনা বাহিনীর ভুমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ মেজর জিয়ার সাথে পরামর্শক্রমে ২৫-২৬ মার্চ রাতে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্যদের সাথে নিয়ে, পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেন[৪]। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন[৫]। এ সকল অফিসারবৃন্দ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। চট্টগ্রামে অবস্থানরত বাঙালি সেনা অফিসারদের গৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁদের অধীনস্থ অন্যান্য অফিসার এবং সেনা সদস্যরা অনুসরণ করেন।

এই সকল অফিসারগণ শুধু যুদ্ধই শুরু করেন নি; বরং ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সাল শেখ মুজিবর রহমানকে (অনুপস্থিতিতে) রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন ঃ "জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ব্যাপক বিমান, নৌ এবং পদাতিক বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং সাহসী জনগণ যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে, যাকে অনেকটা স্ট্যালিনগ্রেডের প্রতিরোধ যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যায়।" (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস অব লিবারেশন ওয়ার, ২, ৫)। তিনি আরও বলেন যে, প্রাথমিক বিজয়ের পর মেজর জিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন (বাংলাদেশ ডকুমেন্ট অব লিবারেশন ওয়ার ২, ৫)। ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে এগিয়ে আসার জন্য মিলিটারী অফিসারদের কে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন? কোন পরিস্থিতি তাঁদের পেশাগত আদর্শ বিষর্জণ দিতে প্রণোদিত করেছিল? রাজনীতিবিদদের যা করা উচিত ছিল, তারা কেন ঐ কাজটি করেছিল। এই গবেষণা, পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি তুলে ধরে, যা বাঙালি সেনা অফিসারদের মধ্যে

[৪] এই অফিসার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ৮ম-ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিপণ্ডবের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন (অলি আহমদের ১৯৭২ সালের বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদন, যা ১৯৭৩ সালের ৮ই আগস্ট জিয়াউর রহমান স্বাক্ষরিত, পরিশিষ্ট-৮)।

[৫] "প্রকৃত পক্ষে ক্যাপ্টেন অলি আহমদই সর্ব প্রথম অফিসার যিনি ঝুঁকি নিয়ে এবং নিজ উদ্যোগেই মেজর জিয়াউর রহমানকে মার্চের ২৫/২৬ তারিখ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেন। (অলি আহমদের ১৯৭৩ সালের বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদন, যা ১৯৭৪ সালের ৮ই মার্চ ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী স্বাক্ষরিত, পরিশিষ্ট-৮)।

জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করে এবং ঐ সময় রাজনৈতিক নেতাদের সীমাবদ্ধতা বিশেণ্টষণপূর্বক, একটি পেশাজীবি শ্রেণীর বিদ্রোহী সেনায় রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব ছিল। "১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের" পর থেকে ব্রিটিশেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট জাতি ও গোষ্ঠীকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে বাদ দেয়। ঐ সময় থেকে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, শুধু ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তথাকথিত 'যুদ্ধবাজ জাতি' কেন্দ্রিক ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত এই নীতি প্রত্যাহার করে, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ঐ সকল জাতি এবং গোষ্ঠীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়। তবে পাকিস্তানে পূর্বের নীতি চলতে থাকে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অফিসার এবং অন্যান্য পদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৮ থেকে ৯ ভাগের বেশি ছিল না। তাই বাঙালি সেনা অফিসারগণ সর্বদা অবিচার ও বঞ্চনার তীব্র বেদনা অনুভব করতেন। নির্বাচনে বিজয়ের উপর তাঁদের আশা আকাঙ্খা নির্ভর করছিল, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এতে তাঁদের কিছু দুর্দশার লাঘব হবে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা তাদের মর্মাহত করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বীকৃত নেতা, শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জনের দাবিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছয় দফা আন্দোলন যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের জন্য প্রকৃত ম্যাগনাকার্টা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল, তা তিনি প্রণয়ন করে এই বিপদগ্রস্থ জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পরে এই প্রথম সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে, জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে, শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও এই নির্বাচনে ছয় দফা কর্মসূচীকে গণভোট হিসেবে গ্রহণ করে। নির্বাচনের পর সংসদীয় পদ্ধতির নিয়মানুসারে তিনি মনে করেন যে, অবশেষে তাঁর দল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবে। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে কার্যত ক্ষমতার কার্যকরী রদবদল হিসেবে ধরে নেন। তিনি ছয় দফা কর্মসূচির আলোকে প্রস্তাবিত সাংবিধানিক পরিবর্তন চূড়ান্ত করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁর কর্মকা⇁ পরিচালনা করতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও তাঁকে একবার পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সম্বোধন করেন এবং ঘোষণা দেন যে,

৩ মার্চ ১৯৭১ সাল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ আশা করেছিলেন যে, অবশেষে ইসলামাবাদে তাঁদের প্রতিনিধিগণ ক্ষমতাসীন হবেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র ২ দিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগনকে হতাশায় ডুবিয়ে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর অধিবেশনে যোগ দেয়ার অনিচ্ছাকে প্রাথমিক কারণ হিসেবে উলেণ্ডখ করে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ধরে নেওয়া হয়, তাদের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরদিন ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এটি একটি অশুভ চক্রান্ত। ছাত্ররা এবং শিক্ষকেরা, শ্রমিকেরা এবং মজুরেরা, আইনজীবীরা এবং বুদ্ধিজীবীরা সকলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সর্বস্তরের জনগন বুঝতে পারেন যে, ছয় দফা কর্মসূচী প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এক দফা আন্দোলনের দাবি উঠতে থাকে আর তা হল- পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের সকল শক্তিশালী নেতাকর্মীদের নিকট থেকে প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রায় ১০ লক্ষ জনতার বিশাল সমাবেশে তিনি ভাষণ দেন। তিনি তাঁর দাবিদাওয়াগুলি সেখানে জোরালোভাবে তুলে ধরেন, কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। যুগপৎভাবে আওয়ামী লীগ তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ফলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন, দৃশ্যত তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চান এবং একদিকে তিনি আলোচনা ১০ দিন দীর্ঘায়িত করেন, অন্যদিকে এ সময়ে বিমানযোগে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে আসতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির নিকট একটি খসড়া ঘোষণা পেশ করেন। যাতে মূলতঃ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছিল এবং তাঁরা আশা করেছিলেন যে, শাসকগোষ্ঠী তা করবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান, যাহা হউক আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা ভঙ্গ না করে, উদ্ভুধ সমস্যার সামরিক সমাধানের সিদ্ধান্ত নেন। পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। এভাবে এক নিষ্ঠুর ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর দলীয় নেতাদেরকে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন।

দেশের ইতিহাসের এ ক্রান্তিলগ্নে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, একদল বাঙালী তরুণ সামরিক অফিসার পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশায় ইতিবাচক সাড়া দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত গণবিদ্রোহের মাধ্যমে, পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। অবশেষে দেশের সকল সেনানিবাসের, তাঁদের বাহিনী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। বাঙ্গালী সেনা অফিসারবৃন্দ, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখেন। এ গবেষণায় ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে, এসকল সামরিক অফিসারবৃন্দের প্রেরণা, আদর্শ এবং কর্মকা- সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বপ্রণোদিত একতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়। একতার পিছনে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হল, প্রধানত দুই অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্যের ভীতি। এই দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া, জাতি হিসেবে মানুষের মধ্যে যে সকল গুনাগুণ তাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য ও বন্ধন সৃষ্টি করে এবং জাতি হিসেবে একত্রিত রাখার প্রেরণা যোগায় তার কোনটাই পাকিস্তানে ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বংশপরম্পরায় একটি স্থায়ী রাজনৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে বসবাসের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁরা কখনো একটি অভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনেও ছিল না, যা হয়তো তাদের মধ্যে একটি সাধারণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ লালন করতে সহায়ক হত। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাদের মধ্যে মিল ছিল না। এই দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একমাত্র সাধারণ বন্ধন ছিল, কিছু ইসলামী মূল্যবোধ এবং হিন্দু প্রধান ভারতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১০০০ মাইল এবং দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল ভারত। এই ভৌগোলিক দূরত্বের ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যে মানুষের শারীরিক গঠন এবং জলবায়ুগত পার্থক্য ছিল। ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ুগত পার্থক্য দুই অঞ্চলের মধ্যে শুধু কৃষি পদ্ধতিতে ভিন্নতা গড়ে তোলেনি; খাদ্যাভাস, পোশাক, রীতি-নীতি এবং প্রথাও ছিল ভিন্ন। এভাবে গড়ে উঠে দুটি পৃথক সংস্কৃতি। এই ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে, একই দেশের অন্তর্ভূক্ত একটি সমাজে ভিন্ন দুটি সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি এবং সামাজিক মেলামেশাও ব্যাহত করে। দুই অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যেও তারতম্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান আয়তনে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ছয়গুণ ছোট হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ৭ গুণ বেশি।

ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ুগত তারতম্য পাকিস্তানে ভাষাগত জটিলতাও সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মাতৃভাষা ছিল, বাংলা; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে বিদ্যমান ছিল জটিল ভাষা বৈচিত্র্য। বাংলা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় অপরিচিত একটি ভাষা। অনুরূপভাবে অধিকাংশ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত উর্দু, পাঞ্জাবি কিংবা পস্তু ভাষা কখনও গ্রহন করতে পারে নাই। উভয় অঞ্চলে বর্ণমালা ও ভাষার পার্থক্য, একে অপরের ভাষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

যদিও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইসলামী রীতি-নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথাপি দুই অঞ্চলের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম ধর্ম ছিল বেশ উদার প্রকৃতির। মৌলিক আচার-নিষ্ঠতার চেয়েও আদর্শই ছিল, এখানকার জনগণের নিকট অধিক আবেদনশীল। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম ধর্ম ছিল বেশ রক্ষণশীল এবং কট্টরপন্থী। জাতি বৈচিত্র্যের দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তান ছিল অধিক সমপ্রকৃতির। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ জনেরও বেশি একটি অভিন্ন জাতিভুক্ত ছিল, তা হল বাঙালি; পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক জাতি ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর সমন্বয় সামাজিক বৈচিত্র্য গড়ে তোলে। এই সকল কারণে জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তান একটি "দ্বৈত-রাষ্ট্র" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

জাতীয় অখ-তা রক্ষার জন্য পাকিস্তানে কিছু নীতিমালা প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে সতর্কতা এবং সুপরিকল্পিতভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করলে, উভয় অঞ্চলের মানুষকে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রণোদিত করা সম্ভব হতো। উভয় অঞ্চলের মধ্যে অধিকতর একতা লালন করা এবং ব্যবধান কমানোর জন্য কিছু সৃজনশীল পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। যাহা হউক, শাসকশ্রেণী শুরু থেকে এমন কিছু নীতি অবলম্বন করে, যার ফলে দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঘনিষ্টতা প্রসারের পরিবর্তে বিদ্যমান কাঠামোগত পার্থক্য আরও বাড়িয়ে তোলে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে উপনিবেশিক ভারতে বৃটিশদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আদলে গড়া বেসামরিক ও সামরিক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক নীতির ফলে, পূর্ব-পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে বুদ্ধিদীপ্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের গঠনতান্ত্রিক উত্তরাধিকার বহন করে, পাকিস্তানি আমলারা একই পদ্ধতিতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে, অনুরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে পাকিস্তানে সামাজিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। রাজনৈতিক পদ্ধতিও ব্রিটিশ-ভারতের সাথে কমবেশি মিল ছিল, যা অত্যন্ত কেন্দ্রীভুত ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা এবং আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ঐতিহাসিক কারণে, শুরু থেকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা

ছিল। দেশ বিভাগের সময়, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের শুধুমাত্র ২ জন অফিসার ছিল এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ১৭৫ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসাদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে এবং ১৯৫০-৬৮ সালের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের শতকরা ৪০ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, তথাপি প্রশাসনে সার্বিক প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৩০ জনের কম ছিল। এছাড়াও এই প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্ন পদমর্যাদায় এবং এমন বিভাগে, যা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নাই। বেসামরিক অফিসারদের ন্যায়, সকল শীর্ষ পদে সামরিক অফিসারও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতকরণ নীতি, পশ্চিম পাকিস্তানীদের আধিপত্য নিশ্চিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশকে, জাতীয় নীতিমালায় বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। তবে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমতার কারণে কিছুটা ভারসাম্য ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক হস্তক্ষেপের পর এ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ সামরিক শাসন ছিল মূলতঃ আমলাদের শাসন, যেখানে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই নগন্য। এই ধরণের নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে, সর্বপ্রথম বাঙালিরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলতে তৎপর হয়। বহুমাত্রিক সমাজে পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক আত্মীকরণনীতির ফলে, পূর্ব-পাকিস্তানীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আরও আবেগপ্রবণ হয় এবং তাদেরকে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শাসকশ্রেণী মনে করতেন যে, হয়তো শুধু একটি অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিকট উর্দু সম্পূর্ণ অজানা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার প্রচেষ্টাকে পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রবলভাবে বিরোধিতা করেন। কারণ তারা মনে করেছিল যে পাকিস্তানীরা এর মাধ্যমে বাঙালীদেরকে রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিকভাবে দমিয়ে রাখার একটি অপকৌশল। ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের পরও, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালে সংবিধানে উর্দু এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তির সূচনাকে অধিকতর সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে এবং ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবী ঐক্য গড়ে তোলে, যা পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী সকল আন্দোলনে সাহায্য করে।

সংক্ষেপে, শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতকরণ নীতি এবং সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নই করেনি বরং তাদেরকে সতন্ত্র পরিচয়ের ব্যাপারেও সচেতন করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানিদের সবসময় মনে করিয়ে দিত যে,

পাকিস্তানের কোন কর্মকাে তাদের সমান অংশদারীত্ব এবং অংশগ্রহণ ছিল না এবং এমন কি নিজেদের কর্মকান্ডেও তাদের কর্তৃত্ব ছিল না।

প্রশাসনিক কেন্দ্রীভূতকরণ এবং সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নীতি পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে অধিকতর আবেগ প্রবণ করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম নেয়। অর্থনৈতিক নীতি, যা সরাসরি নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের ব্যাপারেও জনগণ মারমূখী হয়ে উঠে এবং বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে বাঙালি সেনা অফিসারগণ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অমিল ছিল, কিন্তু উভয় অঞ্চল দুইটি বিষয়ে অভিন্ন ছিল যেমন- শিল্পে অনুন্নত এবং কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপাদন করত। স্বাধীনতার সময়, দুই অঞ্চলে শিল্পের অবস্থান প্রায়ই সমান ছিল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান সামান্য ব্যবধান প্রতি বছর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০ এর দশকে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১৯৪৯/৫০ সালে এ ব্যবধান ছিল শতকরা ১৯ শতাংশ এবং ১৯৫৯/৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ শতাংশ এবং ১৯৬৯/৭০ সালে শতকরা ৬১ শতাংশ।

দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধির হারের প্রাথমিক কারণ ছিল শিল্পায়নে বৈষম্য। ১৯৪৯/৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক শিল্প উৎপাদন থেকে আসে শতকরা ৯.৪ শতাংশ এবং ১৯৬৯/৭০ সালে এই প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২০ শতাংশ। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে মোট আঞ্চলিক উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ আসে শিল্প খাত থেকে, যদিও ১৯৪৯/৫০ সালে এ হার ছিল মাত্র শতকরা ১৪.৭ শতাংশ। ১৯৪৮ সালের পর থেকে পাকিস্তান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি, উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যমূলক বিনিয়োগের হারই ছিল প্রবৃদ্ধির ব্যবধানের প্রধান কারণ। ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের বিনিয়োগের অংশ শতকরা ২১ থেকে ২৬ শতাংশ এবং ১৯৬০ এর দশকে ৩২ থেকে ৩৬ শতাংশ এর মধ্যে উঠানামা করত। কিন্তু মূলতঃ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বৃহত্তর অংশ ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-পরিকল্পনার সময় (১৯৪৭-১৯৫৫) পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে মাথাপিছু উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২২.০৮ এবং ৩৭.৭৫ রুপি এবং অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ১০৮.০৩ এবং ২০১.৯৪ রুপি। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রেও একই ধরণের বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করা হত। পূর্ব-পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্য এবং মার্কিন পণ্য সহযোগিতার শুধুমাত্র শতকরা যথাক্রমে ১৭ ও ৩০ শতাংশ বরাদ্দ পেত। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পেত যথাক্রমে ৮৩ ও ৭০ শতাংশ।

উভয় অঞ্চলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের বৈষম্যমূলক বরাদ্দ ছিল, পাকিস্তান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কৌশলের অনিবার্য ফসল। বিশাল ভৌগোলিক দুরত্বে অবস্থিত দুটি অঞ্চলের জন্য 'এক-অর্থনীতি' নীতিতে উদ্যোক্তা উদ্যোগ, পাকিস্তানের উন্নয়ন কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আমলারা কর্মদক্ষতা এবং উন্নয়নশীলতার দোহাই দিয়ে এটা সমর্থন করত। অপেক্ষকৃত কম জনসংখ্যার বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তান আনুপাতিক হারে আর্থ-সামাজিক, বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানের রেলওয়ে ছিল অধিক উন্নত এবং দেশবিভাগের ফলেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। করাচি বন্দর ছিল অনেক উন্নত। পূর্ব-পাকিস্তানে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। চট্টগ্রাম বন্দর তখনও উন্নত ছিল না। এমত অবস্থায় গৃহীত 'এক-অর্থনীতি' নীতি বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের গতিকে আরও তরান্বিত করে তুলে।

পশ্চিম পাকিস্তান মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৪৬ শতাংশ জনগণের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও, পক্ষপাতমূলকভাবে মোট বরাদ্দের শতকরা ৭৫ শতাংশ ব্যয় করে, ফলে শুধু আয় এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগই বৃদ্ধি করে নি বরং ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সহায়ক পরিবেশও সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (আই ডি বি পি), দি পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (পি আই সি আই সি) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে।

উভয় অঞ্চলের মধ্যে অসমানুপাতিক ব্যয় এবং প্রাইভেট সেক্টরের পার্থক্যমূলক প্রবৃদ্ধি ছাড়াও, সরকারের কৃষি নীতি বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে। পাকিস্তান সরকার প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে শিল্পায়নের নীতি অবলম্বন করে এবং শিল্পায়নে সফলতার প্রচেষ্টা চালায়, কৃষি খাত থেকেও উদ্বৃত্ত সরানোর উপযোগী রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। যা শিল্প খাতে পুনরায় বরাদ্দ করা হতো। অনুমান করা হয় যে, মোট কৃষি পণ্যের আর্থিক মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ সরিয়ে শিল্প এবং উৎপাদন খাতে ব্যবহার করা হত। কৃষকের উপর এর বোঝা ছিল তাদের মোট আয়ের শতকরা ১০ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তান এ নীতির ফলে ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের রপ্তানির অংশ পশ্চিম পাকিস্তা নের চেয়ে অধিক ছিল এবং রপ্তানির বৃহত্তর অংশ আয় হত কৃষিপণ্যের মাধ্যমে। কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শিল্প খাতে স্থানান্তর ছিল, মূলতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা। অধিকন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের মাধ্যমে এবং আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যের ঘাটতি, পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হত। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্যও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হত। মাহবুব-উল হক এর ধারণায়, ১৯৫০ হইতে ১৯৫৫ সালের মধ্যে

প্রতিবছর এরূপ স্থানান্তর ছিল ২১০ মিলিয়ন রুপি এবং বোধ হয় ১৯৫৬ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রতিবছর ১০০ মিলিয়ন রুপি। অর্থনীতিবিদদের উপদেষ্টা পরিষদের মতে, এরূপ সম্পদের স্থানান্তর প্রতিবছর ১,৫৫৬ মিলিয়ন রুপি হারে সর্বমোট ৩১,১২০ মিলিয়ন রুপি হবে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানের টাকার বিনিময়ে উন্নতি লাভ করে। এসব কারণ, বাঙালি নেতাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন, বিশেষভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে। যখন তারা বুঝতে পারেন যে, আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসিত পদ্ধতি, তাদেরকে জাতীয় সম্পদের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তখন তারা পদ্ধতিগত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনায়নের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। "ছয় দফা কর্মসূচি" যা আমলাদের নীতি নির্ধারণীর প্রতিবাদে ছিল, পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, তার গুরুত্ব কেবল এ প্রেক্ষাপটেই সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়।

ছয় দফা কর্মসূচি ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ আর্থ-রাজনীতিক দলিল। রাজনৈতিকভাবে ইহাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা ছিল, যাতে বাঙালিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়; অর্থনৈতিকভাবে, এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বাঙালিদের তত্ত্বাবধানে থাকে; সামরিক দিক থেকে, এই ব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পদক্ষেপও ছিল। ছয় দফা কর্মসূচি, যাহা ১৯৬৬ সালে গৃহীত হয়, ১৯৫০ সালে গৃহীত বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কারণ এতে বলা হয় যে, প্রাদেশিক সরকারের পৃথকভাবে বিদেশের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার থাকবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখবে। এতে আরও বলা হয় যে, প্রদেশগুলির নিজস্ব সামরিক এবং আধাসামরিক বাহিনী থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসিত সরকার পদ্ধতির কথা বলা হয়।

ইহাতে গঠনমূলক এবং মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাব থাকার কারণে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করে। উঠতি ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের কাছেও মানসিক আবেগ ছিল, কারণ এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়। এ কর্মসূচি শহরের বেতনভুক্ত পেশাজীবীদেরও আকৃষ্ট করে। কারণ এতে তারা ভবিষ্যতে উন্নতির নতুন সম্ভাবনা দেখতে পান। বাঙালি কর্মকর্তারা ইহা আগ্রহসহকারে সমর্থন করেন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পদোন্নতির চাবিকাঠি এর মধ্যে অর্ন্তনিহিত। সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দরাও এর পক্ষে ছিলেন কারণ তাদেরও পদোন্নতির পদ অবারিত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানেও অবস্থান সুদৃঢ় হবে। এ গোষ্ঠীগুলোই ছিল মূলতঃ আওয়ামী লীগের

প্রধান সহায়ক শক্তি এবং সমাজের রাজনীতিক সচেতন শ্রেণীর অপরিহার্য অংশ। শ্রমিকেরাও স্বল্প মজুরির কারণে এতে সমর্থন যোগায়। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত অধিকাংশ শিল্প কারখানার মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। ফলে শ্রেণী, আঞ্চলিক ও জাতিগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরাও পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং ছয় দফা দাবিই ছিল সকলের পরিবর্তনের প্রতীক।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বকে আরও তীব্রতর করার প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আওয়ামীলীগ পূর্ব পাকিস্তানে উঠতি মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, সুতরাং সাধারণ নির্বাচনকে তারা ছয় দফা কর্মসূচির গণভোট হিসেবে গন্য করেন। নির্বাচনের ফলাফল ছিল তাদের ধরণাতীত, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। ফলে আওয়ামীলীগ স্বভাবতই ক্ষমতায় যাওয়ার আশা করেছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, যাহা হউক আওয়ামীলীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। বাঙালিদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা তাদের ছিল না। ১লা মার্চ ১৯৭১ সালে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের, জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণাটি ছিল, একটি অশুভ ইঙ্গিত। ছয় দফা আন্দোলন, অজান্তে ঐ বিশেষ মুহূর্তে, এক দফা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং তা হলো স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর শীর্ষ পর্যায়ের কিছু সংখ্যক আমলা এবং জেনারেলবৃন্দ সময়ক্ষেপন করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান দৃশ্যতঃ আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধান দেয়ার অজুহাতে ঢাকা আসেন। কিন্তু পরিশেষে এটা প্রমাণিত হয় যে, দীর্ঘ সূত্রিতা আলোচনার অজুহাত দেখিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিমান ও সমুদ্র পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈনিক ও যুদ্ধোপকরণ নিয়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শক্তি বৃদ্ধিকরণ। যাহা হউক, শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর উপদেষ্টারা এই আলোচনাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত আগ্রহের সাথে চালিয়ে যান। আশা করেছিলেন, পাকিস্তানীরা পরিশেষে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। বাঙালি সেনা অফিসারবৃন্দ, বিশেষ করে যারা চট্টগ্রামে অবস্থানরত ছিলেন, একমাত্র সমুদ্র বন্দরের কাছাকাছি থাকার কারণে, কি ঘটতে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানিরা কিভাবে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তা জানতেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলবৃন্দ আলোচনার চুড়ান্ত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিকভাবে, তারা শুধু পাকিস্তানের নিরাপত্তা এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, ছয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রার আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং করারোপ প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের

ফলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আকার ছোট হবে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রচন্ডভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। বাঙালি নেতাদের নিকট, যাহা হউক, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অর্থই ছিল, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, বাঙালিদের মনে একটি অমোচনীয় দাগ কাটে, কারণ ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বিশেষতঃ জেনারেলরা, যারা ঐ পর্যায়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত, ছয় দফা কর্মসূচীকে বিভক্তকারী হিসেবে তারা প্রত্যাখ্যান করেন, আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে, আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ছাড়াই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে ঘুমন্ত বাঙ্গালীদের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণ করেন।

''একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, পূর্ব ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা" সংক্রান্ত বিপণ্ঢবের ধারণা, এই গবেষণায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং ক্ষমতার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। পদমর্যাদায় ছোট হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি সেনা অফিসারবৃন্দ, চূড়ান্ত মুহূর্তে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বিপণ্ঢবের নেতা হিসেবে জাতির ভাগ্য গঠনে সহায়তা করেন। অন্যান্য কিছু কিছু দেশের সেনাবাহিনীর অনুরূপ, ঐ সময় নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ না করে, দক্ষতার সাথে অগ্রসর হন। বরং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানি লুণ্ঠনকারী দখলদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করা এবং একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এটি একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে যে, একদল সামরিক অফিসার এবং সৈনিকবৃন্দ প্রচন্ড জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, জীবন ও সামাজিক অবস্থানের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে তাঁদের ভাইদের পাশে দাঁড়ান। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং প্রশিক্ষিত সেনাসদস্যরা তাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্র বিপণ্ঢবের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা নিজ উদ্যোগে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনীই ছিল আন্দোলনের প্রতীক এবং তাদের হাতেই ছিল বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান।

ঐ সময় চট্টগ্রাম, কুমিলণ্ঢা, যশোর, সৈয়দপুর এবং ঢাকা সেনানিবাসসমূহে আনুমানিক ৫০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার এবং ৫,০০০ সৈনিক ছিল। এছাড়াও জাতীয় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আনুমানিক ১৫,০০০ ইপিআর

এবং আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙ্গালী অফিসারদের একটি বাড়তি সুবিধা ছিল। কারণ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পাকিস্তানিরা কীভাবে বহু অস্ত্রশস্ত্র এনে, পূর্ব-পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান মজবুত করছিল, তা তাঁরা খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায়। কুমিলণ্ঢা সেনানিবাস চট্টগ্রামের কাছাকাছি হওয়ার দরুণ তাদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ ছিল। অধিকন্তু চট্টগ্রামে একটি বেতার কেন্দ্রও ছিল।

যে সকল বাঙালি অফিসার মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা ছিলেন রাজনীতিভাবে অত্যন্ত সচেতন এবং মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁরা শুধু সশস্ত্র বাহিনীতে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তাই নয়, বরং কেউ কেউ বৈষম্যমুলক নীতিরও স্বীকার হয়েছেন। সামরিক আইন জারির পর আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক রাজনীতির ভাব প্রকাশের পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমলাতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আচ্ছাদিত রূপে পরিণত হয়, ফলে তাঁদের অভিযোগ আরও জোরালো হয়ে উঠে।

অনেক সেনা অফিসার পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং শেখ মুজিবের সাথেও ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁদের অনেকে আওয়ামীলীগ নেতাদের কাছে গোপন তথ্য জানাইয়ে দিতেন এবং দলিল সরবরাহ করতেন। যা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরো জোরালো করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই ছিল না, বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক অফিসারবৃন্দ শেখ মুজিবের গণ-অনাস্থা এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে ১৯৭১ সালের ১মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের পুরো প্রশাসনকে অচল করে দেন। শুধু এই প্রেক্ষাপটেই, বাঙালি সেনা অফিসারদের ভূমিকা সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকারের সময় পাওয়া তথ্য থেকেও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রমাণ মিলে। তাঁরা সকলে এমন মত প্রকাশ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য তাদেরকে এক "সুবর্ণ সুযোগ" সৃষ্টি করে দেয়, যা প্রায় "পাকিস্তানের একটি কলোনি" হিসেবে ছিল। সেহেতু, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর কবল থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্ত করে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি। এমনকি আজও তারা গভীর অনুভূতিতে আপণ্ডুত হয়ে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকে জীবনের সর্বোত্তম কাজ হিসেবে স্মৃতিচারণ করেন। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারার সৌভাগ্যময় স্মৃতি, এখনও তাঁদের চেতনাকে জীবন্ত করে তোলে। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে পূর্ব-পাকিস্তানে

কী ঘটছিল তা তাঁদের জানা ছিল এবং তারা কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দেননি বরং একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা সবাই আশা করেছিলেন যে, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। তাঁদের অনেকেই মনে করেছিলেন তখনই ছিল উপযুক্ত সময়। ১৬ই মার্চ ১৯৭১ সাল যখন তাঁরা শুনলেন, যে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় বসার জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন তাঁরা অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, এই অজুহাতে পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অধিকতর সময় ক্ষেপন করছিল। ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে তাদেরই একজন সহকর্মী মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধে যোগদান করার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এদের অনেকেই তাদের সহকর্মী এবং সেনা সদস্যদের সাথে আলোচনা করে যুদ্ধে যোগ দেন। তারা মুক্তিযুদ্ধকে "জনগণের যুদ্ধ" এবং "জনগণ ও একটি হানাদার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ" হিসেবে গ্রহণ করেন।

একটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক কাজ, স্বভাবতঃ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতাই এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকরা যুদ্ধ করেন। এই ক্ষেত্রে, সামরিক অফিসারবৃন্দই কাজটি করেন। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি ''সুপরিকল্পিত আলোচনার" ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। Mascarenhas এর ভাষায় এটি এই "শতাব্দীর নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক প্রতারণা" (Mascarenhas, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১)। এইভাবে রাজনৈতিক নেতারা দ্বিধাগ্রস্থ এবং আনাড়িপনার কারণে অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। সেনা অফিসারগণ বুঝতে পারেন যে, জনগণের কাছে ''স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই গ্রহণ যোগ্য ছিল না"। তারা বাংলাদেশের জনগণের লালিত স্বপ্ন পূরণে সঠিক সময়ে সাড়া দেন। কিছু সংখ্যক অস্ত্র ও সশস্ত্র সদস্যদের নিয়ে সর্বোচ্চ জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সম্মুখের দিকে এগিয়ে যান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেখানে ব্যর্থ, সেখানে তারা সফল হন। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁদের কোন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না। তাই ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার গঠনের পর, তাঁরা সরকারের নেতৃত্বাধীন থেকে দীর্ঘ নয় মাস বিভিন্ন রণক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অবশেষে জনগণের স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ''সোনার বাংলা" অর্জন করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করেন।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। গভার্ণমেন্ট অফ বাংলাদেশ, ডকুমেন্টস অব দি লিবারেশন ওয়ার, ভলিউম-২।

২। Mascarenhas, Anthony, দি সানডে টাইমস, (লন্ডন), ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

পরিশিষ্ট-১

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি অফিসার এবং সৈনিকদের তালিকা এবং অবস্থান

১। চট্টগ্রাম শহরসহ চট্টগ্রাম সেনানিবাস মোট সংখ্যা ছিল ঃ ক) প্রায় ২০০০ প্রশিক্ষণরত সৈনিক এবং খ) ২০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক	চট্টগ্রাম সেনানিবাস (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার) অফিসারবৃন্দ ঃ ১) ব্রিগেডিয়ার এম.আর. মজুমদার (২৩ মার্চ ১৯৭১ সাল, ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়) ২) লেঃ কর্নেল এম.আর. চৌধুরী (২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল, রাত্রে হত্যা করা হয়) ৩) ক্যাপ্টেন মহসিন উদ্দিন আহমেদ (১৯৮১ সালে শহীদ জিয়ার হত্যা মামলায় ফাঁসি দেওয়া হয়) ৪) ক্যাপ্টেন এনামুল হক ৫) ক্যাপ্টেন আব্দুল আজিজ ৬) ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া ৭) ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী (২৩ মার্চ ১৯৭১ সাল, ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়)
চট্টগ্রাম শহর এলাকায় মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ঃ ক) উপস্থিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০ জন এবং অন্যরা ছিল ছুটিতে ও পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়ান সেনানিবাসে।	৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসারবৃন্দ ঃ ১) মেজর জিয়াউর রহমান, পি এস সি (তিনি পরে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন এবং ৩০ মে ১৯৮১ সালে একদল সেনা অফিসারদের হাতে নিহত হন)। ২) মেজর মীর শওকত আলী, পি এস সি ৩) ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান ৪) ক্যাপ্টেন সাদেক হোসাইন

	৫) ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ৬) লেঃ মাহফুজুর রহমান (১৯৮১ সালে শহীদ জিয়ার হত্যা মামলায় ফাঁসি দেওয়া হয়) ৭) লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরী (১১ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি হন)
পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ঃ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার	চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর অফিসারবৃন্দ ঃ ১) মেজর শামসুদ্দিন আহমেদ ২) ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ৩) ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী
চট্টগ্রামে কর্তব্যরত বিভিন্ন স্থানে অফিসারবৃন্দ	১) ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দিন ২) ক্যাপ্টেন আবুল বাসার
২। কুমিলণ্ঢা সেনানিবাস ঃ মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন। ক) উপস্থিত সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০ জন এবং অন্যরা ছিল ছুটিতে ।	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিলণ্ঢা সেনানিবাস থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অবস্থানরত ছিল। অফিসারবৃন্দ ঃ ১) মেজর খালেদ মোশাররফ (৮ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সেনা বিদ্রোহে সৈনিকদের দ্বারা নিহত হন) ২) ক্যাপ্টেন শাফাত জামিল ৩) ক্যাপ্টেন আবদুল মতিন ৪) ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন ৫) ক্যাপ্টেন আব্দুল গাফফার হালদার ৬) লেঃ মাহবুবুর রহমান ৭) লেঃ ফজলুল কবির ৮) লেঃ হারুনুর রশিদ
কুমিলণ্ঢা সেনানিবাসে কর্তব্যরত অফিসারবৃন্দ	১) মেজর খালেক (৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে নিহত হয়)

	২) ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. হায়দার (৮ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সেনা বিদ্রোহে সৈনিকদের দ্বারা নিহত হন) ৩) লেঃ ইমামুজ্জামান
৩। ঢাকা সেনানিবাস ঃ মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন এবং তন্মধ্যে প্রায় ১০০ জন ছিল ছুটিতে।	২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢাকা সেনানিবাস থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে জয়দেবপুরে অবস্থানরত ছিল। অফিসারবৃন্দ ঃ ১) লেঃ কর্নেল রকিব উদ্দিন (তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি) ২) মেজর কে. এম. শফিউলণ্ঢাহ ৩) মেজর নুরুল ইসলাম ৪) মেজর মইনুল হোসাইন চৌধুরী ৫) ক্যাপ্টেন এ.এস.এম. নাসিম ৬) ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান ৭) লেঃ ইজাজ আহমেদ চৌধুরী ৮) লেঃ এস. গোলাম হেলাল মোর্শেদ ৯) সেকেন্ড লেঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম
ঢাকা সেনানিবাসে কর্তব্যরত অফিসারবৃন্দ	১) ক্যাপ্টেন এ.জে.এম. আমিনুল হক ২) ক্যাপ্টেন আকবার হোসাইন
৪। যশোর সেনানিবাস ঃ মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ক) প্রায় ৩৫০ জন ছিল ছুটিতে খ) প্রায় ১৫০ জন সৈন্য তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করত। গ) প্রায় ২০০ জন সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।	১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসারবৃন্দ ঃ ১) লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিল (তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি) ২) লেঃ হাফিজ উদ্দিন ৩) সেকেন্ড লেঃ আনোয়ার (৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে নিহত হন)

	৪) সেকেন্ড লেঃ শফি ওয়াসিউদ্দিন (তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি)
৫। সৈয়দপুর সেনানিবাস ঃ মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ক) প্রায় ৪০০ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খ) অন্যরা ছিল ছুটিতে ।	৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসারবৃন্দ ঃ ১) মেজর নিজাম (১৯৭১ সালে মার্চ মাসে যুদ্ধে নিহত হন) ২) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফ ৩) লেঃ আনোয়ার হোসাইন ৪) লেঃ মোখলেসুর রহমান ৫) সেকেন্ড লেঃ রফিক (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং পরে হত্যা করা হয়)
৬। এছাড়াও বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রায় ৩০ জন বাঙ্গালী অফিসার ছিল।	ক) আর্মি মেডিকেল কোর খ) বিভিন্ন ব্রাঞ্চের সেনা অফিসারবৃন্দ (যারা ছুটিতে ছিল) গ) এই পাঁচটি সেনানিবাসে বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত বিভিন্ন ব্রাঞ্চের অফিসারবৃন্দ ঘ) বিমান বাহিনী / নৌ বাহিনীর অফিসারবৃন্দ

পরিশিষ্ট-২

ছয় দফা কর্মসূচী

আওয়ামী লীগের অরজিনাল ঘোষণায় প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে তাদের মেনুফেস্টুতে সংশোধিত কর্মসূচী

প্রস্তাব-১

মূল ঃ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশের সংবিধানের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্র, সরকার হবে পার্লমেন্টারী ধরনের, আইন পরিষদ হবে সার্বভৌম এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হবে সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে।

সংশোধিত ঃ সরকারের ধরণ হবে কেন্দ্রীয় এবং সংসদীয়, যাতে কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং প্রদেশসমূহের আইন সভার, নির্বাচন হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে।

প্রস্তাব -২

মূল ঃ কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র দু'টি বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে, যথা- প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

সংশোধিত ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এবং মুদ্রার বিষয়ে ৩ নং প্রস্তাবে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

প্রস্তাব-৩

মূল ঃ ১। দেশের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, অথবা

২। সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাও চালু রাখা যেতে পারে, তবে এই ক্ষেত্রে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার রোধ করার জন্য সংবিধানে কার্যকরী ধারা সংযোজন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

সংশোধিত ঃ দুইটি পৃথক মুদ্রা থাকবে যা পরস্পরের মধ্যে উভয় প্রদেশে সহজে বিনিময়যোগ্য হবে অথবা এর পরিবর্তে একক মুদ্রাও থাকতে পারে, যদি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন, ঐক্ষেত্রে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুলধন এবং সম্পদের স্থানান্তর রোধের কৌশল নির্ণয় করবে।

প্রস্তাব-৪

মূল ঃ কর ধার্য এবং শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা থাকবে না। প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অংগ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অংগ রাষ্ট্রগুলির আদায়কৃত সকল প্রকার করের শতকরা একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

সংশোধিত ঃ রাজস্ব নীতি প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকবে। সশস্ত্র বাহিনী এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় রাজস্ব সম্পদ যোগান দেবেন। সংবিধানে উলেণ্ঢখিত পদ্ধতির ভিত্তিতে, আনুপাতিক হারে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ধার্য্যকৃত প্রয়োজনীয় রাজস্ব সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ ও পরিশোধ করা হবে। সংবিধানে ঐ ধরণের বিধি বিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যে, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব চাহিদা নিয়মিত মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহন করবে। রাজস্ব নীতি প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রস্তাব-৫

মূল ঃ ১। উভয় অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হিসাব রক্ষা করার জন্য দুইটি আলাদা আলাদা হিসাব রক্ষা করতে হবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩। উভয় প্রদেশ সমান হারে অথবা ধার্য্যকৃত হারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাবে।

৪। উভয় প্রদেশের মধ্যে দেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে চলাচল করবে।

৫। প্রত্যেক প্রদেশিক সরকারকে সংবিধানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা, বিদেশে বাণিজ্যিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা।

সংশোধিত ঃ প্রত্যেক প্রদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রক্ষার লক্ষ্যে সংবিধানের মধ্যে আইনী বিধানের ব্যবস্থা করা এবং যা নিজ নিজ প্রদেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সংবিধানে নির্ধারণকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার আনুপাতিক হারে মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহন করবে। দেশের বৈদেশিক নীতির আলোকে প্রাদেশিক সরকার বর্হিবিশ্বের সাথে বাণিজ্য এবং সাহায্যের ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা চালানো ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন, যা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করবেন।

প্রস্তাব-৬

মূল ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি মিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন করা।

সংশোধিত ঃ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকারকে মিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

পরিশিষ্ট-৩

কার্য সম্পাদনের জন্য সৈন্যদলের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ

ঢাকা

দয়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ মেজর জেনারেল ফরমান এবং তাঁর অধীনে মার্শাল-ল হেড কোয়াটার

অঞ্চল-বি,

সৈন্যদল ঃ

হেড কোয়ার্টার ৫৭ ব্রিগেড এবং তার অধীনস্থ সেনাদলসহ অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (বর্তমান কমান্ডিং অফিসারের স্থলে দায়িত্ব পালন করিবেন লে. কর্নেল তাজ, জিএসও ১ (ইনটেলিজেন্স)), ২২ বেলুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্ট, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের একটি কোম্পানি (কুমিলণ্ডা হইতে)।

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। ২য় এবং ১০-ইস্ট বেঙ্গল, হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (২৫০০), রাজারবাগে অবস্থানরত রিজার্ভ পুলিশদের (২০০০) নিরস্ত্রকরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়করণ।

২। টেলিফোন একচেঞ্জ এবং রেডিও সম্প্রচারকেন্দ্রসমূহ, রেডিও, টেলিভিশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।

৩। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দদের বন্দি করা - তাদের বিস্তারিত তালিকা এবং ঠিকানাসমূহ।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ, ইকবাল, জগন্নাথ, লিয়াকত (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।

৫। সড়ক, রেল এবং নদী পথসহ শহরসমূহ অবরোধ করে রাখা, নদীতে টহল দেওয়া।

৬। গাজীপুরের কারখানাগুলো এবং রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্র ভান্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অবশিষ্টরা ঃ মেজর জেনারেল কে.এইচ. রাজার অধীনে এবং হেড কোয়ার্টার ১৪ ডিভিশন।

যশোর

সৈন্যদলসমূহ ঃ

হেড কোয়ার্টার ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বেলুচ, ২৭ বেলুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট ও ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্টের অংশ বিশেষ।

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর সেক্টর হেড কোয়াটার এবং রিজার্ভ পুলিশ ও সশস্ত্র আনসারসহ সকলকে নিরস্ত্রকরণ।

২। যশোর শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া, আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

৩। একচেঞ্জ এবং টেলিফোন যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

৪। বিমান বন্দর, যশোর-খুলনার রাস্তা, যশোর শহর এবং সেনানিবাসের চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করা।

৫। কুষ্টিয়ার একচেঞ্জকে অকার্যকর করা।

৬। প্রয়োজনবোধে খুলনাতে শক্তিবৃদ্ধিকরণ।

লিবারেশন ওয়ার-৩২

খুলনা

সৈন্যদলসমূহ ঃ

২২ এফ এফ

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। শহরের নিরাপত্তা বিধান।

২। একচেঞ্জ এবং বেতার কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ।

৩। পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস এর উইং হেড কোয়াটার, রিজার্ভ কোম্পানিসমূহ এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্রকরণ।

৪। আওয়ামী লীগ, ছাত্র এবং কমিউনিষ্ট নেতাদের বন্দি করা।

রংপুর-সৈয়দপুর

সৈন্যদলসমূহ ঃ

২৩ ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার, ২৯ কেবেলারী, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। রংপুর-সৈয়দপুরের নিরাপত্তা বিধান।

২। সৈয়দপুরে অবস্থানরত ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্রকরণ।

৩। যদি সম্ভব হয় দিনাজপুরে অবস্থানরত সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ কোম্পানিকে নিরস্ত্রকরণ অথবা শক্তিবৃদ্ধিকরণের অজুহাতে রিজার্ভ কোম্পানির সদস্যদের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহকে পাঠানো।

৪। রংপুরের রেডিও ষ্টেশন এবং টেলিফোন একচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।

৫। রংপুরের আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

৫। বগুড়ার অস্ত্র ভা ারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

রাজশাহী

সৈন্যদলসমূহ ঃ

২৫ পাঞ্জাব

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। শাফকাত বেলুচকে অধিনায়কের দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো।

২। রাজশাহীর একচেঞ্জ এবং বেতার কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্রকরণ করা।

৪। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে মেডিকেল কলেজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।

৫। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

কুমিলণ্ঢা

সৈন্যদলসমূহ ঃ

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১.৫ মর্টার ব্যাটারীজ, স্টেশন হেডকোয়াটারের সেনাদল, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (১টি কোম্পানি ছাড়া অবশিষ্টরা)।

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর উইং হেড কোয়াটার এবং রিজার্ভ জেলা পুলিশকে নিরস্ত্রকরণ করা।

২। শহরের নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

৩। একচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ।

সিলেট

সৈন্যদলসমূহ ঃ

৩১ পাঞ্জাব (১টি কোম্পানি ছাড়া অবশিষ্টরা)

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। একচেঞ্জ এবং রেডিও স্টেশন নিয়ন্ত্রণ করা।

২। সুরমা নদীর উপর 'কেনো ব্রিজ' নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৩। বিমান বন্দরের নিয়ন্ত্রণ।

৪। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

৫। রিজার্ভ পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর সেক্টর হেড কোয়াটার নিরস্ত্রকরণ। সিকান্দারের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।

চট্টগ্রাম

সৈন্যদলসমূহ ঃ

২০ বেলুচ, অগ্রবর্তী দল ব্যতীত; সিলেটে অবস্থানরত ৩১ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানি; ইকবাল শফি একটি সেনাদলসহ কুমিলণ্ডা হইতে সড়ক পথে গাড়ি যোগে চট্টগ্রামের পথে নেতৃত্বে থাকবে। শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে- ষ্টার্ট টাইম রাত্রি ১.০০ ঘটিকা (এইচ আওয়ার) অন ডি-ডে অর্থাৎ (২৫শে মার্চ রাত্রে)।

মোবাইল কলাম ঃ ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি তাঁর ট্যাক হেড কোয়াটারসহ এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাসহ; ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স; ভারী মটারসহ সৈন্যদল; ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারস; ডি-ডে অর্থাৎ (২৫শে মার্চ রাত্রে) সন্ধ্যায় একটি কোম্পানি ফেনীর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী দল হিসেবে রওয়ানা হবেন।

দায়িত্বসমূহ ঃ

১। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সেক্টর হেড কোয়ার্টার পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস, রিজার্ভ পুলিশদের নিরস্ত্রকরণ করা।

২। পুলিশের কেন্দ্রীয় আস্ত্রাগার (২০,০০০) দখল করা।

৩। একচেঞ্জ এবং রেডিও ষ্টেশন নিয়ন্ত্রণ করা।

৪। পাকিস্তান নৌ বাহিনীর কমোডোর মমতাজ সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা।

৫। শিগরী এবং জানযুয়ার (কমান্ডিং অফিসার, ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল) সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদেরকে ইকবাল শফির নেতৃত্বে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬। যদি শিগরী এবং জানযুয়া তাদের নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকেন, তাহলে তাদের অধীনস্থদেরকে নিরস্ত্রকরণ করার প্রয়োজন হবে না। এমতাবস্থায় শুধু চট্টগ্রাম শহর এবং ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানীকে দায়িত্ব দেওয়া, যেন ই.বি.আর.সি. এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কোন কারণে বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদেরকে নিজস্ব অবস্থানে অবরূদ্ধ রাখা।

৭। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে আমি আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। চৌধূরীকে বন্দি কর (সি.আই.ই.বি.আর.সি.) অন ডি-ডে নাইট অর্থাৎ (২৫শে মার্চ রাত্রে)।

৮। উপরে বর্ণিত দায়িত্বগুলি সম্পাদনের পর আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতাদের বন্দি করা।

পরিশিষ্ট-৪

অপারেশন সার্চলাইট-১

২৫ মার্চের রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে চিন্তিত ছিলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসাইন, ঐ সময় হঠাৎ বেজে উঠল সবুজ টেলিফোনটি, তখন আনুমানিক সকাল ১১.০০ টা। লে. জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন টেলিফোনের অপর প্রান্তে। তিনি বললেন, খাদিম, আজই রাত্রেই অপারেশন সার্চলাইট।

এটা খাদিমকে মোটেই বিস্মিত করেনি। তিনি এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত তার ক্ষমতায় আরোহণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির সাথে মিল ছিল। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেনারেল খাদিম তার অধীনস্তদের নির্দেশ দেন। এই সংবাদ জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে নিচের দিকে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আমি দেখেছি, অনেক জুনিয়র অফিসার কয়েকটি অতিরিক্ত রিকয়েলল্যাস রাইফেল তাদের আয়ত্তে নেওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি, অতিরিক্ত গোলাবারুদ নেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল এবং মর্টারের ত্রুটিপূর্ণ অংশ প্রতিস্থাপনের জন্যও ব্যস্ত ছিল। ট্যাংকের দায়িত্বে সৈনিকরা, যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে রংপুর (২৯ কেবেলারি) থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তারা ৬টি মরিচাযুক্ত 'এম-২৪এস' ট্যাংক রাত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈল ভর্তি করার জন্য তাড়াহুরা করছিলেন। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় প্রকট শব্দ সৃষ্টি করার জন্য এইগুলি যথেষ্ট ছিল।

১৪ ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের স্টাফ অফিসাররা টেলিফোনের মাধ্যমে ঢাকার বাহিরে সেনানিবাসগুলিকে অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করার সময় জানায়ে দেন। সংবাদ প্রেরণের জন্য তারা নিজস্ব সংকেত ব্যবহার করেন। সকল সেনা নিবাসকে একই সময়ে অপারেশন আরম্ভ করতে হবে। ২৬শে মার্চ রাত ১টায় সেই চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি ঐ সময়ের মধ্যে নিরাপদে করাচিতে অবতরণ করবেন।

অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের জন্য দুটি হেড কোয়ার্টার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অধীনে থাকবে ৫৭ ব্রিগেড এবং মেজর জেনারেল ফরমান, ঢাকা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তারা অপারেশন পরিচালনা করবেন। মেজর জেনারেল খাদিমকে পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশে অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অপারেশনের অগ্রগতি জানার জন্য লে. জেনারেল টিক্কা খান এবং তার স্টাফ অফিসারবৃন্দ, সামরিক প্রশাসকের হেড কোয়ার্টার দ্বিতীয় রাজধানীতে (শেরে বাংলা নগর) রাত্রি যাপন করবেন।

কিছুদিন পূর্বে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ.ও. মিট্টাকে, খাদিম ও ফরমানের সম্ভাব্য বদলী হিসেবে ঢাকায় পাঠান, যদি কোন কারণে হত্যাযজ্ঞ চালাতে তারা অস্বীকার করেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জেনারেল এয়াকুবের অধীনে তারা দায়িত্ব পালন করেন এবং হয়তো তার মতামতের সাথেও একমত হন। এমন কি

জেনারেল হামিদ, এই বিষয়ে খাদিম এবং ফরমানের মতামত জানার জন্য তাদের স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যাই হোক, উভয় জেনারেল, বিশ্বস্ততার সাথে আদেশ পালন করার ব্যাপারে হামিদকে নিশ্চয়তা দেন।

আমার মত জুনিয়ার অফিসারবৃন্দ রাত ১০টার দিকে সামরিক-আইন প্রশাসক, জোন 'বি' (দ্বিতীয় রাজধানী) এর হেড কোয়াটারে একত্রিত হতে শুরু করেন। গত রাত্রে তারা অফিসের বাগানে সোফা ও ইজি চেয়ার রাখেন, চা এবং কফির ব্যবস্থাও ছিল। আমার কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল না, "শুধু উপস্থিত থাকা"। একটি জিপ ওয়ারলেসসহ 'আউটডোর অপারেশন রুম' এর পাশে পার্ক করা ছিল। মধ্যরাতের শহরটি ছিল নিস্তব্ধ, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ এই রাতটি ছিল বসন্ত রাতের ন্যায় মনোমুগ্ধকর। অন্য কিছু নয়, রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ চালানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত।

সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও, অন্য একটি গোষ্ঠীর লোকজনও ছিল সে রাত্রে সক্রিয়। সেখানে ছিল আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ এবং বাঙ্গালী সৈনিকদের নিয়ে গঠিত ব্যক্তিগত সেনা বাহিনী, পুলিশ সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সেনা সদস্যবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ এবং দলের স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ। মুজিব, কর্নেল ওসমানী এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। তারা কঠিন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে, সৈন্যদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ করার জন্য তারা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেছিল।

রাত আনুমানিক ১১.৩০ টার সময় জিপের মধ্যে রাখা ওয়ারলেস সেটটি প্রথম বারের মত বেজে উঠল। অপারেশনের সময় এগিয়ে আনার জন্য স্থানীয় কমান্ডার (ঢাকা) অনুমতি চাচ্ছিল, কারণ 'অপরপক্ষ' প্রবল প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। প্রত্যেকে তার নিজের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি তখনও কলম্বো (শ্রীলংকা) এবং করাচির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। জেনারেল টিক্কা খান সিদ্ধান্ত দিলেন। 'ববিকে বল (আরবাব) যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব অপেক্ষা করতে'।

নির্দিষ্ট সময়ে, ব্রিগেডিয়ার আরবাবের ব্রিগেডের দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৩ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ঢাকা সেনানিবাসে রিজার্ভ হিসেবে অবস্থান করবে এবং প্রয়োজনবোধে সেনানিবাসের নিরাপত্তার নিশ্চিত করবে।

ভারতের আকাশ পথে উড়োজাহাজ যাতায়াত বন্ধ করার পর থেকে শত্রুর উড়োজাহাজ ধ্বংস করার ভূমিকায় ৪৩-তম লাইট এন্টি-এয়ারক্রাপ্ট (এলএএ) রেজিমেন্টকে বিমান বন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।

২২ বেলুচ, ইতোমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস হেড কোয়ার্টার পিলখানায় অবস্থান নেন, প্রায় ৫০০০ ই.পি.আর. সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণ এবং ওয়ারলেস এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

৩২ পাঞ্জাব, ১,০০০ 'ঘোর সমর্থক' পুলিশ সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্বে ছিল, যারা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য সশস্ত্র জনশক্তির একটি মৌলিক উৎস ছিল।

১৮ পাঞ্জাব, নওয়াবপুর এবং পুরতন শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেবেন, যেখানে হিন্দুদের অনেক ঘর বাড়ি অস্ত্রাগার হিসাবে পরিণত হয়েছে বলে শুনা যায়।

ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং বিহারী অধ্যুষিত এলাকা (মোহাম্মদপুর, মিরপুর) নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

১৮ পাঞ্জাব, ২২ বেলুচ এবং ৩২ পাঞ্জাব হইতে এক একটি কোম্পানী নিয়ে গঠিত সম্মিলিত বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বিশেষতঃ শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এলাকা ইকবাল এবং জগন্নাথ হল থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী আওয়ামীলীগারদের সম্পূর্ণভাবে বের করবে।

স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (কমান্ডোরা) একটি পণ্ডাটুন মুজিবের বাড়ি ঘেরাও এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার করবে।

এম-২৪ ট্যাংক রেজিমেন্টের একটি স্কোয়াড্রনের অংশ, প্রধানতঃ শক্তি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে সূর্য উদয়ের পূর্বে রাস্তায় বের হবে। প্রয়োজনবোধে তারা গুলি চালাতে পারবে।

এই সেন্যদলগুলি, সংশিণ্টষ্ট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি পাহারা দেবে, প্রতিবন্ধকতা দূর করবে (যদি দেওয়া হয়) এবং তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের নিজ নিজ আবাসস্থল থেকে গ্রেফতার করবে।

সেনাদলগুলিকে রাত ১টার পূর্বে তাদের নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু অনেকে রাস্তায় অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হতে পারে, এই ধারণা থেকে রাত প্রায় ১১.৩০ টা থেকে সেনানিবাস ত্যাগ করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে যারা বেতার, টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ এবং রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ব্যাংক ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য শহরে অবস্থান করছিল, অপারেশন আরম্ভ হওয়ার অনেক পূর্বে তারা নির্ধারিত অবস্থানে পৌঁছে যান।

সেনানিবাস থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফার্মগেইটে, প্রথম সেনাদলটি বাধার সম্মূখীন হন। কিছুক্ষণ পূর্বে আড়াআড়িভাবে খুব বড় একটি গাছ রাস্তায় ফেলে রাখার কারণে সেনাদলটি থেমে যেতে বাধ্য হয়। রাস্তার উভয় পাশের খালি জায়গাগুলি অকেজো স্টিম-রোলার ও পুরাতন গাড়ি দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধকতার বিপরীত পাশে শত শত আওয়ামী লীগ কর্মীরা দাঁড়ায়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিল। জেনারেল টীক্কা খানের হেড কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়ায়ে আমি তাদের উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাইফেলের গুলির শব্দ জয় বাংলা স্লোগানের সাথে একাকার হয়ে যায়। আরও একটু পরে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হতে বের হওয়া বহু গুলি বিকট শব্দে আকাশ ভেদ করে উপরের দিকে যাচ্ছিল। অতপরঃ ইহা ছিল গুলিবর্ষণ ও ভীত স্লোগানের সমন্বিত শব্দ, মধ্যে মধ্যে হালকা মেশিনগানের শব্দও শুনতে পাই। ১৫ মিনিট পরে গোলমাল থেমে যায় এবং স্লোগান বন্ধ হতে থাকে। দৃশ্যতঃ, যুদ্ধাস্ত্রের বিজয় হয়। সেনা দল শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে।

যাই হোক, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আক্রমণ শুরু হয়। তখন অপারেশনের নির্দেশিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করার কোন অবস্থা ছিল না। ইচ্ছাকৃতভাবে নরকের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হল। প্রথম গুলিবর্ষণের পর পর, 'শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষীণ

শব্দ পাকিস্তান সরকারের বেতারের কাছাকাছি তরঙ্গে শুনা যায়। শব্দেও অনুমান করা যায়, এতে হয়তো, শেখ মুজিবর রহমানের পূর্বে ধারণকৃত বার্তার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।' ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত ঘোষণা পত্রের সম্পূর্ণ অংশটি বাংলাদেশ দলিল পত্রে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বলছি, যে যেখানে আছেন এবং আপনার যা আছে, তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করেন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সর্বশেষ সৈন্য বিতাড়িত এবং পূর্ণ বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'

আমি বেতারের এই প্রচারটি শুনি নাই। আমি শুধুমাত্র মুজিবের বাড়ি অভিমূখী রাস্তার বাধা অপসারণ করার জন্য কমান্ডোদের নিক্ষেপ করা রকেট লাঞ্চারের প্রকট শব্দ শুনেছি। কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জেড. এ. খান এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বিলাল, উভয়ে আক্রমণকারী পণ্টাটুনের সাথে ছিলেন।

কমান্ডোরা মুজিবের বাড়ির নিকটে পৌঁছানোর সাথে সাথে, গেইটে অবস্থানরত সশস্ত্র প্রহরীরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। প্রহরীদের দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর শক্তিশালী পঞ্চাশ জন সৈন্য চার ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। স্টেনগানের গুলির শব্দের মাধ্যমে তারা অভ্যন্তরে প্রবেশের বার্তা ঘোষণা করে এবং মুজিবকে বের হয়ে আসার জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার করে। কিন্তু কোন সাড়া ছিল না। তারা হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়িতে উঠে, শেষ পর্যন্ত মুজিবের শয়নকক্ষের দরাজা খুঁজে পায়। এটি বাহিরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ঝুলন্ত তালার উপর একটি গুলি ছোঁড়া হয়, এবং তা খুলে পড়ে যায়। পরিশেষে, মুজিব প্রস্তুত অবস্থায় বের হয়ে গ্রেফতারের জন্য নিজেকে শপে দেন। মনে হয় তিনি এ জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আক্রমণকারী দল বাড়ির প্রত্যেককে গ্রেফতার করেন এবং সেনাবাহিনীর জিপে করে তাদেরকে সেকেন্ড ক্যাপিটালে নিয়ে আসা হয়। কয়েক মিনিট পর, ৫৭ বিগ্রেডের, ব্রিগেড মেজর, মেজর জাফর ওয়ারলেসে কথা বলছিলেন। আমি তার সতেজ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলেছিলেন "বড় পাখিটি খাঁচায়... অন্যান্যরা তাদের বাসায় নাই... ওভার।"

বার্তাটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে, আমি দেখলাম সাদা শার্ট পরিহিত "বড় পাখিটিকে" সেনাবাহিনীর জীপে করে নিরাপদ হেফাজতের জন্য সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একজন জেনারেল টিক্কাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি চান শেখ মুজিবকে তার সামনে নিয়ে আসা হোক। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমি তার চেহারা দেখতে চাই না।"

মুজিবের বাসার চাকরদের সনাক্ত করার পর দ্রুত মুক্তি দেওয়া হয় এবং রাত্রি যাপনের জন্য তাকে আদমজী স্কুলের রাখা হয়। পরের দিন, তাকে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে স্থানান্তরিত করা হয়। তিন দিন পর তাঁকে ঐ জায়গা থেকে বিমানে করে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে, যখন মুজিবের সম্পর্কে 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' (তাঁর মুক্তির জন্য যখন আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়) নেওয়ার ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয়, আমি আমার বন্ধু মেজর বিলালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; কেন তিনি আক্রমণের তীব্রতার

সময় তাকে হত্যা করেন নাই। তিনি বলেছিলেন: 'জেনারেল মিট্টা তাকে জীবন্ত গ্রেফতার করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।'

মুজিব যখন আদমজী স্কুলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ঢাকা শহর তখন গৃহযুদ্ধের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছিল। চার ঘণ্টা যাবৎ আমি বারান্দায় দাঁড়ায়ে এই লোমহর্ষক দৃশ্য অবলোকন করি। আকাশে গুলির স্ফুলিঙ্গই ছিল রক্তাক্ত এ রাতের উলেণ্ঢখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সময়ে সময়ে, ধূমায়িত শোকার্ত মেঘ উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই স্ফুলিঙ্গ, তারাগুলিকে পরাভূত করে ধূমায়িত শোকার্ত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষের সৃষ্ট এই অগ্নিকুে র দ্বারা চাঁদের আলো এবং তারার উজ্জ্বলতা মলিন হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বর হইতে ধোঁয়ার লম্বা সারি এবং আগুন নির্গত হচ্ছিল, যদিও শহরের অন্যান্য অঞ্চল যেমন- জনগণের দৈনন্দিন কোলাহলের জায়গায়, ভীতিপূর্ণ অগ্নিকান্ডের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধ-৩৩

আনুমানিক রাত ২ টার সময় জিপে রাখা ওয়ারলেস সেটটি পুনরায় বেজে উঠল। কল রিসিভ করার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হয়। অন্যপ্রান্ত থেকে ক্যাপ্টেন বললেন; ইকবাল এবং জগন্নাথ হল থেকে তিনি প্রচ বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ইতোমধ্যে, একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার আমার কাছ থেকে হ্যান্ড সেটটি কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে বললেন : 'তোমাকে দেওয়া দায়িত্ব সম্পন্ন করতে তুমি কতক্ষণ সময় নিবে ? ...... চার ঘন্টা! .... বাজে কথা ...... কি কি অস্ত্র তোমার কাছে আছে ? .... রকেট লাঞ্চার, রিকয়েললেস রাইফেলস, মর্টারস এবং ...... ঠিক আছে, সবগুলো ফায়ার কর এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত কর।'

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলি রাত ৪ টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে বছরের পর বছর বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয়েছিল সেটা দমন করতে অনেক সময় লাগবে। সম্ভবত এ ধারণা অজেয়।

শহরের অবশিষ্ট অংশে, সেনাদল পিলখানায় অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং রাজারবাগে অবস্থানরত পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণসহ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। শহরের অন্যান্য জায়গায় যত্রতত্র তারা শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এলোপাতাড়ি প্রচ গুলি ছুড়ছিল। অপারেশনাল পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত (রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার) ছাড়া তারা কোন ঘর বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই।

২৬ মার্চ সূর্য উদয়ের পূর্বে, সেনাদলগুলি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেন এবং এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। ভোর আনুমানিক ৫ টায় জেনারেল টিক্কা খান তার সোফা থেকে উঠে কিছুক্ষণের জন্য তার অফিসে যান। হাতের রুমাল দিয়ে চশমা পরিষ্কার করতে করতে যখন তিনি পুনরায় বের হয়ে আসেন এবং চারদিকে তাকিয়ে, তিনি বলেন ওহ্, ওখানে কেউ নেই!' বারান্দায় দাড়িয়ে, তার নাটকের স্বগতোক্তি শুনলাম। এবং এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি চারিদিকে তাকালাম। আমি শুধু একটি কুকুর দেখলাম, যার লেজটি পেছনের দুই পায়ের মধ্যে গুটানো ছিল। কুকরটি গোপনে শহরের দিকে যাওয়র প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

ভুট্টোকে পরের দিন তার হোটেল কক্ষ থেকে সেনারা প্রহরা দিয়ে ঢাকা বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। বিমানে আরোহণের পূর্বে, তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে গতরাত্রের সফলতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তার প্রধান প্রহরীকে এই

কথাগুলি বলেন: ব্রিগেডিয়ার আরবাব, 'আলণ্ঢাহর অপার মহিমা, পাকিস্তানকে রক্ষা করা হয়েছে।' করাচি পৌঁছে তিনি পুনরায় এই মন্তব্য ব্যক্ত করেছিলেন।

ভুট্টো যখন এই আশাবাদী মন্তব্য করছিলেন, তখন আমি ঘুরে ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণকবরগুলি দেখছিলাম। সেখানে আমি তিনটি বড় আকারের গর্ত দেখতে পাই- প্রত্যেকটি ৫ থেকে ১৫ মিটার চওড়া ছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে ঐগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কিন্তু কোন অফিসার নিহতদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে রাজী ছিল না। আমি ভবনগুলির চতুর্পার্শ্বে দেখতে শুরু করলাম। বিশেষ করে ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হল যাহা আমি দূর থেকে মনে করেছিলাম আক্রমণের সময় হয়তো এই ভবনগুলিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ইকবাল হলে মাত্র দুইটি এবং জগন্নাথ হলে চারটি রকেট ফায়ার করে আঘাত হানা হয়। অধিকাংশ কক্ষগুলি প্রায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বিধ্বস্ত হয় নাই। কয়েক ডজন অর্ধপোড়া রাইফেল এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজ আস্তে আস্তে পুড়ছিল। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল ভয়ানক- কিন্তু জেনারেল টিক্কা খানের প্রধান কার্যালয়ের বারান্দায় দাঁড়ায়ে আমি যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি, সে তুলনায় হলগুলির ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক কম।

বৈদেশিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজার বলে প্রচার করেছিল। পক্ষান্তরে সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন, সরকারিভাবে ৪০ জন মারা যায় বলে স্বীকার করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হতে, আমি ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলিতে গাড়ি চালাই এবং কিছু কিছু মৃতদেহ ফুটপাতে কিংবা রাস্তার বাঁকে বাঁকে পড়ে থাকতে দেখি। সেখানে মৃতদেহের কোন স্তুপ ছিলনা, যা পরবর্তীতে অভিযোগে বর্ণনা করা হয়েছিল। যাই হোক, আমার অদ্ভুত এবং অশুভসূচক অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এর অর্থ কি ছিল আমি জানি না। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ আমি এটা সহ্য করতে পারি নাই। আমি গাড়ি চালিয়ে অন্য এলাকায় চলে যাই।

পুরাতন শহরের কিছু কিছু রাস্তায় তখনও প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাই। কিন্তু ঐ সমস্ত জায়গায় পাহারারত অবস্থায় কেউ ছিল না। প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছিল। যাহা হোক, একটি রাস্তার কোণায়, ছায়ার মত আমি কিছু দেখতে পাই, হয়তো তিনি ঐ জায়গার বসবাসকারী ছিলেন না, অতি দ্রুত একটি ছোট গলিতে হারিয়ে যায়। শহর প্রদক্ষিণের পর, আমি ধানমন্ডিতে গিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ি দেখতে যাই। বাড়িটি সম্পূর্ণ জনমানবশূণ্য ছিল। ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র দেখে, মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ বাড়ীটি কেউ তন্ন তন্ন করে তলণ্ঢাশি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্টা হয়ে পড়ে থাকা বড় সাইজের একটি প্রতিকৃতি ছাড়া উলেণ্ঢখযোগ্য কোন জিনিস আমার চোখে পড়ে নাই। ফ্রেমটির বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ছিল কিন্তু ছবিটি অক্ষত ছিল।

বাড়ির বাইরের ফটকের মূল্যবান কারুকাজগুলোও হারিয়ে গিয়েছিল। মুজিবের শাসনামলে, পিতলের তৈরী বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ঐ ফটকে তারা লাগিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচির প্রতীক হিসেবে এতে তারা

ছয়টি তারকা প্রতিস্থাপিত করেন। তখন শুধু গেইটের কালো লোহার রডের মধ্যে মানচিত্র লাগানোর ছিদ্রসহ গেইটটিই লাগানো ছিল। যেই গৌরব খুব দ্রুত এসেছিল, তা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

দুপুরের খাবারের জন্য আমি দ্রুত সেনানিবাসে ফিরে যাই। আমি সেখানে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। শহরের মধ্যে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনা সেনাবাহিনীর সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের মনে স্বস্তি ফিরে আনে। তারা অনুভব করেছিল যে, দীর্ঘদিনের অশান্ত পরিস্থিতি কাটানোর পর আক্রমণটি অবশেষে অতীতের স্মৃতিগুলি মুছে পরিস্কার করে দিয়েছিল। অফিসারবৃন্দ অফিসার্স মেসে দৃশ্যমান প্রশান্তির সাথে খোশগল্পে মেতে উঠেছিল। কমলার খোসা ছাড়তে ছাড়তে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, 'বাঙলিদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-নূন্যতমপক্ষে এক প্রজন্মের জন্য'। মেজর মালিক এর সাথে যোগ করে বলেন, 'হ্যাঁ, তারা শুধু শক্তি প্রয়োগের ভাষা বুঝে। তাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়।'

এই উদ্ধৃতিগুলি সালিক সিদ্দিকের বই উইটনেস টু স্যারেন্ডার থেকে নেওয়া হয়েছে, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯৭, পৃঃ ১৩৮-১৪৪।

পরিশিষ্ট-৫

অপারেশন সার্চলাইট-২

ঢাকাকে এক রাতেই অসাড় করে দেয়া হল। কিন্তু প্রদেশের বাকী অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পাবনার পরিস্থিতি আমাদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে রাখে।

চট্টগ্রামে বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৫ হাজার ও ৬ শত। বাঙ্গালী সৈনিকদের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর নতুন (২,৫০০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর উইং ও সেক্টর হেড কোয়ার্টার-এর রাইফেলসরা ও পুলিশ বাহিনী। আমাদের সৈনিকরা ছিল মূলতঃ ২০ বালুচ-এর সৈনিকরাই। এদের অগ্রগামী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। চট্টগ্রামে অবাঙ্গালীদের মধ্যে সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমী। তাকে আদেশ দেয়া হল, কুমিলণ্ডা থেকে অতিরিক্ত সৈনিক না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি যেন পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীরা সব রকমের সাফল্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। ফেনীর কাছাকাছি শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কুমিলণ্ঢা থেকে আগমনকারী সেনাদলের পথ কার্যকরভাবে বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রাম শহর ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মূল অংশগুলি তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে। ২০ বালুচের এলাকা ও নৌবাহিনীর ঘাঁটিই শুধু সরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় ব্যক্তি মেজর জিয়াউর রহমান (১) ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতিতে (যাকে কয়েকদিন আগে কৌশলে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রেডিও স্টেশন প্রহরারত সরকারী সৈন্যরা সেখানে শক্তভাবেই অবস্থান করছিল। কাপ্তাই রোডে ছিল আলাদা একটা ট্রান্সমিটার। মেজর জিয়া সেটা দখল করে নিলেন এবং বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র' প্রচারের জন্যে প্রাপ্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেন। চট্টগ্রামে যতক্ষণ অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ ঘটানো না হচ্ছে ততক্ষণ পরিস্থিতিকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করানোর ব্যাপারে কিছু করা যাচ্ছে না।

জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন চট্টগ্রামগামী কুমিলণ্ঢা সেনাদলের পথ রোধের সংবাদ শুনলেন চূড়ান্ত বিজয় দিবসের মধ্যরাত্র পেরিয়ে পনের মিনিটের মাথায় ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন শত্রুপক্ষের তাতে পুলটা ছেড়ে দেন এবং গিরিখাদ অতিক্রম করে প্রথম সুযোগেই চট্টগ্রামে যাওয়ার পথ করে নেন। পুলটি দখল ছাড়া ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি চট্টগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে পারলেন না। পরের দিন সকাল দশটায় তিনি পুলটি দখল করেন। অতঃপর সেনাদলটি সামনে এগোতে শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে কুমিরায় আবার তারা আক্রান্ত হয়। এতে অগ্রবর্তী কোম্পানীর এগারজন হতাহত হয়। নিহত হয় কোম্পানীর কমান্ডিং অফিসার। ব্রিগেড সদর দফতর (কুমিলণ্ঢা) ও ডিভিশনাল সদর দফতরের (ঢাকা) সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যতাযথ সংবাদের অভাবে এই সেনাদলটির ভাগ্য সম্পর্কে ঢাকা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। সম্ভবতঃ এদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে চট্টগ্রামের অবস্থা কি দাঁড়াবে? শহরটি কি বিদ্রোহীদের হাতে থেকে যাবে? চট্টগ্রাম যাদি শত্রুর নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর পরিণতি কি দাঁড়াবে?

হারিয়ে যাওয়া সেনাদলটির সন্ধান নিজেই নেবেন বলে জিওসি সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক করেন, পরের দিন তিনি একটি হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথমে চট্টগ্রামে যাবেন। সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কমিলণ্ঢা রোডের ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন। যদি ইতিমধ্যে দলটি কোন রকম অগ্রগতি সাধন করে থাকে তাহলে তাদেরকে চট্টগ্রামের বাইরেই দেখতে পাবেন তিনি। তার হেলিকপ্টারটি ২০ বালুচ-এর এলাকায় নামার জন্যে চট্টগ্রাম পাহাড়ের ওপর এসে যেই মুহূর্তে ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে তখনি সেটাকে লক্ষ্য করে বিদ্রোহীরা হালকা অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করে। বিদ্রোহীরা উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল। গুলি লেগেছিল হেলিকপ্টারে। কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। নিরাপদে ভূমি স্পর্শ করলো। জিওসি তাড়াতাড়ি নামলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমী চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। কর্নেল বিজয়ী কণ্ঠে ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার দখলের কাহিনী বর্ণনা

করলেন। ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৫০০ বিদ্রোহীকে তিনি বন্দী করেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বাদবাকী অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে রয়ে গেছে।

জিওসি তাঁর সন্ধান অভিযাত্রায় রওনা হবার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্যে কেবল পা বাড়িয়েছেন এই সময় দেখলেন, একটি ভীতি-বিহ্বল স্ত্রী লোক দাঁড়িযে আছে কাপ্টারের কাছেই। কোলে বাচ্চা। সে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের স্ত্রী। ঢাকায় যাওয়ার জন্যে বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করছিল। জিওসি তাকে সঙ্গে নিলেন।

হেলিকপ্টারটি চালাচ্ছিলেন একজন সুযোগ্য এবং অভিজ্ঞ পাইলট- নাম মেজর লিয়াকত বোকারী। তাঁকে সহায়তা করছিলেন মেজর পিটার। তাঁরা জিওসিকে কুমিলণ্ডা বোর্ডের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘন মেঘ থাকায় কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। যখন তারা কুমিলণ্ডার প্রায় কাছাকাছি আসেন সে সময় জিওসি নিজের হাঁটুর ওপর ছোট একটা ম্যাপ মেলে ধরে। বাইরে তাকালেন এবং পাইলটকে মেঘ ভেদ করে নীচে নামাতে বলেন। হেলিকপ্টারটি নীচে নামতেই জিওসি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেন সেনাদলের খোঁজে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠলো। পাইলট মুহূর্তে হেলিকপ্টারকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। তথাপি হেলিকপ্টারটির মেশিনে গুলি লাগে। একটি গুলি আঘাত হানলো লেজে। অপরটি তেলের ট্যাংকি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে গিয়ে কপ্টারের পেট বিদ্ধ করে। এই দুর্ঘটনায় মেজর বোখারী মোটেই বিচলিত হলেন না। জিওসিকে বললেন, 'স্যার আমি কি আরেকবার চেষ্টা করবো?' না সোজা ঢাকায় চলো,' জিওসি বললেন। মিশন ব্যর্থ হলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের খোঁজ মিললো না।

ইতিমধ্যে জেনারেল মিঠ্ঠি একই লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কমাৌ বাহিনীকে (ইএক্স ৩ কমাৌ ব্যাটালিয়ন) আকাশপথে ঢাকা-চট্টগ্রামে পাঠালেন। কমাৌ সেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের অবস্থান কিংবা বিদ্রোহীদের অবস্থানের খবরাখবর সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তাদেরকে নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। চট্টগ্রমে রওনা হবার সমভ ক্যাপ্টেন হামিদ নামক এক বাঙ্গালী অফিসার হাজির হন। কমাৌ সেনাদলের অধিনায়ককে তিনি বলেন, 'আমি মারী থেকে এসেছি। চট্টগ্রামে যাচ্ছি আমার মা-বাবাকে দেখতে। আমি ওই এলাকাটি চিনি। গাইড হয়ে কি তোমাদের সাথে আমি যেতে পারি?' তার সহায়তা গ্রহণ করা হল।

যেদিন কমাৌদের (২৭শে মার্চ) সন্ধান ও সংযোগ অপারেশনের কার্যক্রমে নামার কথা- সেদিনই জিওসি তাঁর কৌশলগত সদর দফতর চট্টগ্রামে সরিয়ে নেন। এবং ২০ বেলুচ এর একটি সেনাদলকে একই লক্ষ্যে ভিন্ন পথে প্রেরণ করেন। এই তিনটি সেনাদলের সংযুক্তির উপর অপারেশনের সাফল্য নির্ভর করছিল। ২০ বেলুচ সেনারা তাদের এলাকা ত্যাগের সাথে সাথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কমাৌরা বাঙ্গালী অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তারা বেশীদূর এগোয়নি- এমন সময় চট্টগ্রাম-কুমিলণ্ডা রাস্তার দু'দিককার পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে দ্বিমুখী গুলিবর্ষণের

মুখোমুখি হলো। কমান্দোরা মোট মারা গেল তেরজন। এর মধ্যে কমান্ডিং অফিসারসহ ছিল দু'জন তরুণ অফিসার, একজন জুনিয়র কমিশনড্ অফিসার এবং ন'জন ছিল অন্যান্য পদের। এই প্রচেষ্টা শুধু ব্যর্থই প্রমাণিত হলো না- ব্যয়বহুলও হল বটে।

কুমিরার দুর্ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিছু মটার চেয়ে পাঠালেন। ২৭শে মার্চ কুমিলণ্ডা থেকে সেগুলো পৌঁছে গেল। ২৮শে মার্চ ভোরে তিনি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আক্রমণ হলো। প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেললেন এবং চট্টগ্রাম যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশেষে হাজী ক্যাম্পে এসে তিনি তার উপস্থিতির খবর জানালেন। হাজী ক্যাম্প চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে অবস্থিত। হজ্বযাত্রীরা জাহাজে ওঠার আগে এখানে অবস্থান করেন।

হাজী ক্যাম্পের পরেই ইস্পাহানী জুট মিলস্। আমাদের সেনাদল পৌঁছবার আগেই বিদ্রোহীরা এখানে এক রক্তাক্ত তান্ডবলীলা সংঘটিত করে। তারা অসহায় অবাঙ্গালী নারী, পুরুষ ও শিশুদের সংগ্রহ করে জড় করে ক্লবঘরে এবং হত্যা করে। এই ভয়াবহ ট্রাজেডী সৃষ্টি হয় যেখানটায়- কয়েকদিন পর আমি সেখানটায় যাই। দেখতে পেলাম ফ্লোর ও দেয়ালে তখনো রক্তের দাগ রয়েছে। মেয়েদের কাপড়-চোপড় ও বাচ্চাদের খেলনা তখনো জমাট বাঁধা রক্তে চুপসে আছে। লাগোয়া ভবনে ঢুকে দেখলাম, শুকনো রক্তে বেড শীট ও জাজিম শক্ত হয়ে আছে।

যখন এই ঘটনাটি ঘটলো তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিনটি সেনাদল পরস্পরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিল। সংযুক্ত সাধন সম্ভব হলো ২৯শে মার্চ। এই খুশীর সংবাদটি বেতার মারফত ঢাকাকে জানানো হলো। সংবাদ প্রাপ্তিতে অপারেশন কক্ষের অফিসাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। কিন্তু ইস্পাহানী জুট মিলের কসাইখানার শিকারদের জন্যে সেটা অত্যন্ত দেরীই হয়ে গেল।

চট্টগ্রামের একমাত্র সাফল্য হলো জাহাজ থেকে নয় হাজার টন গোলাবারুদ খালাসের ঘটনাটি। জাহাজটিকে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা মধ্য মার্চ থেকে ঘেরাও করে রাখে। এই কার্য সম্পাদনের জন্যে ব্রিগেডিয়ার আনসারী ঢাকা থেকে যান এবং প্রাপ্ত যাবতীয় উপকরণ জড় করেন। এক পণ্টাটুন পদাতিক সৈন্য, কিছু মর্টার এবং দু'টো ট্যাঙ্ক নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন। নৌ-বাহিনী একটি ডেস্ট্রয়ার ও কয়েকটি গানবোট দিয়ে সমর্থন যোগায়। চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে একটি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়নকে আকাশপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত যুদ্ধ উপকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করা গেল তথাপি চট্টগ্রামের মূল লড়াই তখনও শেষ হতে বাকি। সাধারণ গতিতে দখল করার আগে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও জেলা আদালত এলাকার রিজার্ভ পুলিশ লাইনকে (পুলিশ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর কর্মচারী ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্র ভূমি) উচ্ছেদ করতে হবে।

জেনারেল মিট্টা প্রথম ব্যক্তি- যিনি বেতার কেন্দ্র অভিমুখে এগিয়ে যান। ভবনটি উড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি একটি কমান্ডো বাহিনী পাঠালেন। তাঁর সৈন্যরা নদীপথ ধরে পাহাড়ের পার্শ্বদেশ দিয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগোলো। নৌকার ভেতর থাকতেই তাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু হয়। এবার ষোলজন মারা গেল। মিট্টার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল প্রমাণিত হলো।

এরপর মেজর জেনারেল খাদিম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমীর অধিনায়কত্বে ২০ বেলুচ-এর একটি সেনাদল পাঠালেন। পথে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং বেতার কেন্দ্রের ধারে কাছেও যেতে পারলেন না। অবশেষে দু'টো এফ-৮৬ এস (স্যাবর) জেট ঢাকা থেকে গিয়ে আঘাত হানে। আমি কয়েকদিন পর সেখানে যাই। দেখতে পেলাম ভবনটিকে পিল বক্স দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আছে বন্দুক বসানোর জন্যে ফোকরও। অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে তৈরী পরিখার সাথে এটাকে যুক্ত করা হয়েছে। যা হোক, ভবনটি অক্ষত ছিল।

আরেকটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদর দফতর। এক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী সুদৃঢ় পরিখা তৈরী করে সেখানে অবস্থান নেয়। বেশ উঁচু জায়গায় ছিল তাদের অবস্থান। বাঁধের ধার ঘেঁষে অতি কুশলতার সাথে তারা তাদের আত্মরক্ষার পরিকল্পনা রচনা করে। বাঁধের ফোকর ও পলিমাটি হালকা অস্ত্র চালনায় তাদের জন্যে সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আমাদের সৈনিকরা নিজেদের অসুবিধাজনক দিক সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই বিদ্রোহীদের নির্বীর্য করে দেয়ার লক্ষ্যে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তৈরী হলো। আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় এক ব্যাটালিয়নের কাছাকাছি। এছাড়া একটি ডেসটয়ার, দু'টি গানবোট, দু'টি ট্যাঙ্ক ও ভারী মর্টারের সমর্থন পেল আক্রমণকারী সেনাদলটি। তিনঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের দমন করা গেল। ঘটনাটি ঘটলো ৩১শে মার্চ; 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর ষষ্ঠ দিন।

রিজার্ভ পুলিশ লাই পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হিসেবে নির্ধারিত হলো। খবর আসে, সেখানে ২০ হাজার রাইফেল জড় করা হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা সেগুলো ব্যবহার করবে। এক ব্যাটালিয়ন সৈনিকের একটি দল নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হলো। কিন্তু প্রতিপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্‌ের লোকজনদের তুলনায় অনেক কম মনোবলের অধিকারী ছিল। ফরে দ্রুত তারা কাপ্তাই রোডের দিকে পিছু হটতে শুরু করে।

প্রতিরোধের এই মূল কেন্দ্রগুলোকে নির্বীর্য করে দেয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ব্রিগেডিয়ার আনসারী। পরে তাঁর এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় হিলাল-ই-জুরাত[২] পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তাঁকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয় (অবশ্য আগেও তিনি তাঁর সম্মুখবর্তীকে টপকে প্রমোশন পান)।

মার্চের শেষ দিকে চট্টগ্রামের মূল অপারেশন সমাপ্ত হলো। অবশ্য অবশেষটুকু মুছে ফেলার কার্যক্রম চলে এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত। প্রদেশের যে দু'টি শহরে বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে, সে দু'টি কুষ্টিয়া ও পাবনা। দেখা যাক, সেখানে আমাদের সৈনিকরা কেমন করেছে।

যশোর থেকে কুষ্টিয়ার দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সংযোগস্থল। সেখানে আমাদের সৈনিকদের কোন স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না। বিজয়ের দিনে ২৭ বেলুচ (যশোর) তার এক কোম্পানী সৈন্য সেখানে পাঠালো- 'শুধু আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে'। সঠিক নির্দেশের অবাবে কোম্পানীটি হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে হাজির হয়। সঙ্গে ছিল কয়েকটি রিকয়েলেস রাইফেলস্ ও সীমিত কিছু গোলাবারুদ। তারা ভেবেছিল, স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালনে তারা যাচ্ছে; তাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সাধারণতঃ প্রয়োজন পড়ে না্ কোম্পানী কমা ার তার সৈনিকদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ কেন্দ্রে প্রহরায় বসায়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের জন্যে একটি ছোট দলও পাঠায়। কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। সবাই বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। প্রথম দিনে (২৬শে মার্চ) কোম্পানী কমা ার পাঁচজন বিদ্রোহীকে হত্যা করে নিজের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করলো। এরপর সন্ধ্যা আইন জারি করা হলো এবং বেসামরিক লোকজনের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পালা শুরু হলো। শান্তিতে কাটলো দু'দিন।

২৮ মার্চ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ভীতি বিহ্বল মলিন চেহারায় কোম্পানী কমা ার মেজর শোয়েবের সামনে এসে হাজির হল। জানালো, কুষ্টিয়া থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত শহর চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহীরা জড় হয়েছে। রাত্রেই শহর আক্রমণ করতে পারে। তারা পাক-বাহিনীর 'সহযোগী'দের হত্যার হুমকি দিয়েছে। কোম্পানী কমা ার সৈনিকদের কাছে হুঁশিয়ারি সংকেত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈনিকরা তেমন গুরুত্ব দিল না। এমনকি পরিকা খননের ব্যাপারেও গা করলো না। প্রচ মর্টারের গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে রাত ৩টা ৪৫ মিটিটে (২৯শে মার্চ) আক্রমণ শুরু হলো। কাল্পনিক নিরাপত্তার জগত থেকে আমাদের সৈনিকরা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লো। তারা দ্র ত অনুধাবন করলো যে, আক্রমণকারীরা অন্য কেউ নয়- প্রথম ইস্ট বেঙ্গল-এর সৈনিকরাই। তাদেরকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাঠানো হয় 'ট্রেনিং-এর জন্যে'। চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) সাথে তারা মিলিত হয় (যশোরে চারজন ও সিলেটে দু'জন বিএসএফ-এর সৈনিক পরে ধরা পড়ে)।

সকাল বেলায় আমাদের সৈনিকরা পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। ফলে এ জায়গাটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিদ্রোহীরা স্থানীয় জজের লাল ইটের তিন তলা বাড়ির ছাদে উঠে পড়ে। তারা এই অবস্থানটিকে সুবিধাজনক স্থান হিসেবে ব্যবহার করলো। সেখান থেকে তারা পুলিশ ভবনের ভেতর বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে চললো। ভোরের দিকে আমাদের পুলিশ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করে। বেলা ৯ টার দিকে আরো ১১ জন প্রাণ হারায়। এরপর আধঘণ্টার মধ্যে আরো ন'জন মারা পড়ে। মাত্র কয়েকজন জীবিত অবস্থায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কোম্পানী সদর দফতরে এসে উপস্থিত হয়। গোলাবারুদের অভাব এবং যথাযথ ছত্রছায়ার অভাবে এই বিপর্যয় ঘটে।

কুষ্টিয়া শহরের অন্য দু'টি অবস্থান- টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ কেন্দ্র একই সাথে সমান তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়। ফলে কোন অবস্থানই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারলো না। কোম্পানী সদর দফতরে এক জায়গায়

মারা পড়ে ১১ জন। অন্য জায়গায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। আক্রমণের শুরুতেই ৬০ জনের মধ্যে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়। সাহায্যের জন্যে উন্মত্তের মত বার্তা পাঠানো হয় যশোরে। এমনকি বিমান আক্রমণেরও অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কুষ্টিয়াতে কিছুই পৌঁছলো না। দিনের শেষে প্রাপ্ত শেষ বার্তাটির জবাবে যশোর জানায়, 'সৈন্যরা এদিকে নিয়োজিত। নতুন সমাবেশ পাঠানো সম্ভব নয়। অস্বচ্ছ দৃষ্টিগোচরতার জন্যে বিমান আক্রমণ বাতিল করা হয়েছে.... খোদা হাফেজ।'

মেজর শোয়েব পুনঃসংগঠনের জন্যে তাঁর সৈনিকদের জড় করেন। দেখেন, ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৬৫ জন বেঁচে আছে। তিনি জীবিতদের নিয়ে যশোরে ফিরে যাওয়ার জন্যে কুষ্টিয়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা তিন টনী ট্রাক, একটা ডজ গাড়ী ও ৬টা জীপ লাইন বন্ধ করলেন। সেনাবহর রাত্রেই শহর ত্যাগ করলো। কোম্পানী কমান্ডার সম্মুখস্থ একটি জীপে উঠলেন। বড়জোর ২৫ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে তারা, এমনি সময় মেজর শোয়েবকে বহনকারী জীপটিসহ সম্মুকের গাড়িটি একটি কালভার্টে উঠতে গিয়ে ধসে খাদের ভেতর পড়ে গেল। বিদ্রোহীরা কালভার্টটি ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং বিভ্রম সৃষ্টির জন্যে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। গাড়ির বহর যেই মুহূর্তে থেমে গেল সেই মুহূর্তেই রাস্তার দু'পাশ থেকে প্রচন্ড আক্রমণ শুরু হলো। আমাদের সৈনিকরা লাফ মেরে গাড়ি থেকে নামলো এবং পাল্টা জবাব দিল। কিন্তু শত্রুপক্ষ বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে চললো। ৬৫ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন বুকে হেঁটে গ্রামের ভেতর সরে গেল। তাদের সবাই পরে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে এবং নির্মম হত্যার শিকারে পরিণত হয়। পাবনার সাথে কুষ্টিয়ার বিপর্যয়ের কাহিনীর অনেক মিল রয়েছে। এখানে রাজশাহী থেকে ২৫ পাঞ্জাব-এর একটি কোম্পানী পাঠানো হলো'শুধু আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে।' তারা সঙ্গে তিন দিনের খাদ্য-সম্ভার ও প্রাথমিক পর্যায়ের গোলাবারুদ নিয়ে আসে। পৌঁছেই কোম্পানীটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করা হয় এবং অরক্ষিত কেন্দ্রসমূহের প্রহরায় বসিয়ে দেয়া হয়। প্রহরা বসলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে; টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতেও হানা দিল কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। কোম্পানী কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করলো। প্রথম ৩৬ ঘণ্টা বেশ শান্তিতে কাটলো তাদের। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যে ৬টায় আক্রমণ আরম্ভ হলো। খাদের অপর পাড় থেকে তীব্রভাবে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (৯০০), পুলিশ (৩০ জন) ও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের (৪০ জন) সমন্বয়ে। আমাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অতএব, আমাদের আঘাত না হেনে বেশ দূর থেকে গুলিবর্ষণ করে চললো। আমাদের সৈনিকরাও পাল্টা গুলি চালালো। কিন্তু রসদের স্বল্পতার দরুণ মাত্রাতিরিক্ত গুলি চালানোর ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। প্রাথমিক এই সংঘর্ষে একজন এন,সি,ও এবং সাধারণ শ্রেণীর দু'জন সৈনিক আহত হল। বিদ্রোহীদের একটি হালকা মেশিনগান ক্যাপ্টেন আসগরকে অনবরত হয়রান করে চলেছিল। তিনি সেটাকে স্তব্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেশিনগানটার অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে সেটার উপর আঘাত হানলেন। গ্রেনেডটি অবস্থানের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। একই সময় আরেকটি হালকা মেশিনগানের গুলি ক্যাপ্টেন আসগরকে বিদ্ধ করে। মারাত্মক আঘাত পেলেন তিনি। গেটের থামের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টায় এগোন কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আক্রমণ পরিহার করা হলো। আরেকটি প্রচেষ্টা চালালেন লেফটেন্যান্ট রশীদ। কিন্তু তিনিও নিহত হলেন যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে সব অবস্থানগুলোর ক্ষতি সাধন করা হয়ে গেছে। বাকী রয়েছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি। বিদ্রোহীরা এখানেও জমা হলো। এরপর সব ধরনের আক্রমণ শুরু হলো। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত আত্মরক্ষাকারী দল তাদের মূর্খতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। এর জন্যে বেশী রকম মূল্য দিতে হলো তাদের। তারা দু'জন অফিসার, তিনজন জুনিয়র কমিশনড্ অফিসার এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৮০ জনকে হারালো। এছাড়া একজন অফিসারসহ ৩২ জন আহত হলো। বার বার সাহায্যের অনুরোধ জানানো হলো। অনুরোধে আহতদের উদ্ধারের জন্যে একটি হেলিকপ্টারও আসে কিন্তু মাটিতে নামতে পারলো না। মেজর আসলাম বহু কষ্টে ১৮ জন সৈনিকসহ একটি রিকয়েলেস রাইফেল, একটি মেশিনগাম ও কিছু গোলাবারুদ নিয়ে পাবনা শহরে পৌঁছতে সক্ষম হন। এবং জীবিতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। আহতদের একটি ডজ গাড়ীতে ওঠালেন। সম্ভাব্য আক্রমণকে এড়াতে গ্রাম্য পথ ধরে তাদেরকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে রাজশাহী অভিমুখে রওনা হন। পথে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সঙ্গে নিলেন কিছু শক্ত সামর্থ্য সৈনিক। রাস্তায় তারা প্রচ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফলে গ্রামাভ্যন্তরের রাস্তা ধরলো। গ্রামের ভেতর তাদেরকে তিন দিন খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে হয়। ১লা এপ্রিল সকাল দশটার সময় তারা রাজশাহী পৌঁছে। তখন সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো। মেজর আসলামসহ বাদবাকীদের আসবার পথেই হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনায় আমরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হই। হতাহতও হয় সবচেয়ে বেশী। চট্টগ্রাম পরিষ্কার করা হলো ৬ই এপ্রিলে; কুষ্টিয়া ১৬ই এপ্রিলে এবং পাবনা ১০ই এপ্রিলে। অন্যান্য এলাকায়- যেখানে আমরা শক্তিশালী ছিলাম সেসব জায়গা দখলে চলে আসে তেমন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই। বিদ্রোহীরা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদেরই তাদের হিসেবের খাতায় অর্ন্তভুক্ত করেনি, বেসামরিক লোকজন ও তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে একই ধরনের নির্মমতার সাথে হত্যা করে। এখানে সব ঘটনা উলে্লখ করা সম্ভব নয়। আমি সেসব কাহিনীর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

দুই ইস্ট বেঙ্গল-এ ছড়ানো-ছিটানোভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার; জে,সি,ও এবং কিছু এন,সি,ও (শুধু কারিগরি ক্ষেত্র) ছিল। ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জয়দেবপুরের একটি পুরাতন প্রাসাদে এর সদর দফতর। সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিটের সাথে যাতে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয় সে জন্যে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হয়। দুই ইস্ট বেঙ্গল-এর তিনটি কোম্পানীকে 'ট্রেনিং-এর জন্যে' গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে পাঠানো হলো। চতুর্থ কোম্পানীকে জয়দেবপুরের পুরাতন প্রাসাদে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে রেখে দেয়া হয়। এই সেই স্থান- যেখানে ১৯৭০ সারে কালার প্রদান অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

অন্যান্য বাঙ্গালী ইউনিটের সাথে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাটালিয়নটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা তাদের আনুগত্যের প্রথম প্রকাশ ঘটালো পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মী ও তাদের পরিবার পরিজনদের হত্যার মাধ্যদিয়ে। এই ব্যাটালিয়নে কুড়ি বছরের ওপর কাজ করছে এই রকম একজন- নাম সুবেদার আইয়ুব- কোন রকমে ওই পরিকল্পিত হত্যাকে এড়িয়ে ২৮শে মার্চ দুপুরের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এসে হাজির হয়। সেই-ই ওই হত্যাকান্ডের প্রথম খবর দেয়। সেই যখন সদর দফতরে এসে পৌঁছে তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল সে। তার শুকনো ঠোঁটের কোণ থুথু জমে সাদা হয়ে গেছে। সবাই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। সে এতই ভয়ার্ত ছিল যে, হাতে চায়ের কাপও ধরে রাখতে পারছিল না। কিংবা কোন রকম উপদেশও তার কানে প্রবেশ করছিল না। সে সাহায্য চাইলো- তাৎক্ষণিক সাহায্য।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য পাঠানো হয়। কয়েকজন তরুণ অফিসার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেনাদলের সাথে যোগ দেয়। ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে পৌঁছতেই তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করলো। ময়লা স্তুপের উপর পাঁচটি শিশু পড়ে আছে। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে ফেলা হয়েছে। এই শিশুগুলোর মায়েরা আরেকটি স্তূপের উপর পড়ে আছে। তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। দেহ বিকৃত করা হয়েছে। এদে ভেতর থেকে সুবেদার আইয়ুব তার পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে। শোকে সে উম্মাদ হয়ে গেল- আক্ষরিক অর্থেই উম্মাদ।

প্রাসাদ প্রাঙ্গনের মধ্যে বেতার সরঞ্জাম সজ্জিত একটি জীপ দাঁড়িয়েছিল। টায়ার চ্যাপটা হয়ে গেছে। সিটে রক্তে ডুবে আছে। বেতার যন্ত্রটির উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিঁটে লেগে আছে। ভবনের ভেতরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তারা দেখে, গোসলখানার ভেতর রক্তে ভেজা কাপড় পড়ে আছে। এই পোশাকটি গুজরানওয়ালার ক্যাপ্টেন রিয়াজের। পরে এটা নির্ণীত হয়। সাধারণ শ্রেণীর সৈনিকদের কোয়ার্টারে গিয়ে তারা দেখতে পায়, একটি তরুণী মাতার মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি শিশু শুকনো স্তন থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেকটি ঘরে গিয়ে দেখে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে চার বছরের একটি ভয়ার্ত শিশু হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে, 'আমাকে মেরো না। আমার বাবা বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দয়া করে আমাকে মেরো না।'

অন্যান্য কেন্দ্র তেকে একই ধরণের কাহিনী শোনা গেল। কিছু কিছু কাহিনীতে এত বেশী অতিনাটকীয়তা ছিল যে, তা বিশ্বাস করা ছিল কঠিন। অথচ এগুলো সব সত্য ঘটনা। কয়েক মাস পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ আমাকে বলেন, এই দুর্ভোগের জন্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবই দায়ী। কেননা, 'মার্চের গোড়ার দিকে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের আনার ব্যাপারে তিনি বিরোধিত করেছিলেন। সময়মত তিনি যদি শক্তি সংগঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে প্রতিটি প্রধান শহরে এই হত্যার তান্ডবলীলা রোধে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য থাকতো।'

স্মরণযোগ্য যে, রাজনৈতিক সমঝোতা যখন নাজুক পর্যায়ে উপনীত হয় সেই সময় জেনারেল ইয়াকুব সৈন্য চলাচলে বিরোধিতা করেন। যদি অনিবার্য হামলার বিষয়ে জেনারেল হামিদ ইয়াকুবের কাছে খোলাখুলি হতেন তাহলে আমার বিশ্বাস, জেনারেল ইয়াকুবের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর হতো। এখন যেহেতু জেনারেল ইয়াকুব আর দৃশ্যপটে নেই এবং হামলা সংঘটিত হয়েছে ও এর যাবতীয় প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিঘাত আরম্ভ হয়েছে সেহেতু সৈন্য পাঠানোর বিষয়ে আরে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না। এইভাবে অপারেশন 'গ্রেট ফ্লাই ইন'-ও শুরু হয়ে গেল ২৬শে মার্চের (আগে নয়) প্রারম্ভ থেকে। যেসব সেনাদল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে পৌঁছলো তাদেরকে দ্রুত সেইসব এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হল- যেখানটা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল।

প্রধান প্রদান শহরসমূহের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সাথেই প্রদেশের অন্যান্য শহরগুলোতে শক্তিশালী সেনাদল পাঠানো হয়। ১লা এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল গেল একটি সেনাদল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। প্রধান সেনাদলটি মেশিনগান সজ্জিত ট্রাকে করে যাচ্ছিল। অন্য দু'টি কোম্পানী রাস্তা ছেড়ে পাঁচশ' মিটার দূর দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটছিল। কোম্পানী দু'টি সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবেরার জন্য এবং অনুপ্রেরণা সৃস্টি ও নিস্তেজকরনের রণসজ্জায় ছিল সজ্জিত। তাদের ক্রোধাগ্নি থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। পদাতিক সেনাদলের পেছনে ফিল্ডগানদারী গোলন্দাজদের একটি অংশও ছিল। তারা বেশ সময নিয়ে থেমে থেমে সামনের দিকে লক্ষ্য করে কিছু গোলাবর্ষণ করলো। ফিল্ডগানের প্রচণ্ড শব্দ এলাকার বিদ্রোহীদের জন্যে আতংক সৃষ্টিতে যথেষ্ট ছিল।

পদাতিক দল সামান্যতম অজুহাতে কিংবা সন্দেহে গুলীবর্ষণ করে চললো। গাছের পাতা নড়ার শব্দে কিংবা কোন বাড়ীর ভেতর থেকে আসা শব্দে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার হতে থাকলো। যেকানে ব্রাশ ফায়ার হলো না সেখানে অন্ততঃ রাইফেলের গুলিবর্ষণ হলো। টাঙ্গাইল রোডের উপর করটিয়ার কাছাকাছি ছোট্ট একটি জনপদ ছিল। একটি অখ্যাত জনপদ। সেখানকার ঘটনা আমার মনে আছে। অনুসন্ধানী সৈনিকরা জনপদটির মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাবার সময় সেখানকার কুঁড়ে ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। কাছাকাছি বাঁশঝাড়গুলোও আগুন থেকে রেহাই পেল না। আগুন লাগিয়ে কিছু দূর এগিয়েছে মাত্র- এই সময় আগুনের তাপে প্রচণ্ড শব্দ করে একটি বাঁশ ফাটে। সবাই এই শব্দকে লুকিয়ে থাকা 'দুষ্কৃতকারী'র রাইফেলের গুলি বলে মনে করলো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সেনাদলটি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো জনপদটিকে বিদীর্ণ করে ফেলার জন্যে। যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করা হলো বাঁশঝাড়টিতে। বিপদের উৎসটিকে নিশ্চিহ্ন করার পর সতর্ক সন্ধানের আদেশ দেয়া হল। অনুসন্ধানীরা জীবন্ত কিংবা মৃত কোন মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলো না। বাঁশ ফাটার শব্দ অগ্রযাত্রাকে পনের মিনিট দেরী করিয়ে দিল।

করটিয়া একটি ছোটখাট শহর। নাম না জানা নানা বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একসারি দোকান ঘরের একটি বাজার নিয়ে এই শহরটি। লোকজন আগেই ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল তারা? খুঁজে বের করা সমস্যার ব্যাপার। সেনাদলটি সেখানে থামলো। শহরটি ভাল করে খুঁজে দেখলো। তারপর বাজারটি জ্বালিয়ে দিল। কয়েকটি কেরোসিনের

টিনে আগুন লাগানো হল। দ্রুত বাজারটি এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। ধূম্র কুণ্ডলীসহ আগুন লকলকিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে উপরে উঠলো। সৈনিকরা তাদের কাছের ফলাফল দেকার জন্যে দেরী করলো না। সামনে এগোতে শুরু করলো। আমরা যখন শহরের অপর প্রান্তে পৌছলাম তখন খুঁটির সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটি কালো ভেড়া আমার দৃষ্টিগোচর হলো্ দেখলাম, ভেড়াটি তার দগ্ধিভূত ঘরে ফেরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কেননা, মুক্তির জন্যে টানাটানিতে তার গলায় বাঁধা দড়ির ফাঁস আরো শক্ত করে আটকে যাচ্ছে। মনে হল, নিশ্চয় শ্বাসরোধে ওটার মৃত্যু ঘটবে।

কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে ইংরেজী 'ভি' অক্ষর সাইজের দু'টো পরিখা দেখতে পেলাম আমরা। পরিখা দু'টো নতুন খোঁড়া এবং পরিত্যক্ত। সম্ভবতঃ বিদ্রোহীরা আমাদেরকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের অস্ত্রের প্রচণ্ড শব্দ শুনে তারা স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনা যাই হোক, এলাকাটার একটা ব্যবস্থা না করে সামনে এগোনো গেল না। তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্যে যখন সৈনিকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো আমি তখন একটি মাটির ঘরের দিকে এগোলাম। কিভাবে লোকজন জীবনযাপন করে, তা দেকার ইচ্ছায়। ঘরের ভেতর মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা- কিছুটা ধূসর বর্ণ ধারণ করে আছে। সামনের দেয়ালে দু'টো শিশুর ছবি বাঁধানো। সম্ভবতঃ দু'ভাই তারা। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র বলতে ছিল একটিমাত্র চৌকি এবং খেজুরের পাতার তৈরী একটি মাদুর। মাদুরের উপরে পড়ে থাকা একটি থালায় কিছু ভাত পড়ে আছে। তাতে শিশুর আঙ্গুলের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি শিশু খেতে বসেছিল। তারা এখন কোথায়? কেন তারা পালিয়ে গেল?

উচ্চস্বরের কথাবার্তায় আমার ইতস্ততঃ ভাবনার সূতো হঠাৎ করে ছিঁড়ে গেল। বাক বিনিময় হচ্ছিল একজন সৈনিক ও একজন বৃদ্ধ বেসামরিক বাঙ্গালীর মধ্যে। বৃদ্ধকে সৈনিকেরা কলাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে এনেছে। বৃদ্ধটি 'দুষ্কৃতকারী'দের সম্পর্কে কোন খবর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। অন্যদিকে সহযোগিতা না করার অপরাধে সৈনিকেরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। কি হচ্ছে- দেখার জন্যে আমি এগিয়ে গেলাম। বাঙ্গালীটি একটি জীবন্ত কঙ্কালের শামিল। কোমরে একখণ্ড ময়লা সূতী কাপড় জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেছে। দুখে দাঁড়ি। তবু তাঁর চেহারায় আতংকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি তার অর্ধউলঙ্গ শরীরের দিকে তাকালাম। দৃষ্টি ধীরে ধীরে পায়ের গোছায় নামিয়ে আনলাম। চোখ স্থির হলো ধুলো ভর্তি পায়ের ফোলা শিরার উপর গিয়ে। আমার এই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে আমার দিকে মুখ ফেরালো এবং বললো, 'আমি একজন গরীব মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করবো। কিছুক্ষণ আগেও তারা (দুষ্কৃতকারীরা) একানে ছিল। যাদি তাদের কারো সম্পর্কে কোন কিচু বলি তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। এখন আপনারা আমাকে একই ভয়াবহ পরিণতির মুখে দাঁড় করিয়েছেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছু যদি না বলি আপনারা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন।' সাধারণ বাঙ্গালীর উভয় সঙ্কটমূলক অবস্থার এই হচ্ছে সার সংক্ষেপ।

সেনাদল অত্যন্ত সতর্ক ও দৃঢ়তার সাথে এগিযে চললো। অবশেষে সন্ধ্যায় তারা টাঙ্গাইল শহরে পৌছলো। সার্কিট হাউস থেকে বাংলাদেমের পতাকা অপসারণ করে জাতীয় পতাকা ওঠানো হলো। উপস্থিতির জানান দেয়ার জন্যে আটটি গোলা বর্ষণ করা হলো এবং রাত্রের মত অবস্থান নেয়া হলো। আমি ঢাকায় ফিরে এলাম।

কয়েকটি বিদ্বেষপরায়ণ বিশ্ব সংবাদ প্রতিষ্ঠান আগ্রহসহকারে ব্যাপক হত্যাকান্ডের যে সংবাদ ছেপেছিল তা 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘটিত হয়নি। পরবর্তী দীর্ঘ গৃহযুদ্ধকালে তা সংঘটিত হয়। কুমিলণ্ডা, যশোহর, রংপুর, সিলেট এবং অন্যান্য জায়গা মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে পদাতিক সেনাদল পাঠানো হয়। সাধারণতঃ তারা পীচঢালা রাজপথ দিয়ে যেত। ফলে গ্রামাভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের পালিযে যাবার সুযোগ থাকতো অথবা সীমান্তের দিকে সরে যেতো। অবশেষে ভারতীয় পৃস্ঠপোষকদের কোলে আশ্রয় নিত। সেনাদল ও তাদের সমরসম্ভারের প্রাপ্যতার উপরই অপারেশনের গতি নির্ভর করতো।

২৬শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিলের মধ্যে অতিরিক্ত জনবল এবং সমরসম্ভার এসে গেল। এই সময়ের মধ্যে দু'টি ডিভিশনাল সদর দফতর (ডিভিশন-৯ ও ডিভিশন-১৬), পাঁচটি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার, একটি কমান্ডো বাহিনী ও বারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন পৌছে গেল। তারা তাদের ভারী অস্ত্র-শস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে আসে। কেননা, তারা আসে বিদ্রোহ দমন করতে- প্রকৃত যুদ্ধ করতে নয়। এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে এবং মে মাসের ২ তারিখে আরো দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও দু'টি মর্টার ইউনিট এসে গেল। ১০ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্যারা মিলিটারী বাহিনী পাঠানো হলো। সঙ্গে আসে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড বাহিনী (ই, পি, সি, এ, এফ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জারস্ (ডবিণ্ডউ, পি, আর)। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে উলেণ্টখযোগ্যসংখ্যক স্কাউটও আসে। তাদেরকে প্রধানঃ স্বপক্ষত্যাগী রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনদের জায়গায় বসানো হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যত সৈনিক আনা হয় সবাইকে 'অপারেশন সার্চ লাইট' সম্পন্ন করার জাজে নিয়োজিত করা হয়। মূলতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে 'অপারেশন সার্চ লাইট বন্ধ ঘোষিত হয়নি কখনো। কিন্তু ধরে নেয়া হয়, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা যাবে। কেননা, ততদিন প্রদেশের সকল প্রধান শহরগুলো দখলে এসে যাবে। বর্ণনাকালে জীবনহানির যে সংখ্যা আমি উলেণ্টখ করেছি সেটা ছাড়া 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এ ঠিক কতসংখ্যক হতাহত হয়েছিল; সে তথ্য আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। কিন্তু আমার হিসেবের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ জড়ো করে বলতে পারি, সংঘর্ষে জীবনহানির সংখ্যা বড়জোর চার অংকের কাছাকাছি পৌছে। যদি বিদেশী সংবাদপত্র বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের জন্যে দায়িত্ব বর্তায় তাদেরই উপর- যারা ২৬শে মার্চ (সন্ধ্যায়) ঢাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করে। এতে ভারতীয় প্রোপাগান্ডা কিংবা একপেশে মনোভাবসম্পন্ন ট্যুরিষ্টদের মনগড়া কাল্পনিক গল্পের উপর ভিত্তি করে তারা খবর পরিবেশন করে। যদি বিদেশী সাংবাদিকদের ২৫শে মার্চের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হত

তাহলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিও বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখে যা লিখতো- যদিও ঘটনা দারুণ দুঃখবহ ছিল- তথাপি লেখায় এ সম্পর্কে যে পরিমাণ হৃদয়বিদারকমূলক বর্ণনা এসেছে ততটা আসতে পারতো না। (৩)

---

১) পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে জিয়াউর রহমান সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান এবং মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অভ্যুত্থানে তিনি পরিবারের সকল সদস্যসহ নিহত হন। পরে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন।

২) পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পুরস্কার।

৩) প্রধান প্রধান শহরসমূহ দখলে আসে ঃ পাকশী (১০ এপ্রিল), পাবনা (১০ এপ্রিল), সিলেট (১০ এপ্রিল), ঈশ্বরদী (১১ এপ্রিল), নরসিংদী (১২ এপ্রিল), চন্দ্রঘোনা (১৩ এপ্রিল), রাজশাহী (১৫ এপ্রিল), ঠাকুরগাঁও (১৫ এপ্রিল), কুষ্টিয়া (১৬ এপ্রিল), লাকসাম (১৬ এপ্রিল), চুয়াডাঙ্গা (১৭ এপ্রিল), ব্রাহ্মাণবাড়িয়া (১৭ এপ্রিল), দর্শনা (১৯ এপ্রিল), হিলি (২১ এপ্রিল), সাতক্ষীরা (২১ এপ্রিল), গোয়ালন্দ (২১ এপ্রিল), দোহাজারী (২২ এপ্রিল), বগুড়া (২৩ এপ্রিল), রংপুর (২৬ এপ্রিল), নোয়াখালী (২৭ এপ্রিল), শান্তাহার (২৭ এপ্রিল), সিরাজগঞ্জ (২৭ এপ্রিল), মৌলভীবাজার (২৮ এপ্রিল), কক্সবাজার (১০ মে), মৌলভী হারিয়াদী (১০ মে)।

এই উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে সালিক সিদ্দিকের বই উইটনেস টু স্যারেন্ডার, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯৭, পৃঃ ১৪৬-১৫৭।

পরিশিষ্ট-৬

গোপনীয়

অব্যবহিত

সদর দপ্তর ইষ্টার্ণ কমান্ড
ঢাকা সেনানিবাস

দুরালাপনী ঃ ২৫১৭২১/আর/এআই   ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১

প্রতি	কমান্ডার ৯ ডিভিশন	কমান্ডার সি এ এফ
	কমান্ডার ১৪ ডিভিশন	এ সি সি পি এ এফ
	কমান্ডার ১৬ ডিভিশন	ও সি ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন
	ডিজি ই পি সি এ এফ	ও সি লগ ফিট
	কমান্ডার ই পি লগ এরিয়া	ও সি ৬০৪ এফ আই ইউ
	সি ও এন সি ই পি	ও সি ৭৩৪ এফ আই সি
		ও সি ২৭ জি এল সেকশান
ইনফোঃ	এইচ কিউ এম এল এ জোন 'বি'	ডেট আই এস আই
ইন্টারনালঃ	জি এস ব্রাঞ্চ	সংস্থাপন ব্রাঞ্চ
ডিস্ট্রিবিউশন	এইচ কিউ ডিফেন্স কোম্পানী	

বিষয় ঃ শৃঙ্খলা- সেনা সদস্যদের

১. আমার আসার পর থেকে, আমি সেনাসদস্যদের লুণ্ঠনের সাথে জড়িত ও বাড়িঘরে আগুন লাগানো সম্বন্ধে অগনিত রিপোর্ট পেয়েছি, রাষ্ট্রদ্রোহী মুক্ত এলাকা সমূহে কোন কারণ ব্যতীরেকে এবং লক্ষ্যহীনভাবে জনসাধারণকে হত্যা করা হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে সেখানে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে এবং এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকেও রেহায় দেওয়া হয়নি; ১২ই এপ্রিলে দুই জন পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এবং অপর দুই জনকেও ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। অনেকে এ কথা বলেছেন যে, লুণ্ঠনকৃত মালামালগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া পরিবারসমূহের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

২. আমি জানতে পেরেছি, সন্দেহ করা হচ্ছে এমনকি অফিসারবৃন্দরাও লুণ্ঠনের মত লজ্জাজনক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং, আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে যে, বারংবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, কমান্ডারেরা এই পর্যন্ত তাদেরকে এই ধরণের ভীতিকর বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সংযত করাতে ব্যর্থ হন। আমার মনে হয়, কমান্ডিং অফিসারবৃন্দ এবং 'ও সি' ইউনিটসমূহ/সাব-ইউনিটসমূহ এই ধরনের অপরাধীদেরকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

৩. আমি এখানে সকল কমান্ডারদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে, জরুরী ভিত্তিতে যদি এই ধরণের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং দমন করা না হয়, তার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সেনা বাহিনীর শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। ইহা একটি সংক্রামক ব্যধি

এবং অবশ্যই আপনাদেরকে এর প্রতিকূল পরিণতি এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা উচিত। কখনো হয়তো এই ধরণের কর্মকাণ্ডের কারণে আমাদের মহিলাদের এবং নিজেদের মধ্যেও হিতে বিপরীত হতে পারে। ইতিহাসে এই ধরণের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়, যুদ্ধে সৈনিকদের লুঠতরাজ এবং ধর্ষণের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হওয়ার কারণে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

৪. অতএব, আমি নির্দেশনা দিচ্ছি যে, সেনা সদস্যদেরকে বিশৃঙ্খলা, অভদ্রতা এবং অশণ্টীলতার জন্য শাস্তি দিতে হবে এবং কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। যে সমস্ত অফিসারবৃন্দ, এই ধরণের কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে অবশ্যই প্রতিরোধক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আমি চাই না সৈনিকেরা ভবঘুরে এবং ডাকাতে পরিণত হোক। ঐ ধরণের ব্যক্তিদেরকে কোন আশ্রয়, দয়া অথবা অনুগ্রহ করা যাবে না।

৫. আমি কমান্ডারদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের সম্মুখে একটি পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে এবং আমরা এখনো আমাদের নিধারিত লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। কোন অবস্থাতেই যেন আমরা, আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা থেকে বিরত না থাকি। কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলতাই এটা থেকে দূরে সরাতে পারবে।

৬. আমি চাই এই অঞ্চলের প্রত্যেক সৈনিক আদর্শবান এবং শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। অফিসারদের ব্যাপারে একই সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের একটি আচার এবং আচরণ বিধি রয়েছে, এবং একজন ভদ্রলোক ও অফিসার হিসাবে আমি চাই তারা এটি মেনে চলবে। এই প্রদেশের মানুষের আস্থা অর্জন এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহা জরুরী।

৭. এই নির্দেশনা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত সকল গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, মিলিটারী পুলিশ এবং কমান্ডোদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

স্বাক্ষর

লেঃ জেঃ

কমান্ডার ইষ্টার্ণ কমান্ড

(আমির আবদুলণ্ঢাহ খান নিয়াজী)

গোপনীয়

পরিশিষ্ট-৭

আত্মসমর্পন দলিল

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সকল সশস্ত্রবাহিনীর আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হচ্ছেন। এই আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের সকল সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এবং আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব বাহিনী সকলেই- যারা যেখানে আছে, সেখানকার নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও সকল অস্ত্র সমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সময় থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীনস্থ বলে বিবেচিত হবে। কোন প্রকার অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং যুদ্ধের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। যদি আত্মসমর্পণের কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই আশ্বাস প্রদান করছেন যে, আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী একজন সৈনিকের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সকল সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার অঙ্গীকার প্রদান করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনস্থ সেনাবাহিনীর সকল বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।

জগজিৎ সিং অরোরা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	**আমির আবদুলণ্ডাহ্ খান নিয়াজী** লেফটেন্যান্ট জেনারেল সামরিক আইন প্রশাসক জোন- বি এবং কমান্ডার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পরিশিষ্ট-৮

অলি আহমদ এর গোপনীয় প্রতিবেদন, ১৯৭২ এবং ১৯৭৩

নম্বর ঃ এসএস-৯৭০৬ নাম ঃ অলি আহমদ, বীর বিক্রম

পার্ট-২ ঃ উর্ধ্বতন অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন এবং গ্রেডিং

অফিসারের অধীন থাকাকলীন সময়ের প্রতিবেদন ঃ-

..... হইতে..... পর্যন্ত

নিযুক্তির ধরণ, তারিখসহ .....

১। সেকশন 'এ'-কর্মক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (জি,এইচ,কিউ পত্র নং.....

তারিখ..... এর পরিশিষ্ট 'এ' এবং 'বি' এর নির্দেশাবলী অনুযায়ী)

তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী, সাহসী এবং নিবেদিত প্রাণ অফিসার যিনি নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করতে যেকোন ধরণের ঝুঁকি নিবে। তিনি খুব দ্রুত, যে কোন সমস্যা সহজে বুঝতে পারেন এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাঁর অধীনস্থদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল।

এই অফিসার চট্টগ্রামে ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ সংকটময় রাতে ৮ম ব্যাটালিয়ন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময়ব্যাপী এই অফিসার শত্রুর বিপক্ষে এবং প্রচন্ড প্রতিকূলতার মুখেও ধীর স্থিরভাবে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সরাসরি অনেক আক্রমনে প্রশংসনীয়ভাবে অংশগ্রহন করেছিলেন। ব্রিগেড মেজর হিসেবে তিনি অসাধারণ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অধিকাংশ সময় ডি কিউ এম জি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী ভারতীয় অফিসারসহ অন্যান্যদের, এমনকি যারা 'জেড' ফোর্সের সাথে বিভিন্ন সময়ে সহযোগী হিসেবে ছিলেন তাদের জন্যও অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল।

২. সেকশন 'বি'- সাধারণের উর্ধ্বে (Above Average)

ইংরেজীতে কথা বলার কিছু উন্নতি করতে হবে।

জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত
ব্রিগেড কমান্ডার, ৪৪ ব্রিগেড
প্রতিবেদনকারী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষর এবং তারিখ

অফিসারের স্বাক্ষর, তারিখসহ
* প্রতিবেদসমূহে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে এই অফিসারের কর্মদক্ষতা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩। বর্তমান পদমর্যাদায় পদ বিন্যাস ঃ আউটষ্ট্যান্ডিং (অসাধারণ)।

নম্বর ঃ এসএস-৯৭০৬ নাম ঃ অলি আহমদ, বীর বিক্রম

১৪। পরবর্তী উর্ধ্বতন রিপোর্টিং অফিসারের মন্তব্য (নির্দেশাবলী দেখুন) ঃ

আমি প্রতিবেদনকারী অফিসারের প্রতিবেদনের সাথে একমত।

বিগ্রেডিয়ার কে.এম. শফিউলণ্ঢাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষর এবং পদবী.....

নাম ঃ কে.এম. শফিউলণ্ঢাহ

নিয়োগ স্থল এবং ইউনিট- সেনা বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

তারিখ ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ৭৩।

নম্বর ঃ এস,এস-৯৭০৬ নাম ঃ অলি আহমদ, বীর বিক্রম

১৪। মন্তব্য (নির্দেশাবলী দেখুন) ঃ

কোন কিছু সংগঠিত করতে এই অফিসারের অসাধারণ দক্ষতা ছিল । তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তাঁর পদবীর দায়িত্বের চেয়েও অধিকতর দায়িত্ব পালনে সামর্থ ছিলেন। এই অফিসারকে যদি সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় তাহলে তিনি সেনাবাহিনীর জন্য গৌরবের বিষয় হবেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর কার্যক্রম ছিল প্রশংসনীয়- বস্তুতঃ তিনিই প্রথম অফিসার যিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ রাত্রে স্বউদ্যোগে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।

মীর শওকত আলী কর্তৃক স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষর এবং পদবী.....
নাম ঃ মীর শওকত আলী
ব্রিগেড কমান্ডার

নিয়োগের স্থল এবং ইউনিট
তারিখ ঃ ৮ই মার্চ ৭৪।

পার্ট ৬- পরবর্তী উর্ধ্বতন রিপোর্টিং অফিসারের মন্তব্য।

১৫। ..... হইতে..... পর্যন্ত

১৬। মন্তব্যের ভিত্তি ঃ..... অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ / পুনঃপুনঃ /অসাধারণ পর্যবেক্ষণ।

১৭। ক) পার্ট-৩ হইতে পার্ট-৪ পযন্ত সুপারিশের সাথে আপনি কি একমত?

না / হ্যাঁ / কোনটি নয়।

খ) যদি এই ক্ষেত্রে কোন ধরনের দ্বিমত থাকে তাহলে আপনার সুপারিশ দিন ঃ-

গ) বর্তমান পদবীতে গ্রেডিং- সাধারণের উর্ধ্বে (Above Average)

১৮। মন্তব্য (নির্দেশাবলী দেখুন) ঃ

তিনি একজন ন্যায়বান অফিসার যিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সাহসী। তিনি খুবই বুদ্ধিমান এবং উদ্যোমী।

মেজর জেনারেল জিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষর এবং পদবী.....

নাম ঃ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
ডি,সি,এ,এস

নিয়োগের স্থল-
তারিখ ২০ আগষ্ট ৭৪

পরিশিষ্ট-৯

প্রশ্নমালা

১। নাম এবং ঠিকানা ঃ

২। কোন সেক্টরে আপনি যুদ্ধ করেছেন ঃ

৩। আপনি যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন অনুগ্রহপূর্বক তাদের কয়েকজনের নাম বলুন ঃ

৪। কিভাবে আপনি দেশপ্রেমকে ধারণ করেন?

৫। যখন আপনি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন তখন কি আপনি নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে ভেবে ছিলেন?

৬। আপনি কি এখন খুবই গর্ববোধ করেন?

৭। যুদ্ধে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে আপনার প্রেষণা কি ছিল?

৮। এই যুদ্ধে আপনাকে প্রেরণা যোগানোর উৎস কি ছিল?

৯। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পকিস্তানে কি ঘটতে যাচ্ছিল আপনি কি সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

১০। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা যেকোন সময় হতে পারে সেটা কি আপনি আশা করেছিলেন?

১১। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সাল পাকিস্তানী নেতাদের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ করেছে শুনে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

১২। আপনি কি জানতেন না যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহন করা আপনার চাকুরী বিধি বহির্ভূত এবং শৃঙ্খলার লঙ্ঘন হিসেবে গন্য হবে?

১৩। আপনি কি জানতেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থই হল কেবলমাত্র আপনার ক্যারিয়ার শেষ নয়, বরং সেই সাথে আপনার জীবনও শেষ?

১৪। কখন আপনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনের কথা চিন্তা করেছিলেন?

১৫। যুদ্ধে অংশগ্রহনের সময় আপনি কি আপনার কোন সহকর্মী অথবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন?

১৬। যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য আপনি কি কোন বাধ্যবাধকতা অনুভব করেছিলেন?

১৭। আপনি কি পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? হয়ে থাকলে কখন?

১৮। কার নেতৃত্বে আপনি যুদ্ধ করেছিলেন?

১৯। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনার আদর্শ হিসেবে কে ছিল বলে মনে করেন?

২০। যুদ্ধক্ষেত্রের নায়ক হিসেবে যখন আপনি সম্মানজনক পদক গ্রহন করেছিলেন তখনকার অনুভূতিটুকু অনুগ্রহপূর্বক সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?

২১। আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন?

২২। যুদ্ধের মাধ্যমে আপনি পরিস্থিতির পরিবর্তন করবেন, কিভাবে সেটা চিন্তা করেছিলেন?

২৩। আপনি কি মনে করেন যুদ্ধে অংশগ্রহনের আপনার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সঠিক ছিল?

২৪। আপনার পড়া কোন বই থেকে আপনি কি কোন প্রেরণা পেয়েছিলেন?

গ্রন্থপঞ্জী

১। "এ ক্রিটিক্যাল রিপোর্ট অন দ্যা রোল অব মিলিটারি ইন দ্যা ওয়ার", দ্যা পিপলস ভিউ, ফেব্রুয়ারি ২৯, ১৯৭২।

২। এডলার, পি. এ. এন্ড এডলার, পি., "অবজারভেশনাল টেকনিক্স" ইন এন. কে. ডেনজিন এন্ড ওয়াই. এস. লিনকন, সম্পাদিত, হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটাটিভ রিচার্জ, লন্ডন, চেক পাবলিকেশনস, ২০০০।

৩। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, "দ্যা সিক্স-পয়েন্ট প্রোগ্রামঃ ইটস্ ক্লাস বেসিস," দ্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিস, ভলিউম ৩০, জুলাই ১৯৭৯।

৪। _____, বুরোক্রেটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনমিক গ্রোথঃ পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ,১৯৮০।

৫। _____, বুরোক্রেটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনমিক গ্রোথঃ এ কেইচ স্টাডি অব পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ, এন আনপাবলিশড পি.এইচ.ডি. থিসিস, ১৯৭৭, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কানাডা।

৬। _____, মিলিটারি রুল এন্ড মিথ অব ডেমোক্রেসি, ঢাকাঃ দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮।

৭। আহমেদ, এমাজউদ্দিন, সম্পাদিত, সোসাইটি এন্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

৮। আহমদ, আবুল মনছুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকাঃ নওরোজ, ১৯৬৮।

৯। আহমদ, জামিলউদ্দিন, সম্পাদিত, স্পিসেস এন্ড রাইটিংস অব মি. জিন্নাহ্, ভলিউম ২, লাহোর, আশরাফ।

১০। আহমেদ, ফখরুদ্দিন. ক্রিটিক্যাল টাইমসঃ মেমোরিস অব এ সাউথ এশিয়ান ডিপেণ্ডাম্যাট.। ঢাকা ঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪।

১১। আহমেদ, হাফিজ উদ্দিন, মেজর (অবঃ), রক্ত ভেজা একাত্তর, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

১২। আহমেদ, কামরুদ্দিন, এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকা ঃ ক্রিসেন্ট বুক, ১৯৬৭।

১৩। আহমেদ, মওদুদ, বাংলাদেশ ঃ ইরা অব শেখ মুজিবর রহমান, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৪।

১৪। _____, ডেমোক্রেসি এন্ড দ্যা চ্যালেঞ্জ অব ডেভলপমেন্ট, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।

১৫। আহমেদ, এস., সরকার এম., এন্ড মনজুর এন.আই., হিস্ট্রি অব লিবারেশন ওয়ার ইন বাংলাদেশ, ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৬। আহমেদ, সালাউদ্দিন, মোনেম সরকার এন্ড ডঃ নুরুল ইসলাম মনজুর, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৭। আলম, বি., মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ, চট্টগ্রাম ঃ বেগম জেবুন্নেছা আলম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫।

১৮। এলাভি, হামজা, "দ্যা স্টেট ইন পোস্ট-কর্নিয়্যাল সোসাইটিজ" ইন কেথলিন গো এন্ড এইচ. শর্মা (সম্পাদিত) ইম্পেরিয়ালিজম এন্ড রেভুলেশন ইন সাউথ এশিয়া, লন্ডন ঃ মান্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৩।

১৯। আলী, এ. জে., দ্যা মিনিং অব দ্যা গেণ্ঢারিয়াস কোরান, কায়রো ঃ দার আল-কিতাব আল-মাসভি।

২০। আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ, দ্যা ইমার্জেন্স অব পাকিস্তান, নিউইয়র্ক ঃ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

২১। আলী, এস. এম., আফটার দ্যা ডার্ক নাইট, নিউ দিলণ্টী ঃ থমসন প্রেস, ১৯৭৩।

২২। "এন এক্সক্লোসিভ ইন্টাভিউ অব মিসেস শেখ মুজিবর রহমান", দৈনিক বাংলা, মার্চ ২৬, ১৯৭২।

২৩। আরেন্ডট, হান্নাহ, অন রেভুলেশন, নিউইয়র্ক ঃ ভিকিং প্রেস, ১৯৬৫।

২৪। আশকেনাজ, ডি. সম্পাদিত, দ্যা মিলিটারি ইন দ্যা সার্ভিস অব সোসাইটি এন্ড ডেমোক্রেসি ঃ দ্যা চেলেঞ্জ অব দ্যা ডুয়াল-রোল মিলিটারি, ওয়েস্টপোর্ট ঃ গ্রিনউড প্রেস, ১৯৯৪।

২৫। আয়ুব, মোহাম্মদ এন্ড সুব্রামনিয়াম, কে., দ্যা লিবারেশন ওয়ার, নিউ দিলণ্টী ঃ এস. চাঁদ, ১৯৭২।

২৬। বেবলার, এ., "টাইপোলজিস বেইজড অন সিভিলিয়ান- ডোমিনেটেড ভার্সাস মিলিটারি- ডোমিনেটেড পলিটিক্যাল সিস্টেমস" ইন এ বেবলার এন্ড জে সেরোকা, সম্পাদিত, কনটেম্পোরারী পলিটিক্যাল সিস্টেমসঃ ক্লাসিফিকেশন এন্ড টাইপোলজিস. বোল্ডার ঃ লেনি রাইনার, ১৯৯০।

২৭। বেহার, আর., দ্যা ভালনারেবল অবজারভার ঃ এনথ্রোপেলজি দেট ব্রেকস ইউর হার্থ, বোস্টন ঃ বেকন, ১৯৯৬।

২৮। বেল, বয়ার জে., অন রিভল্ট. লন্ডন, ১৯৭৬।

২৯। ভূঞা, এস. এ. (মেজর জেনারেল), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যোদ্ধা (দ্যা ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্স ইন বাংলাদেশ). ঢাকা ঃ আহমেদ পাবলিশিং, ১৯৭২।

৩০। ভুট্টো, জেড. এ., দ্যা গ্রেট ট্রেজেডি, করাচি ঃ পাকিস্তান পিউপলস পার্টি, ১৯৭১।

৩১। বিনেন, এইচ., দ্যা মিলিটারি এন্ড মর্ডানাইজেশন. শিকাগো ঃ আলডিন আলভারটন, ১৯৭১।

৩২। _____, "আর্মড ফোর্সেস এন্ড ন্যাশনাল মর্ডানাইজেশন", কম্পারেটিভ পলিটিকস.

১৬ (১) ১৯৮৩।

৩৩। বলিথো, হেকটর, জিন্নাহ্ ঃ ক্রিয়েটর অব পাকিস্তান, লন্ডন ঃ জন মোরি, ১৯৫৪।

৩৪। ব্রাইব্রান্তি, রালফ, রিচার্স অন দ্যা ব্যুরোক্রেসি অব পাকিস্তান, ডারহাম, এন.সি.ঃ ডুকে ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬।

৩৫। ব্রিনটন, ক্রেইন, দ্যা এনাটমি অব রেভ্যুলিউশন, নিউ ইয়র্ক ঃ ভিনটেজ, ১৯৫৮।

৩৬। ব্রাউন, ডবিণ্ডউ. নরমান, দ্যা ইউনাইটেড স্টেট এন্ড ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ, কেমব্রিজ, হারবার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

৩৭। কলার্ড, কিথ, পাকিস্তান ঃ এ পলিটিকাল স্ট্যাডি, লন্ডন ঃ জিওরজ এলেন এন্ড আনউইন, ১৯৫৭।

৩৮। চেমবার্লিন, উইলিয়াম এইচ., দ্যা রাশিয়ান রেভ্যুলিউশন, নিউ ইয়র্ক ঃ ম্যাকমিলান, ১৯৫২।

৩৯। চোপরা, প্রাণ, "ইস্ট বেঙ্গল ঃ এ ক্রাইসিস ফর ইন্ডিয়া." ওয়ার্ল্ড টুডে, ১৯৭২ (সেপ্টেম্বর)।

৪০। চৌধুরী, এম. এ., দ্যা সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান, ঢাকা ঃ এনআইপিএ, ১৯৬৩।

৪১। চৌধুরী, জি.ডবিণ্ডউ., দ্যা লাস্ট ডেস অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭২।

৪২। চৌধুরী, কল্যাণ, জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, ক্যালকাটা ঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭২।

৪৩। চৌধুরী, আসাদ এন্ড এনামুল কবির, যাদের রক্তে মুক্ত এই দেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

৪৪। চৌধুরী, সামসুজ্জোহা; চৌধুরী, ইমরোজজোহা, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা আমি, ঢাকা, ২০০০।

৪৫। ক্লাপাম, সি. এন্ড ফিলিপ, জি. (সম্পাদিত), দ্যা পলিটিকাল ডাইলেমা অব মিলিটারি রেজিমস, লন্ডন ঃ গ্রোম হেল্ম, ১৯৮৫।

৪৬। ক্লসউইটজ, কার্ল ভন, অন ওয়ার, লন্ডনঃ পেঙ্গুইন, ১৯৮২।

৪৭। কোহেন, স্টেপেন পি., আর্মস এন্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, বাফেলো ঃ কাউন্সিল অব ইন্টান্যাশনাল স্ট্যাডিস, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩।

৪৮। কনসটিটিউয়েন্ট এসেমবিণ্ড অব পাকিস্তান, ডেবাটস, ইসলামাবাদ ঃ ভলিউম-২, ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৪৮।

৪৯। ক্রুচ, এইচ., "দ্যা মিলিটারি এন্ড পলিটিকস ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া" ইন এইচ. এ. জাকারিয়া এন্ড এইচ. ক্রুচ, (সম্পাদিত) মিলিটারি- সিভিল রিলেশনস ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া. সিঙ্গাপুর ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৫।

৫০। চাজান, এন., মরটিমার, আর. রেভেনহিল, জে. এন্ড রোথচাইল্ড, ডি., পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন কনটেমপোরারি আফ্রিকা. বুলডার ঃ লেন রাইনার, ১৯৮৮।

৫১। ডালডার, এইচ. দ্যা রোল অব দ্যা মিলিটারি ইন দ্যা ইমার্জিং কান্ট্রিস. এস. গ্রানেহাজ ঃ মৌটন, ১৯৬৯।

৫২। ডেক, এ., অটোএথনোগ্রাফি ঃ জোরা নিয়েল হার্সটন, ননি জাবাভু, এন্ড ক্রস-ডিসিপেণ্ডনারি ডিসকোর্স, বণ্ডাক আমেরিকান লিটারেচার ফোরাম, ১৯৯০ ঃ ২৪, ২৩৭-২৫৬।

৫৩। ডেনজিন, এন. কে., ইন্টারপ্রেটিভ বায়োগ্রাফি, নিউরারি পার্ক, সিএ ঃ সেগ, ১৯৮৯।

৫৪। ডিক্সিট, জে.এন., লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯।

৫৫। ডউজ, আর. ই. "দ্যা মিলিটারি এন্ড পলিটিকাল ডেভলপমেন্ট" ইন সি. লেইস, সম্পাদিত পলিটিকস এন্ড চেঞ্জ ইন ডেভলপিং কান্ট্রিস, ক্যামব্রিজ ঃ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯।

৫৬। ইয়াসটন, ডেভিড, এ সিসটেমস এনালাইসিস অব পলিটিকাল লাইফ, নিউ ইয়র্ক ঃ জন উইলে এন্ড সনস, ১৯৬৫।

৫৭। একস্টেইন, হ্যারি, "ইন্টারনাল ওয়ার ঃ দ্যা প্রবলেম অব এনটিসিপশান" ইন আইদেল ডি সোলা পুল, এট অল., সোস্যাল সাইন্স রিচার্স এন্ড ন্যাশনাল সিকুইরিটি, ওয়াশিংটন ডি.সি.ঃ স্মিথসোনিয়ন ইনস্টিটিউশন, ১৯৬৩।

৫৮। একস্টেইন, হ্যারি (সম্পাদিত), ইন্টার্নাল ওয়ার ঃ প্রবলেমস এন্ড এপ্রোসেস, নিউ ইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস, ১৯৬৪।

৫৯। ইডি, এসজর্ন এন্ড মারেক দি (সম্পাদিত), প্রবলেমস এন্ড কনটেম্পরারি মিলিটারিজম, লন্ডন ঃ গ্রূম হেল্ম, ১৯৮৫।

৬০। ইলিস, সি. "সোস্যালজিকাল ইনট্রোস্পেকশান এন্ড ইমোশনাল এক্সপেরিয়েন্স; সিম্বলিক ইন্টারেকশান ১৪ (১৯৯১)।

৬১। ইলিস, ক্যারোলিন এন্ড বকনার, অর্থার পি. "পার্সোনাল নেরেটিভ এস এ সোস্যাল এপ্রোচ টু ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন", কমিউনিকেশন থিয়রি, ২, ১৯৯২।

৬২। ____________, "হুইচ ওয়ে টু টার্ন?" জার্নাল অব কনটেম্পোরারি এথনোগ্রাফি, ২৮, (১৯৯৯) ৫০০-৫০৯।

৬৩। ____________, "অটোএথনোগ্রাফি, পার্সোনাল নেরেটিভ, রিফ্লেক্সিভিটি", ইন নরমান কে. ডেনজিন এন্ড লিনকন, ইউভনা, এস. সম্পাদিত হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটেটিভ রিচার্স, লন্ডন, সেগ পাবলিকেশানস, ২০০০।

৬৪। এনলো, সি., এথনিক সোলজারস ঃ স্টেস সিকিউরিটি ইন ডিভাইডেড সোসাইটিস. হারমন্ডসওয়ার্থ ঃ পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৮০।

৬৫। এটজিয়নি, এমিতাই, পলিটিকাল ইউনিফিকেশান ঃ এ কমপারেটিভ স্ট্যাডি অব লিডারস এন্ড ফোর্সেস, নিউ ইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস অব গেণ্ডনকো, ১৯৬৫।

৬৬। ফেল্ডমেন, হার্বার্ট, ফ্রম ক্রাইসিস টু ক্রাইসিস ঃ পাকিস্তান ১৯৬২-৬৯, লন্ডন ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

৬৭। ফিনার, এস. ই., দ্যা ম্যান অন হর্সবেক ঃ দ্যা রোল অব দ্যা মিলিটারি ইন পলিটিক্স, লন্ডন ঃ পল মল, ১৯৬২।

৬৮। ফিনার, এস. ই., দ্যা ম্যান অন হর্সবেক ঃ পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৭৫।

৬৯। ফার্স্ট, আর., দ্যা ব্যারেল অব এ গান ঃ পলিটিকাল পাওয়ার ইন আফ্রিকা এন্ড দ্যা কোপ ডি'এটাট, লন্ডন ঃ এলেন লেন, ১৯৭০।

৭০। গার্গ এস. কে. ক্যাপটেন, ফ্রিডম ফাইটারস অব বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

৭১। জার্টজ, ক্লিফোর্ড, সম্পাদিত, ওল্ড সোসাইটি এন্ড নিউ স্টেটস, নিউ ইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস ১৯৬৩।

৭২। গভার্নমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান, পেণ্ডনিং ডিপার্টমেন্ট, ইকনমিক ডিসপারিটিস বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬১।

৭৩। ____________, দ্যা রির্পোট অব দ্যা ফাইব মেম্বারস অব দ্যা ফিন্যান্স কমিশন. ঢাকা, জুলাই ১৮, ১৯৬৩।

৭৪। গভার্নমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান, ইকনমিক সার্ভে অব পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ১৯৭০-৭১।

৭৫। গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, পণ্যানিং কমিশন, রির্পোটস অব দ্যা এডভাইজরি প্যানেলস ফর দ্যা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার পণ্যান, ১৯৭০-৭৫। ইসলামাবাদ, জুলাই ১৯৭০।

৭৬। গভর্নমেন্ট অব দ্যা পিপল'স রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, ১৯৮১।

৭৭। গোউ, জে., লেজিটিমেচি এন্ড দ্যা মিলিটারি ঃ দ্যা যুগোস্ণ্ডাভ ক্রাসিস, লন্ডন ঃ পিনটার, ১৯৯১।

৭৮। গ্রিনি, থমাস এইচ., কম্পারেটিভ রেভ্যুলিউশনারি মুভমেন্টস, নিউ জার্সি ঃ প্রিন্টিস হল, ১৯৭৪।

৭৯। গ্রিফিন, কিথ এন্ড এ আর খান, গ্রোথ এন্ড ইনইকোয়ালিটি ইন পাকিস্তান, লন্ডন ঃ ম্যাকমিলান, ১৯৭২।

৮০। গার, টেড এট অল., দ্যা কন্ডিশনস অব সিভিল ভায়োলেন্স ঃ ফার্স্ট টেস্ট অব এ কোজল মডেল, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি রিচার্স মনোগ্রাফ. নং. ২৮, ১৯৬৭।

৮১। গুয়ট, জে. এফ., "এথনিক সেগমেন্টেশান ইন মিলিটারি অর্গানাইজেশনস ঃ বার্মা এন্ড মালেশিয়া" ইন সি. এমসিএ কেলেহার (সম্পাদিত), পলিটিকাল মিলিটারি সিস্টেমস ঃ কম্পারেটিভ পারেসপেক্টিভস, বেভারলি হিলস ঃ সেগ, ১৯৭৪।

৮২। হাকেস, জে. ই., উইক পার্লামেন্টস এন্ড মিলিটারি কোপস ইন আফ্রিকা ঃ এ স্ট্যাডি ইন রেজিম ইনস্টাবিলিটি, সেগ রিচার্স পেপারস ইন সোস্যাল সাইন্সেস, ১৯৭৩।

৮৩। হলপার্ন, এম., দ্যা পলিটিকস অব সোস্যাল চেঞ্জ ইন দ্যা মিডল ইস্ট এন্ড নর্থ আফ্রিকা, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

৮৪। হামদুর রহমান কমিশন রির্পোট ২০০০, "১৯৭১ ঃ দ্যা আনটোল্ড স্টোরি" পাবলিশড ইন ইন্ডিয়া টুডে, আগস্ট ২০০০।

৮৫। হানসেন, এইচ. বি., এথেনসিটি এন্ড মিলিটারি রুল ইন উগান্ডা ঃ এ স্ট্যাডি অব এথেনসিটি এস এ পলিটিকাল ফ্যাক্টর ইন উগান্ডা, আপসালা ঃ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিস, ১৯৭৭।

৮৬। হক, মাহাবুব-উল, দ্যা স্ট্রেটেজি অব ইকনমিক পণ্যানিং ঃ এ কেস স্টাডি অব পাকিস্তান, করাচি ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

৮৭। হক, এম., ওয়ার অব ইনডিপেন্ডনস অব বাংলাদেশ ঃ আরএডবিণ্ডউ এন্ড সিআইএ, ঢাকা ঃ মৌলি প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৮৮। হাক্সনার, টি., ইপিআইডিসি-এ কনগণ্ডমারেট ইন ইস্ট পাকিস্তান, ক্যামব্রিজ ঃ হর্বার্ট ইনস্টিটিউট অব ইন্টান্যাশনাল ডেভলপমেন্ট, ১৯৬৯।

৮৯। হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেনস ঃ ডকুমেন্টস, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন, গভার্নমেন্ট অব দ্যা পিপল'স রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪।

৯০। হোডলে, জে. এস., সোলজার্স এন্ড পলিটিকস ঃ সিভিল-মিলিটারি রিলেশনস ইন কম্পারেটিভ পারেসপেক্টিভ, ক্যামব্রিজ ঃ স্কেনকম্যান পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৫।

৯১। হরউটজ, ডি. এল., কোপ থিয়রিস এন্ড অফিসারস মোটিভ ঃ শ্রীলঙ্কা ইন কম্পারেটিভ পারেসপেক্টিভ, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮০।

৯২। হোসাইন, জি., জেনারেল জিয়াউর রহমান এন্ড দ্যা বিএনপি ঃ পকিটিকাল ট্রান্সফরমেশন অব এ মিলিটারি রেজিম, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮।

৯৩। হাগটন, বার্নার্ড, ব্যুরোক্রেটিক গভার্নমেন্ট, লন্ডন ঃ পি.এস. কিং এন্ড সন, ১৯১৩।

৯৪। হগটন, এস. পি., পলিটিকাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিস, নিউ হেভেন ঃ ইয়াল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

৯৫। হক, মুহাম্মদ সামসুল, বাংলাদেশ ইন্টার্নাল পলিটিকস ঃ দ্যা ডিলেমা অব দ্যা উইক স্টেটস, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩।

৯৬। ইমাম, জাহানারা, অব বণ্ডাড এন্ড ফায়ার, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

৯৭। ইসলাম, রফিক-উল, (মেজর) বিইউ, এ টেল অব মিলিয়নস, ঢাকা বাংলাদেশ বুকস ইন্টান্যাশনাল, ১৯৮১।

৯৮। ইসলাম, রফিক-উল, (মেজর) বিইউ, এ টেল অব মিলিয়নস ঃ বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ১৯৭১, ঢাকা অন্যান্য, ১৯৯৭।

৯৯। জেকসন, আর., সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস ঃ ইন্ডিয়া ঃ পাকিস্তান ঃ বাংলাদেশ, লন্ডন ঃ চট্ট এন্ড উইনডাস, ১৯৭৫।

১০০। জেকসন, আর. ডবিণ্ডউ., পলিটিসিয়ানস ইন ইউনিফর্ম, এপিএসআর, ৭০ (৪) ঃ ১০৭৮-৯৬।

১০১। জেকসন, এম., পাথস টুওয়ার্ডস এ ক্লিয়ারিং ঃ রেডিকাল ইমপ্রিসিজম এন্ড এথনোগ্রাফিক ইনকোয়ারি, বণ্ডমিংটন ঃ ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।

১০২। জেকব, জেএফআর, সারেন্ডার এট ঢাকা, ঢাকা ঃ দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮।

১০৩। জাহান, রওনক, পাকিস্তান ঃ ফেলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৩।

১০৪। জামিল, সাফাত কর্নেল (অবঃ), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঃ রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮।

১০৫। জেনউটজ, এম., দ্যা মিলিটারি ইন দ্যা পলিটিকাল ডেভলপমেন্ট অব নিউ নেশনস এন এচে ইন কম্পারেটিভ এনালাইসিস, শিকাগো ঃ শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪।

১০৬। জানোউটজ, এম., "দ্যা কম্পারেটিভ এনালাইসিস অব মিডল ইস্টার্ণ মিলিটারি ইনস্টিটিউশনস" ইন এম, জানোউটজ এন্ড ভন ডর্ন (সম্পাদিত), অন মিলিটারি ইন্টারভেনশন, রোটারডাম ঃ রোটারডাম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

১০৭। জে. জে. জনসন (সম্পাদিত), দ্যা রোল অব দ্যা মিলিটারি ইন আন্ডারডেভলপড কান্ট্রিস, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২।

১০৮। জনসন, চালমারস, রেভ্যুলেশনারি চেঞ্জেস, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৮২।

১০৯। ....., পেজন্ট ন্যাশনালিজম এন্ড কমিউনিষ্ট পাওয়ার, স্টেনফোর্ড ঃ স্টেনফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬২।

১১০। _____, রেভ্যুলিউশন এন্ড দ্যা স্যোসাল সিস্টেমস, স্টেনফোর্ড ঃ হোভার ইনস্টিটিউশন, ১৯৬৪।

১১১। জউভেনেল, বারটার্ন্ড ডি, অন পাওয়ার, বোস্টন ঃ বেকন প্রেস, ১৯৬২।

১১২। কার্ণাও, স্টেনলে, ভিয়েতনাম ঃ এ হিস্ট্রি, নিউ ইয়র্ক ঃ ভিকিং, ১৯৮৩।

১১৩। কেনেডি, গেভিন, দ্যা মিলিটারী ইন দ্যা থার্ড ওয়ার্ল্ড, লন্ডন ঃ জার্ল্ড ডাকওয়ার্থ, ১৯৭৪।

১১৪। কেশকেমেতি, প, দ্যা আনএক্সপেক্টেড রেভ্যুলিউশন ঃ স্যোসাল ফোকাস অন হাঙ্গেরীয়ান আপরাইজিং, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬১।

১১৫। খান, ফারুক আজিজ, স্প্রীং ১৯৭১ ঃ এ সেন্টার স্টেজ একাউন্ট অব বাংলাদেশ ওয়ার অব লিবারেশন, ঢাকা ঃ দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩।

১১৬। খান, এফ. করিম, এন ইন্ট্রোডাকশন টু ইকনমিক জিওগ্রাফি, ঢাকা ঃ গ্রীন বুক হাউজ লিমিটেড, ১৯৭১, পৃঃ-৬৯১, ৭৯১-৭৯৩।

১১৭। খান, কে. এম. রইসুদ্দিন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা ঃ খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী ১৯৯৮, পৃ-৬৩৮।

১১৮। খান, রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।

১১৯। কোবিউজেরি, টি. বি., দ্যা পলিটিকস অব স্টেট ফরমেশন ঃ দ্যা নেচার এন্ড ইফেক্টস অব কলোনীয়ালিজম ইন উগান্ডা, নাইরোবি ঃ ইস্ট আফ্রিকান লিটারেচার ব্যুরো, ১৯৭৪।

১২০। কটজ, ডেভিড এন্ড ফ্রেড উইয়ার, রেভ্যুলিউশন ফ্রম এবাভ ঃ দ্যা ডেমিস অব দ্যা সোভিয়েত সিস্টেম, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৭।

১২১। কেরিজার, এস., "ফিকশন এন্ড স্যোসাল সাইন্স" ইন এন. কে. জেনজিন (সম্পাদিত) স্ট্যাডিস ইন সিম্বলিক ইন্টারেকশন ঃ এ রিচার্স এনুয়েল, ৫ (১৯৮৪) ২৬৯-২৮৬।

১২২। _____, স্যোসাল সাইন্স এন্ড দ্যা সেল্ফ ঃ পার্সোনল এসেইস অন এন আর্টফর্ম, নিউ বার্নসউইক, এনজে ঃ রুটজারস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১।

১২৩। লেফিভার, ই., স্পেয়ার এন্ড স্কোপটার ঃ আর্মি পুলিশ এন্ড পলিটিকস ইন ট্রপিক্যাল আফ্রিকা. ওয়াশিংটন ঃ দ্যা ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট, ১৯৭০।

১২৪। লিনজ, জে. জে. এন্ড স্টেফেন, এ. (সম্পাদিত), দ্যা ব্রেকডাউন অব ডেমোক্রেটিক রেজিমস, বেলটিমোর ঃ জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮।

১২৫। লিরিয়া, ওয়াই. এ., বুজাইমভিলি ডাইরী, মেলবোর্ন, ইন্দ্রা পাবলিশিং, ১৯৯৩।

১২৬। লিসাক, এম., মিলিটারী রোলস ইন মডার্ণাইজেশন ঃ সিভিল- মিলিটারী রিলেশনস ইন থাইল্যান্ড এন্ড বার্মা, বেভার্লি হিলস ঃ সেগ, ১৯৪৬।

১২৭। লোসাক, ডেভিড, পাকিস্তান ক্রাইসিস, লন্ডন ঃ হ্যানিম্যান, ১৯৭২।

১২৮। লাক্ষাম, এ. আর., "ইনট্রোডাকশন ঃ দ্যা মিলিটারী, দ্যা ডেভলপমেন্টাল স্টেট এন্ড স্যোসাল ফোর্সেসইন এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসেফিক ঃ দ্যা ইস্যু ফর কম্পারেটিভ এনালাইসিস" ইন সেলোচান (সম্পাদিত), দ্যা মিলিটারী, দ্যা স্টেট এন্ড ডেভলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসেফিক, বৌলডার ঃ ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৯১।

১২৯। মেকিয়াভেলী, এন., ডিসকোর্সী, ২, ৪৪।

১৩০। মেকিয়াভেলী, এন., ডিসকোর্সী, ৩, ৪১।

১৩১। মেডিসন, এনগাস, ক্লাস, স্ট্রেকসার এন্ড ইকোনমিক গ্রোথ ঃ ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান সাইন্স দ্যা মোগলস, লন্ডন ঃ জিওরজ এলান এন্ড হুউইন এলটিডি, ১৯৭১।

১৩২। মার্জিওথা, ফ্রাঙ্কলিন ডি, (সম্পাদিত) বার্সেস এনসাইক্লোপেডিয়া অব মিলিটারী সাইন্স এন্ড বাইয়োগ্রাফী, লন্ডন, ১৯২০।

১৩৩। মার্জিওথা, এফ. ডি., "সিভিলিয়ান কন্ট্রোল এন্ড দ্যা মেক্সিকান মিলিটারী ঃ চেঞ্জেং পার্টনারস অব পলিটিকাল ইফ্লুয়েন্স" ইন সি. ই. ওয়েলস, (সম্পাদিত) সিভিলিয়ান কন্ট্রোল অব দ্যা মিলিটারী, আলবেনী ঃ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস, ১৯৭৬।

১৩৪। মার্শাল, চার্লস বি., "রিফ্লেকশনস অন এ রেভ্যুলিউশন ইন পাকিস্তান", ফরেন আফেযারস, ৩৭ (১৯৫৯)।

১৩৫। মাসকারেনহেজ, এনথনি, বাংলাদেশ ঃ এ লেগাসি অব বণ্ঢাড, লন্ডন, ১৯৮৬।

১৩৬। মাজরুই, এ. এ., "সোলজার্স এন্ড ট্রেডিশনালাইজারস ঃ মিলিটারী রুল এন্ড দ্যা রি-আফ্রিকানিজাইশন অব আফ্রিকা," ওয়ার্ল্ড পলিটিকস, ১৯৭৬, ২৪৬-২৭২.

১৩৭। ম্যাককল, এম., "দ্যা সিগনিফিকেন্সঅব স্টোরী টেলিং", ইন এন. কে. ডেনজিন (সম্পাদিত), স্টাডিস ইন সিম্বলিক ইন্টারেকশন, ভলিউম-২ (১৯৯১) গ্রীনউইচ, সিটি, জেএএল।

১৩৮। মরিস-জনস, ডবিণ্ঢউ. এইচ., "এক্সপেরিয়েন্সেস অব ইন্ডিপেন্ডেনস ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান", দ্যা পলিটিকাল কোর্য়াটারলী, ২৯ (১৯৫৮)।

১৩৯। মুকুল, এম.আর.এ., আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫।

১৪০। নী, ভিকটর এন্ড জেমস পিক, সম্পাদিত চায়নাস আনইন্টারেপটেড রেভ্যুলিউশন, নিউ ইয়র্ক ঃ পেনথিয়ন বুকস, ১৯৭৫।

১৪১। নিয়াজী, এ.এ.কে. লে. জেনারেল, দ্যা বেট্রায়াল অব ইস্ট পাকিস্তান, লাহোর ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

১৪২। নর্ডলিনগার, ই. এ., সোলজার্স ইন মুক্তি, এপিএসআর, ৬৪ (৪) ৪৩১-৪৮।

১৪৩। _____, সোলজার্স ইন পলিটিকস ঃ মিলিটারী কোপস এন্ড গভার্ণমেন্ট, এনজেলউড ক্লিপস ঃ প্রিন্টিস হল, ১৯৭৭।

১৪৪। ওসমানী এস. এইচ., বাংলাদেশ ন্যাশনালিজম, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২।

১৪৫। পালিত, ডি. কে. (মেজর জেনারেল), দ্যা লাইটনিং কেমপিং ঃ ইন্দো-পাকিস্তান ওয়ার, নিউ দিলণ্টী ঃ থমসন, ১৯৭২।

১৪৬। পাপানেক, জি. এফ., "ইন্ডাট্রিয়াল প্রোডাকশন এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন পাকিস্তান," পাকিস্তান ডেভলপমেন্ট রিভিউ, ৪ (অটাম-৬৪)।

১৪৭। পার্লমাটার, এ., দ্যা মিলিটারী এন্ড পলিটিকস ইন মডার্ণ টাইমস, নিউ হেভেন ঃ ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৭।

১৪৮। _____, পলিটিকাল রোল এন্ড মিলিটারী রুলারস, লন্ডন ঃ ফ্রাঙ্ক কেস, ১৯৮১।

১৪৯। পিটার হাজেলহার্টস রিপোর্ট, "শেডো অব ওয়ার অন দ্যা ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট", দ্যা টাইমস (লন্ডন), ১৩ জুলাই ১৯৭১. ফর ডিটেইলস অব সুব্রাহ্মানিয়ামস আরগুমেন্ট সি হিজ বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়াস সিকিউরিটি, ডেরাডান ঃ পালিত এন্ড দত্ত, ১৯৭২।

১৫০। পিটি, এস জিওরজ, দ্যা প্রসেস অব রেভ্যুলিউশন, নিউ ইয়র্ক ঃ হার্পার, ১৯৫৮।

১৫১। পাই, লে., অ্যাসপেক্ট অব পলিটিকাল ডেভলপমেন্ট, বোসটন ঃ লিটল ব্রাউন এন্ড কোম্পানী ১৯৬৬।

১৫২। _____, "আর্মিস ইন দ্যা প্রসেসিং অব পলিটিকাল মডার্ণাইজেশন" ইন জে. জে. জনসন (সম্পাদিত), দ্যা রোল অব দ্যা মিলিটারী ইন আন্ডারডেভলপড কান্ট্রিস, অপ. সিট.।

১৫৩। কাদেরী, ফজলুল কাদের, বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়াল্ড প্রেস, ঢাকা ঃ আমাতুল কাদের, ১৯৭২।

১৫৪। আর. জে. মে, স্টেফেনি লসন এন্ড ভাইবারটো সেলোসন, "ইনট্রাডাকশন, ডেমোক্রেসি এন্ড দ্যা মিলিটারী ইন কম্পারেটিভ পারেসপেক্টিভ" হস আর জে মে এন্ড ভাইবারটো সেলোসন (সম্পাদিত), দ্যা মিলিটারী এন্ড ডেমোক্রেসি ইন এশিয়া এন্ড দ্যা পেসিফিক, লন্ডন ঃ সি. হার্সট এন্ড কোম্পানী লি., ১৯৯৮।

১৫৫। রহমান, মুহাম্মদ আনিসুর, ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান ঃ এন এনালাইসিস অব প্রবলেমস ইন দ্যা পলিটিকাল ইকনমি অব রিজিওনাল পণ্যানিং, ক্যামব্রিজ, সিআইএ, হার্বাড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৮।

১৫৬। রহমান, শেখ মুজিবর, আমাদের বাঁচার দাবী ঃ ছয় দফা কর্মসূচী, ঢাকা ঃ ইস্ট পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৬।

১৫৭। রহিম, এনায়েতুর; রহিম, জয়সি এল., বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এন্ড দ্যা নিক্সন হোয়াইট হাউজ ১৯৭১, ঢাকা ঃ পুস্তক, ২০০০।

১৫৮। রশিদ, হারুণ-অর, জিওগ্রাফী অব বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১, পৃঃ ১৫০।

১৫৯। রীড-ডানাহে, ডি., অটোএথনোগ্রাফী ঃ রিরাইটিং, সেল্ফ এন্ড দ্যা স্যোসাল, অক্সফোর্ড ঃ অক্সফোর্ড বার্গ, ১৯৯৭।

১৬০। রউকিউ, এ., দ্যা মিলিটারী এন্ড দ্যা স্টেট ইন ল্যাটিন আমেরিকা, বার্কলে ঃ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়অ প্রেস, ১৯৮৭।

১৬১। রুশো, জে. জে., স্যোসাল কন্ট্রাক্ট, লন্ডন, ১৯৬৪।

১৬২। এস. পি. হান্টিটন (সম্পাদিত), চেঞ্জিং পেটানর্স অব মিলিটারী পলিটিকস, নিউ ইয়র্ক ঃ ফ্রী প্রেস, ১৯৬২।

১৬৩। সাদিক, এম, মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম, ঢাকা ঃ এইচ.এ. মাহমুদ, ১৯৯৫।

১৬৪। শফিউলণ্ঢহ, কে. এম. মেজর জেনারেল (অবঃ), বাংলাদেশ এট ওয়ার, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

১৬৫। _____, ওয়ার অব লিবারেশন ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১৬৬। সালিক, সিদ্দিক, উইটনেস টু সারেন্ডার, ঢাকা ঃ দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭।

১৬৭। সাঈদ, খালেদ বিন, পাকিস্তান ঃ দ্যা ফরমেটিভ ফেস, লন্ডন ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

১৬৮। _____, দ্যা পলিটিকাল সিস্টেম অব পাকিস্তান, বোস্টন ঃ হাগটন মিফলিন, ১৯৬৭।

১৬৯। শীল, অনিল, দ্যা ইমার্জেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, ক্যামব্রিজ ঃ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

১৭০। সিটজ, এস. টি., "দ্যা মিলিটারি ইন বণ্যাক আফ্রিকান পলিটিক্স" ইন সি. এইচ. কেনেডি এন্ড ডি. জে. লাউচার (সম্পাদিত), সিভিল মিলিটারি ইন্টারেকশন ইন এশিয়া এন্ড আফ্রিকা, লিডেন ঃ ই জে ব্রিলি, ১৯৯১।

১৭১। সামসুদ্দিন, এ.টি.এম., হয়েন পাকিস্তান ওয়াজ ডিভাইডেড, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।

১৭২। শীলস, ই., "দ্যা মিলিটারি ইন দ্যা পলিটিকাল ডেভলপমেন্ট অব নিউ স্টেটস" ইন জে.জে. জনসন (সম্পাদিত), দ্যা রোল অব দ্যা মিলিটারি ইন আন্ডারডেভলপড কান্ট্রিস, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২।

১৭৩। সিদ্দিকী কে., ইন্ডিপেনডেন্স ১৯৭১ (স্বাধীনতা), ঢাকা বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২।

১৭৪। সিং, সুকান্ত, মেজর জেনারেল, দ্যা লিবারেশন অব বাংলাদেশ, ভলিউম-১, দিলণ্ঢী ঃ লান্সার পাবলিশারস, ১৯৮০।

১৭৫। সীসন, রিচার্ড এন্ড রোজ, লিও ই. ওয়ার এন্ড সিসেশন, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এন্ড দ্যা ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যালিফোর্নিয়া ঃ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯০।

১৭৬। স্কোকপল, দিডা, "ফ্রান্স, রাশিয়া, চায়না ঃ এ স্ট্রাকচারাল এনালাইসিস অব স্যোসাল রেভ্যুলিউশন", কম্পারেটিভ স্ট্যাডিস ইন সোসাইটি এন্ড হিস্ট্রি, এপ্রিল, ১৯৭৫।

১৭৭। স্কোকপল, দিডা, "এক্সপেণ্ডনিং রেভ্যুলিউশনস ঃ ইন কোয়েস্ট অব এ স্যোসাল স্ট্রেকচারাল এপ্রোচ" ইন লিউস কোচার এন্ড ওটো লার্সেন, সম্পাদিত; দ্যা ইউজেস অব কন্ট্রোভার্সি ইন সোশিয়লজি, নিউ ইয়র্ক ঃ ফ্রি প্রেস, ১৯৭৬।

১৭৮। সোবহান, রেহমান, বাংলাদেশ ঃ প্রবলেমস অব গভর্ননেস, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃঃ ৭৯, ৮১-৮৩, ৮৯, ৯৮, ১৩২।

১৭৯। _____, "দ্যা প্রবলেমস অব রিজিওনাল ইমবেলেন্স ইন দ্যা ইকনমিক ডেভলপমেন্ট অব পাকিস্তান", এশিয়ান সার্ভে, ২ (জুলাই ১৯৬২)।

১৮০। স্টেপেন, এ., দ্যা স্টেট এন্ড সোসাইটি ঃ পেরু ইন কম্পারেটিভ পারসপেক্টিভ, প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন

১৮১। _____, রিথিংকিং মিলিটারি পলিটিকস ঃ ব্রাজিল এন্ড দ্যা সাউদার্ন কোন. প্রিন্সটন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮।

১৮২। স্টের্ন জোশেফ এন্ড ওয়াল্টার পি. ফেলকন, গ্রোথ এন্ড ডেভলপমেন্ট ইন পাকিস্তান, ক্যামব্রিজ, সিআইএ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৭০।

১৮৩। সুব্রহ্মানিয়ান, কে. কোটেড ইন দ্যা হিন্দুস্তান টাইমস (দিলণ্টী). ১ এপ্রিল ১৯৭১।

১৮৪। সুব্রহ্মানিয়ান, কে. কোটেড ইন দ্যা ন্যাশনাল হেরাল্ড (দিলণ্টী). ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

১৮৫। তালুকদার, মনিরুজ্জামান, দ্যা বাংলাদেশ রেভ্যুলিউশন এন্ড ইটস আফটারমেথ, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮০।

১৮৬। , দ্যা বাংলাদেশ রেভ্যুলিউশন এন্ড ইটস আফটারমেথ, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮৮।

১৮৭। তানটার, রেমন্ড এন্ড মিডলারস্কাই, মেনুস, "এ থিওরী অব রেভ্যুলিউশন", জার্নাল অব কনফ্লিকট রেভ্যুলিউশন, ১১ (সেপ্টম্বর ১৯৬৭)।

১৮৮। টেডলক, বি, "ফ্রম পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন টু দ্যা অবজারভেশন অব পার্টিসিপেশন ঃ দ্যা ইমাজেন্স অব নেরেটিভ এথনোগ্রাফি", দ্যা জার্নাল অব এনথ্রোপলজিকাল রিচার্স, ৪১ (১৯৯১)।

১৮৯। দ্যা ইন্ডিয়ান স্টাচুয়ারি কমিশন রিপোর্ট, লন্ডন ঃ হার মেজেসটিস স্টেশনারি অফিসার, ভলিউম-১, ১৯৩০।

১৯০। থিওডোর স্টাকপল, স্টেটস এন্ড স্যোসাল রেভ্যুলিউশনস, ১৯৭৯।

১৯১। থিলি, চেরিস, "ডাজ মর্ডার্নিসেশন ব্রেড রেভ্যুলিউশন", ইন্টান্যাশনাল সোশ্যাল সাইন্সেস জার্নাল, নং. ১৩৪, ১৯৯১।

১৯২। থিনকার, হাগ, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান ঃ এ পলিটিকাল এনালাইসিস, নিউইয়র্ক ঃ প্রেজার, ১৯৬২।

১৯৩। থ্রিমবার্জার, এলেন কে, রেভ্যুলিউশন প্যম এবোভ ঃ মিলিটারি বুরোক্রেটস এন্ড ডেভলপমেন্টস ইন জাপান, তুর্কি, ইজিপ্ট এন্ড পেরু, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৮।

১৯৪। ভন ডের মেডেন, এফ. আর., পলিটিকস অব দ্যা ডেভলপিং নেশানস, এঙ্গেলউড ক্লিফস ঃ প্রেন্টিস হল, ১৯৬৪।

১৯৫। ওয়ালেরস্টেইন, ইমানুয়েল, আফ্রিকা ঃ দ্যা পলিটিকস অব ইন্ডিপেনডেনস, নিউইয়র্ক ঃ ভিনটেস, ১৯৬১।

১৯৬। ওয়ালজের, মাইকেল, দ্যা রেভ্যুলিউশন অব দ্যা স্টেইন, ক্যামব্রিজ ঃ হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫।

১৯৭। ওয়েলস, সি. ই., "পার্সোনালিজম এন্ড কর্পোরাটিজম ইন আফ্রিকান আর্মিস" ইন সি মেকএ. কেলেহার (সম্পাদিত) পলিটিকাল- মিলিটারী সিস্টেমস ঃ কম্পারেটিভ পারেসপেক্টিভস, বেভারলি হিলস ঃ সেগ, ১৯৭৪।

১৯৮। উইলকক্স, ওয়েনি এ, পাকিস্তান ঃ দ্যা কনসোলিডেশন অব এ নেশন, নিউইয়র্ক ঃ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

১৯৯। ইউসুফ, ফজলুল হাসান, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯২।

২০০। জাফরুলণ্ঢাহ, এইচ., দ্যা জিয়া ইপিসোড ইন বাংলাদেশ পলিটিকস, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।

২০১। জাহের, হাসান, দ্যা শেপারেশন অব ইস্ট পাকিস্তান ঃ দ্যা রাইজ এন্ড রিয়ালাইজেশন অব বাঙালি মুসলিম ন্যাশনালিজম, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮।

২০২। জিরিং, লওয়ারেন্স, দ্যা আয়ুব খান ইরা ঃ পলিটিকস ইন পাকিস্তান ১৯৫৮-১৯৬৯, সিরাকস ঃ সিরাকস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

২০৩। জোলবার্গ, এ., "দ্যা স্ট্রেকসার অব পলিটিকাল কনফ্লিক্ট ইন দ্যা নিউ স্টেটস অব ট্রপিকাল আফ্রিকা", আমেরিকান পলিটিকাল সাইন্স রিভিউ. ৬২ (৭০-৮৭), ১৯৬৮।